বাংলাদেশ
এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা

ISSN 1609-4409

তেতাল্লিশতম খণ্ড	শীত সংখ্যা	পৌষ ১৪৩২/ডিসেম্বর ২০২৫

সম্পাদক
ভীষ্মদেব চৌধুরী

সহযোগী সম্পাদক
সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ
৫ পুরাতন সচিবালয় রোড (নিমতলী)
রমনা, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ

সম্পাদকীয় পর্ষৎ

সভাপতি	:	অধ্যাপক ইয়ারুল কবির
সম্পাদক	:	অধ্যাপক ভীষ্মদেব চৌধুরী
সহযোগী সম্পাদক	:	অধ্যাপক সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ
সদস্য	:	অধ্যাপক আবদুল বাছির
		অধ্যাপক শুচিতা শরমিন
		অধ্যাপক মোহাম্মদ সেলিম

মূল্য	:	২০০.০০ টাকা
Price	:	Tk. 200.00
		US$ 10.00

প্রকাশক	:	সাধারণ সম্পাদক
		বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

Bangladesh Asiatic Society Patrika (Bengali Journal of the Asiatic Society of Bangladesh) edited by Professor Bhishmadeb Choudhury, published by Professor M. Siddiqur Rahman Khan, General Secretary, The Asiatic Society of Bangladesh, 5, Old Secretariat Road, Ramna, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 0222-6640753, E-mail: asbpublication@gmail.com

সূচিপত্র

জীবনানন্দ দাশের গল্প : প্রেমহীন সম্পর্কের আখ্যান
চঞ্চল কুমার বোস ১৮১
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43ii.001

নজরুলের ছোটগল্প : লোকজচেতনার স্বরূপ অনুসন্ধান
তাশরিক-ই-হাবিব ১৯৩
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43ii.002

চাঁদপুর জেলার উপভাষা : ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
তসলিমা খাতুন ২১৩
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43ii.003

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়াবনামা* : বয়ানে মন্তাজ
মৌমিতা রায় ২৩৯
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43ii.004

বাংলা সাহিত্যচর্চা ও গবেষণায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় : ১৯৬৬-২০২৫
নুরুল আমিন ২৫১
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43ii.005

***আকিমুন রহমানের দু'টি উপন্যাস :* নারী-পুরুষ সম্পর্কের ভিন্নমাত্রিক রূপায়ণ**
নাহিদা বেগম ২৭৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43ii.006

অভিনেতার প্রস্তুতিতে চরণের অনুশীলন : ভরতের 'চারী বিধান' ও তাদাশি সুজুকি'র 'চরণের ব্যাকরণ'
উম্মে সুমাইয়া ২৮৯
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43ii.007

***জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* উপন্যাসে ক্ষমতা-সম্পর্কের স্বরূপ**
মো. গোলাম মাহ্‌মুদ পাভেল ৩০৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43ii.008

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা
নাজনীন সুলতানা ৩২৩
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43ii.009

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকায় এশিয়ার সমাজ, ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি, দর্শন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে রচিত মৌলিক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধকারদের জ্ঞাতার্থে পত্রিকায় প্রবন্ধ জমা দেওয়ার নিয়মাবলি নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১. পত্রিকায় প্রকাশের জন্য এক কপি পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার কম্পোজ করে জমা দিতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজ করার নিয়ম নিম্নরূপ:
   - বাংলা বিজয় সফট্ওয়্যারের সুতন্বী-এমজে ফন্টে প্রবন্ধটি কম্পোজ করতে হবে। প্রবন্ধটির মোট শব্দসংখ্যা ৩০০০ থেকে ৫০০০-এর মধ্যে সীমিত হতে হবে;
   - কাগজের সাইজ হবে A4। প্রতি পৃষ্ঠায় মার্জিন থাকবে উপরে ১.৫ ইঞ্চি, নিচে ১.৫ ইঞ্চি, ডানে ১.৫ ইঞ্চি এবং বামে ১.৬ ইঞ্চি।

২. প্রবন্ধের সাথে প্রবন্ধকারের পেশাগত পরিচয় ও ঠিকানা জানিয়ে এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে যে:
   - জমাকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি;
   - এটি একটি মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ;
   - প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্য কোনো পত্রিকা বা গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য অন্য কোথাও জমা দেওয়া হয়নি;
   - এই প্রবন্ধে প্রকাশিত মতের সকল দায়িত্ব লেখক বহন করবেন।

৩. প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে প্রবন্ধকার পত্রিকার একটি কপি ও প্রকাশিত প্রবন্ধের দশ কপি অফপ্রিন্ট বিনা মূল্যে পাবেন।

৪. কোনো প্রবন্ধ প্রকাশের বিষয়ে সম্পাদনা পর্ষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

৫. বাংলা একাডেমির *প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম* অনুসরণে অথবা *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, *চলন্তিকা* প্রভৃতি অভিধানের বানান অনুযায়ী প্রবন্ধটি রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোনো ভুক্তিতে (entry) একাধিক শীর্ষশব্দ (headword) থাকলে প্রথমটির বানান গ্রহণ করতে হবে। তবে গবেষক কোনো বিশেষ বানান-বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তাও অক্ষুণ্ন রাখা যাবে।

৬. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না।

৭. প্রবন্ধের শেষে টীকা ও তথ্যনির্দেশ সংখ্যানুক্রমে উপস্থাপন করতে হবে। মূল পাঠের মধ্যে টীকা ও তথ্যনির্দেশ সংখ্যা সুপারস্ক্রিপ্টে (যেমন বাংলাদেশ[১]) ব্যবহার করাই নিয়ম।

৮. মূলপাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি তিন লাইনের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উপস্থাপন করতে হবে। কবিতার উদ্ধৃতিতে মূলের পঙ্‌ক্তি-বিন্যাস রক্ষা করতে হবে।

৯. তথ্যনির্দেশের ক্ষেত্রে লেখকের পূর্ণ নাম, বইয়ের নাম, প্রকাশস্থান, প্রকাশক, প্রকাশকাল এবং পৃষ্ঠা নম্বরের উল্লেখ করতে হবে।

১০. বই ও পত্রিকার নাম বাঁকা (italics) অক্ষরে হবে (যেমন, বই : *বৃহৎ বঙ্গ;* পত্রিকা : *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*)।

১১. প্রবন্ধের সূচনায় একটি সারসংক্ষেপ অবশ্যই দিতে হবে। আনুমানিক ২০০ শব্দের সারসংক্ষেপ এবং চাবি শব্দ (Key word) (৩-৭টি) থাকতে হবে।

১২. একাধিক লেখকের নামযুক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য গ্রহণ করা হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: পাণ্ডুলিপির সঙ্গে পৃথক পৃষ্ঠায় বাংলা ও ইংরেজিতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সংযোজনী হিসেবে জমা দিতে হবে:

(ক) প্রবন্ধের শিরোনাম, (খ) সারসংক্ষেপ, (গ) চাবি শব্দ, (ঘ) সংক্ষিপ্ত লেখক-পরিচিতি।

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

কাউন্সিল : ২০২৪ ও ২০২৫

সভাপতি	:	অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ
সহ-সভাপতি	:	অধ্যাপক হাফিজা খাতুন অধ্যাপক সাজাহান মিয়া অধ্যাপক ইয়ারুল কবির
কোষাধ্যক্ষ	:	ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ
সাধারণ সম্পাদক	:	অধ্যাপক মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান
সম্পাদক	:	অধ্যাপক মো. আবদুর রহিম
সদস্য	:	অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন (ফেলো) ব্যরিস্টার শফিক আহমেদ (ফেলো) অধ্যাপক এ কে এম গোলাম রব্বানী অধ্যাপক মাহবুবা নাসরীন অধ্যাপক মোঃ লুৎফর রহমান অধ্যাপক সাদেকা হালিম অধ্যাপক আশা ইসলাম নাঈম অধ্যাপক আবদুল বাছির অধ্যাপক নাজমা খান মজলিশ অধ্যাপক মো. আবদুল করিম অধ্যাপক শুচিতা শরমিন অধ্যাপক সাব্বীর আহমেদ

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, তেতাল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩২/ডিসেম্বর ২০২৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43ii.001

জীবনানন্দ দাশের গল্প : প্রেমহীন সম্পর্কের আখ্যান

চঞ্চল কুমার বোস*

সারসংক্ষেপ

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) মূলত কবি। আধুনিক কবিতায় তাঁর দূরসঞ্চারী প্রভাব থাকলেও কথাসাহিত্যিক হিসেবেও জীবনানন্দের একটি স্বতন্ত্র জগৎ রয়েছে। কিন্তু তাঁর সেই কথাসাহিত্যিক-পরিচিতিটি অনেকটাই আড়ালে থেকে গেছে। বেশকিছু উপন্যাস রচনার পাশাপাশি দুই শতাধিক গল্পও রচনা করেছেন তিনি। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর আধুনিক জীবনের যন্ত্রণা এবং নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতা তাঁর গল্পগুলোতে বিশেষভাবে উন্মোচিত হয়েছে। জীবনানন্দের গল্প অনেকাংশে আত্মজৈবনিক কিন্তু আধুনিক মানুষের শেকড়হীনতার যন্ত্রণা এবং জটিল জৈবমনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম অভিব্যক্তিও মুখ্য হয়ে উঠেছে এসব গল্পে। বর্তমান প্রবন্ধে সে দিকটিই বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। গল্পকার হিসেবে জীবনানন্দের সৃজন-প্রতিভার ভিন্ন একটি দিক উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে এ প্রবন্ধে।

চাবি-শব্দ : জীবনানন্দ দাশ, গল্প, উপন্যাস, যুদ্ধোত্তর পৃথিবী, আত্মজৈবনিক।

কবিতা যদি তাঁকে পথের সন্ধান দিতে পারে, তবে গল্প সকলের দৃষ্টিপথের আড়ালে হয়ত থেকে যাবে–নিজের লেখা গল্প সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশ এধরনের একটি কথা বলেছিলেন বলে শোনা যায়। নিজের গল্প সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা-যে জীবনানন্দের ছিল না, সেটা বোঝা যায় এজাতীয় মন্তব্যে। প্রখ্যাত সমালোচক শ্রীভূদেব চৌধুরী মনে করেন– 'কবি জীবনানন্দ দাশও কথাসাহিত্যের জগতে সহজ অধিকারে প্রতিষ্ঠার দাবি প্রচ্ছন্ন রেখেই বিদায় নিয়েছিলেন।'[১] কিন্তু কবির মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে ক্রমাগত আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হতে থাকা গল্প জীবনানন্দের এই মনোভাবকে কতোটুকু সমর্থন জোগায়, তা বিশেষভাবে বিবেচ্য। সেই বিবেচনার ক্ষেত্রে তাঁর রেখে যাওয়া গল্পসমূহই হতে পারে প্রধান ও একমাত্র অবলম্বন। কবিতায় যে-জীবনানন্দ ইতিহাস-ভূগোল-পুরাণ এবং পুঁজিবাদী দুনিয়ার বিস্তীর্ণ পরিসর অবলোকন করেছেন, গল্পে তাঁর সেই বৈশ্বিক দৃষ্টি মূলত কেন্দ্রমুখী। এই কেন্দ্রিকতা সংকুচিত হতে হতে কবির একান্ত নিজস্ব নিবিড় মনোভূমে ঠাঁই নিয়েছে। কিন্তু জীবনানন্দের গল্প কেবল তাঁর নিজের গল্প নয়, আলো-অন্ধকার, স্বপ্ন ও জাগর চৈতন্যের মধ্য দিয়ে সেখানে ভিড় করেছে আধুনিক শেকড়হীন মানুষেরা। তাঁর গল্পগুলোতে আধুনিক নরনারীর সামাজিক ও মনোজাগতিক সংকটের বিরূপ প্রতিচ্ছবি যেভাবে উঠে এসেছে, তা একইসঙ্গে অভিভূত করেছে পাঠক ও বৌদ্ধিক সমাজকে। জীবনানন্দের গল্প মূলত তাঁর আত্মগত চৈতন্যের

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রোজেকশন হলেও সমকালীন নরনারীর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন জীবনযন্ত্রণার কথাও শৈল্পিক রূপ লাভ করেছে। অমলেন্দু বসু জীবনানন্দের গল্প সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন :

> জীবনানন্দ যে মানুষের স্বরূপ জানার জন্য এবং সেই জ্ঞান ভাষামাধ্যমে প্রকাশ করার জন্য প্রচণ্ড আলোড়ন বোধ করেছিলেন আপন চিত্তে, সে আলোড়নের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ অবশ্যই তাঁর কাব্যে, তবু তাঁর গদ্যকাহিনীগুলি একই দুর্দম আলোড়ন থেকেই উদ্ভূত।[২]

জীবনানন্দের গল্প রচনার কাল মূলত ১৯৩১ থেকে ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এর মধ্যে ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে কবি বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে অধ্যাপক হিসেবে সক্রিয় কর্মজীবনে ফিরে আসেন। এই পর্যায়ে তাঁর গল্প ব্যক্তিজীবনের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে সমাজ পরিধির বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। বরিশালের মফস্বলীয় জীবন এবং বিকাশমান কলকাতা– এই দুই প্রান্তের টানাপড়েনে জীবনানন্দ ছিলেন ত্রস্ত, দোলাচল। অন্যদিকে কলকাতার বৌদ্ধিক শ্রেণির সঙ্গে তাঁর সামাজিক সংযুক্তিও ছিল না বললেই চলে। অন্তর্মুখী জীবনানন্দ ছিলেন আপন বৃত্তে স্থির, প্রায় সমাজবিবিক্ত এবং নিঃশিকড়।

জীবনানন্দের ছোটগাল্পিক শিল্পদৃষ্টির নির্মাণে কল্লোলীয় চেতনার শুশ্রূষা পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে কাজ করেছে। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালে শূন্যগর্ভ সময়, ব্যক্তির মনোজাগতিক সংকট, জীবিকার অনিশ্চয়তা, চিরায়ত ধ্যানধারণা সম্পর্কে সংশয় ও জিজ্ঞাসা, যৌনবৈকল্য এবং সার্বিক নেতিবাচক পরিস্থিতির মধ্যে তীব্র হতাশা জীবনে তৈরি করে গভীর খাদ। সেই খাদে জমে ওঠা জীবনের পাঁকে কোথাও কোনো আলো দেখতে পাননি তিরিশের কবি ও লেখকরা। ফলে শিল্প যেন মর্বিডিটির স্মারক হয়ে ওঠে। আধুনিক মানুষের শেকড়হীনতার যন্ত্রণা এবং তার নিরাশ্রয় মনোভঙ্গি সাহিত্যে সৃষ্টি করে এক জলবিভাজিকা বা ওয়াটারশেড। এ যুগের অন্তর্নিহিত প্রবণতা সম্পর্কে গোপিকানাথ রায়চৌধুরী উল্লেখ করেছেন :

> এমনি করে একদিকে তারা জীবনের প্রচলিত মূল্যবোধ সম্পর্কে বিশ্বাস হারিয়েছে, নেতিবাচক সংশয়বোধে ভরে গেছে তাদের মন, তারা বিদ্রোহীর মত মাঝে মাঝে ভেঙে ফেলতে চেয়েছে যা কিছু পুরাতন সব। অন্যদিকে আবার উদ্ভ্রান্ত বিহ্বলতায় রোম্যান্টিকের মত সম্মুখের অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। হয়ত ঠিক নির্দিষ্ট কোন কিছুর নিশ্চিত প্রত্যাশায় নয়, যৌবনের স্বাভাবিক বিশ্বাসপ্রবণতার প্রেরণায়।[৩]

জীবনানন্দের গল্প কেবল কবির লেখা গদ্যকথন নয়, ঘটনার ইঙ্গিত ও ইশারার আকস্মিক উদ্ভাসনে জীবনের অজানা তথ্য ও মীমাংসার দ্যুতি জীবনানন্দের গল্পকে আলোকিত করেছে। রূপে ও আকারে নয়, প্রকৃতি ও স্বভাবে গল্প হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে মৌল প্রত্যয় হলো জীবনের অনুক্ত ইমপ্রেশনকে দ্যোতিত করা। যুদ্ধোত্তর কালের জটিল জিজ্ঞাসার উন্মোচনে ভাষার ইঙ্গিতময় সূক্ষ্মতা এবং প্রতীকায়নের নৈপুণ্য সৃষ্টিতে জীবনানন্দ কল্লোলীয় ভাষাকাঠামোর সমীপবর্তী হয়ে ওঠেন। ব্যক্তির মনোগহিনের অপরিচিত অনুভূতির প্রকাশে ভাষাও হয়ে ওঠে কতগুলো চিহ্নের সমষ্টি। কিন্তু এই চিহ্নভাষার অভিমুখ বা গতিপথ নরনারীর অন্তর্গূঢ় জটিলতার স্তর লক্ষ্য করেই প্রকাশোন্মুখ।

জীবনানন্দের গল্প ভাষার সরল-জটিল প্রতীকায়নের সাহচর্যে স্বকীয়। *কল্লোলের* লক্ষ্যকেই জীবনানন্দ ধারণ করেছেন লেখায়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে বলেছেন :

> 'কল্লোলকে' নিয়ে যে প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাস এসেছিল তা শুধু ভাবের দেউলে নয়, ভাষারও নাটমন্দিরে। অর্থাৎ 'কল্লোলের' বিরুদ্ধতা শুধু বিষয়ের ক্ষেত্রেই ছিল না, ছিল বর্ণনার ক্ষেত্রে। ভঙ্গি ও আঙ্গিকের চেহারায়। রীতি ও পদ্ধতির প্রকৃতিতে। ভাষাকে গতি ও দ্যুতি দেবার জন্য ছিল শব্দসৃজনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। রচনাশৈলির বিচিত্রতা। এমন কি, বানানের সংস্করণ। যারা ক্ষুদ্রপ্রাণ, মূঢ়মতি, তারাই শুধু মামুলি হবার পথ দেখে–আরামরমণীয় পথ–যে পথে সহজ খ্যাতি বা কোমল সমর্থন, যেখানে সমালোচনার কাঁটা-খোঁচা নেই, নেই বা নিন্দার অভিনন্দন। কিন্তু 'কল্লোলের' পথ সহজের পথ নয়, স্বকীয়তার পথ।[৪]

জীবনানন্দের গল্প প্রবলভাবে ব্যক্তিপ্রধান এবং আত্মজৈবনিক। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সমকালীন সাহিত্যচিন্তার আঁচ থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন ছিলেন। কল্লোলীয় শিল্পদৃষ্টির উত্তরাধিকার যেমন তাঁর কবিতায় প্রবল হয়ে উঠেছিল, তেমনি গল্পরচনার সূচনালগ্নে লিবিডোচেতনা তাঁকে সমকাল-অন্তর্গত করে তোলে। জীবনানন্দের প্রথম গল্প 'ছায়ানট' ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয় বলে জানা যায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন যে, এ গল্প মিথুন-সমীক্ষণের এবং মৈথুন শক্তির প্রেরণাকেই জীবনের মুখ্য প্রেরণা হিসেবে গ্রাহ্য করা হয়েছে। রেবা, ডাক্তার, কবি এবং স্বয়ং লেখককে ঘিরে এ গল্পে যে পরিসর গড়ে উঠেছে তা' এক বিমিশ্র মৈথুন জগৎ। এখানে সম্পর্কের সূত্রগুলো অচেনা–লিবিডোতাড়নায় রেবা ও ডাক্তার তৈরি করে মৈথুন চিত্র। লেখকের প্রতি রেবার একধরনের কন্যাসুলভ বাৎসল্যের প্রকাশ লক্ষ করা গেলেও লেখক অনুভব করেন অবচেতনায় রক্তের ভেতর তার অজান্তেই অন্য এক কামনার জন্ম হয়। পাশের ঘরেই ডাক্তারের সঙ্গে ভোগতৃপ্ত রেবার দিকে তাকিয়ে লেখক-নায়ক নিজের রুগ্‌ণ জীবনের জানালায় খোলা আকাশটিকে আবার ফিরে পেয়েছিলেন। এই গল্পের গোড়ায় ফ্রয়েডীয় লিবিডো-মনস্তত্ত্বের উপস্থিতি প্রবল এবং কল্লোলীয় জীবনাবেগের সঙ্গে তা' সন্দেহাতীতভাবে সম্পর্কিত।

এক বিমূঢ় কালের কবি জীবনানন্দ। ক্ষুব্ধ ও অনির্দেশ্য সময়ের এক অনিবার্য ছায়া তাঁর কবিতা ও গল্পে ছড়িয়ে আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের বৈরী বাস্তবতা ও অর্থনৈতিক চাপ জীবনের বাঁধা ছককে তছনছ করে দেয়। ভঙ্গুর বিন্যাসহীন অব্যবস্থিত সমাজ চেপে ধরে ব্যক্তির অস্তিত্বকে। জীবনানন্দও এই সময়ের চাপে ভেঙে পড়া এক মানুষ। বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক জীবনে কখনোই সুস্থির হতে না-পারা জীবনানন্দ পুঁজিবাদী সমাজের মৃগয়ায় সফল হতে পারেননি। পারিবারিক-সাংসারিক জীবনে ছিল সেই অসন্তোষ ও ব্যর্থতা। কবিতার মতো তাঁর গল্পেও প্রেম, দাম্পত্য সংকট, নৈঃসঙ্গ্য, বিচ্ছিন্নতা ও মৃত্যুময়তার অনুষঙ্গ মুখ্য হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির চিত্রময়তা এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা জীবনানন্দের গল্পে ব্যক্তিজীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। প্রকৃতি প্রখরভাবে সংবেদনশীল তাঁর গল্পে এবং ব্যক্তির নির্জন মনের যন্ত্রণা-একাকিত্বের উন্মোচনে প্রকৃতি রসপরিণামী সংকেত তৈরিতে প্রভাবক হয়ে উঠেছে।

প্রেম, দাম্পত্য জটিলতা, ব্যক্তির নৈঃসঙ্গ্য. হতাশা, অবসাদ, বিমর্ষতা এবং সমকালের বাণিজ্য পুঁজির দাপটে পিছিয়ে পড়া মানুষের সামগ্রিক ব্যর্থতাবোধের পটভূমিকায় জীবনানন্দের একাধিক গল্প রচিত হয়েছে। বিশেষ করে প্রেমের বহুমুখিতা, প্রেমের আকাঙ্ক্ষা ও তার ব্যর্থতা, পুরোনো প্রেমের স্মৃতিকাতরতা, প্রেমিক-প্রেমিকার বিগত দিনের ঘনিষ্ঠতা, আগ্রহ ও তুচ্ছতার তীব্র বিধুরতা জীবনানন্দের গল্পে প্রবলভাবে ছায়া ফেলেছে। জীবনানন্দীয় এই প্রেম সম্পর্কে সমালোচকের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য :

> জীবনানন্দের ছোটগল্পে প্রেম অনির্বচনীয় মৃগনাভি যন্ত্রণা, যার আহ্বানে থাকে আনন্দ-সুগন্ধ ও অনিবার্য মরণাকর্ষণ। জীবনের প্রাত্যহিকতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে প্রেমের পবিত্র স্নানে স্নিগ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রতিটি চরিত্রের। কিন্তু যুদ্ধোত্তর জীবনে মানবীয় বিপর্যয় ও মূল্যবোধের সামগ্রিক ধসের মুখোমুখি হয়ে ভাবনাপ্রতিভায় শীর্ষস্পর্শী নরনারীর হৃদয়সংকটের কার্যকারণ-ফলাফল গল্পের বিষয়বস্তু।[৫]

'মাংসের ক্লান্তি' গল্পে দাম্পত্য সম্পর্কের জটিল রূপটি প্রত্যক্ষ করা যাক। এক ভঙ্গুর অসম সমাজকাঠামোয় স্থাপিত ব্যক্তিসম্পর্কের টানাপড়েন 'মাংসের ক্লান্তি' গল্পে উঠে এসেছে। প্রত্যাশিত ব্যবস্থা কিংবা পরিবেশ আয়ত্তের মধ্যে না থাকলে ভিন্ন বাস্তবতাকে মেনে নিতে হয় বটে কিন্তু কোনো ব্যক্তিস্বরূপই তাতে তুষ্ট থাকে না। ফলে দাম্পত্যসম্পর্কের মধ্যে হৃদয়হীনতা জন্ম নেয়, তৈরি হয় মাংসের ক্লান্তি ও গ্লানি। হেম ও অমূল্যর সাংসারিক সম্পর্ক চোরাবালির ফাটলে আটকে পড়া। তাই অমূল্য আলাদা বিছানায় শয়ন করে। বিয়ের পর অল্পদিন শরীরী উত্তেজনায় মেতে থাকলেও তাতে দ্রুতই ধস নামে। অমূল্য যেমন তাকে হৃদয় দিয়ে চর্চা বা অনুশীলন করেনি, হেমও তেমনি জীবনের মধুর প্রাত্যহিকতা থেকে তাকে দূরে ঠেলে দেয়। ফলে অমূল্যর প্রতিদিনের ইচ্ছেগুলো ভীষণভাবে ব্যর্থ হয় হেমের কাছে, হেমের চেহারার ভেতর থেকেও বেরিয়ে পড়ে অচেনা এক আদিমতা। 'চেহারার ভেতর কেমন একটা wild look-এর ওষুধ-বিষুদে বিশেষ কিছু–বিশেষ কিছু আর কেন? একেবারেও কিছু হবে না। চেঞ্জের দরকার, রাঁচি সুট করবে।'[৬] সময় ও বাস্তবতার কাছে পরাজিত হয়েছে বলে হেমের গানও কাউকে আর আকৃষ্ট করে না। ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো হেম পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে একসময়। এই ভঙ্গুর সময়ের চক্রে ব্যক্তির বিপন্নতা এ গল্পের প্রতিপাদ্য হয়ে ওঠে।

'বেশি বয়সের ভালোবাসা' ক্ষয়িষ্ণু সময় ও শূন্যতার গল্প। আভা ও তার সেজদার কথোপকথনে শিল্প, শিক্ষা, শিক্ষকতা এবং জীবনের অপরাপর বিষয় উঠে আসলেও মৌলিক জিজ্ঞাসায় তারা উভয়েই অমীমাংসিত এবং বৃত্তচ্যুত। এক প্রচ্ছন্ন বোহেমিয়ানিজম তাদের দুজনকেই ভেতরে ভেতরে উন্মূল করে রাখে। বি.এ পাস করে একাধিক চাকরি এবং সবশেষে শিক্ষকতায় স্থিত আভা, অন্যদিকে মেজদা আইসিএস, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডক্টরেট সবকিছুতেই ব্যর্থ হয়ে লন্ডনের একটি ইউনিভার্সিটি থেকে সামান্য একটি ডিগ্রি নিয়ে আসে। আভার সাহিত্যসৃষ্টি নিয়ে মেজদার আগ্রহ থাকলেও তিনি যে আর্টের প্রতি খুব নিষ্ঠাবান বা অনুভূতিশীল তা মনে হয় না। আভাকে

লেখালেখিতে তেমন উৎসাহিতও করেন না। এক ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের কথা বলে আভাকে বিয়ের জন্য আগ্রহী করে তোলার চেষ্টা করলেও আখ্যান শেষ হয় গভীর নিঃস্বতার মধ্যে :

> সুহৃৎ জানে আভাকে নিয়ে বিধাতার মতো সেও আজ একটু খেলল, ড্রয়িংরুম গুছানো হবে, সন্ধ্যা উৎরে যাবে, রাত হবে, মেয়েটি ছটফট করবে, কিন্তু তবুও আভার জীবনে কোনো রাজকুমার মন্ত্রীকুমার কোটালকুমারও নেই, ইঞ্জিনিয়ার নেই, কী আছে? অনেক অলিগলি দিয়ে হয়ত আরো গল্প লিখে কবিতা লিখে ফ্লার্ট করে একজন বুড়ো মাস্টার হয়ে মরতে হবে আভাকে, একজন বুড়ো মাস্টার হয়ে মরতে হবে সুহৃৎকে।[৭]

শূন্যতাও কখনো কখনো জীবনের বহুমাত্রিক সত্যকে স্পষ্ট করে। আভা ও তার মেজদার জীবনের অর্থহীনতার মধ্য দিয়ে জীবনানন্দ আধুনিক যন্ত্রণাতাড়িত মানুষের মনোজগতের বাস্তবতাকে ধরতে চেয়েছেন।

'সোনালি আভায়' দিকনির্দেশহীন অন্ধকারময় জীবনের কাছে ফিরে ফিরে আসার গল্প। সতীশের জীবন নিরানন্দ একাকিত্বের, মা কাছে থাকেন না সতীশের– যদিও সতীশ চেষ্টা করে মায়ের নির্দেশ মেনে চলতে ও তার চাওয়াগুলোকে পূর্ণ করতে। বাসার কাজের ছেলে তারাপদর সঙ্গে সতীশের সমস্ত ভাব বিনিময় এবং মতের আদানপ্রদান। গ্রন্থকীটের মতো বেশিরভাগ সময় বই পড়া এবং সোডা সেবন করার মধ্য দিয়ে সতীশ জীবনের অর্থ খুঁজে পেতে চেষ্টা করে। একধরনের মর্বিডিটি তার সমস্ত দেহে-মনে। অনেক লোকের সংসারে বাস করতো বলে একদিন সতীশ নির্জনতা খুঁজতো কিন্তু এখন সে নিঃসঙ্গ। মা তার কাছে থাকেন না, স্ত্রী-সন্তান-পরিজন কেউ নেই। এই ক্লান্ত আটপৌরে জীবনে সতীশ মগ্ন হয় আত্মরতিতে। নির্জনতার অন্ধকারে হারিয়ে যায় সতীশের সোনালি আভা। গল্পের প্রান্তিক উক্তিতে সতীশ বলছে, –'সমস্ত দিন অফিসে কাটিয়ে গোধূলিবেলায় আমার ঘরের ডেকচেয়ারে আবার এসে বসলাম। কেমন একটা সোনালি আভায় ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছি।'[৮] ক্ষয়িষ্ণুতার মধ্যে নিমজ্জিত হতে চাওয়া মানুষদের মতো সতীশ এ গল্পে বিপন্নতার অভিমুখী।

প্রেম ও লিবিডোর দ্বন্দ্বে তাড়িত তারানাথের মনোদৈহিক বিকারের গল্প 'ভালোবাসার সাধ'। বিয়ের পর প্রথম স্ত্রী অন্যত্র চলে যাওয়ায় চল্লিশ বছর বয়সেও তারানাথ বিপত্নীক। দেহের বয়স বাড়লেও দৈহিক বাসনার অবসান হয়নি তার। ফলে মনোদৈহিকতার অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন লিবিডো প্রায়শ তপ্ত ও জোরালো রূপ নেয়। তাই বাসার কাজের ছেলেটির জায়গায় তারানাথ একজন স্ত্রীলোককে ঠাঁই দিতে চায়। তারানাথের এই আগ্রহের কারণ তার অন্তর্গত যৌনাসক্তি। মানবেন্দ্রবাবুর বাসায় কাজ খুঁজতে আসা সুশ্রী নারীটিকে দেখে তারানাথ গোপনে কামনাসক্ত হয়ে পড়ে। বড় দাদার জেরার মুখে তারানাথ স্বীকার করে :

> মানবেন্দ্রবাবুর বাসায় সে কাজ খুঁজছিল। মানববাবুরা এখান থেকে উঠে যাচ্ছেন। এ ঝি-টার কথা তিনি আমাকে রাখুন। পাঁচ টাকা মাইনেয় সব কাজ করতে রাজি আছে। খুব খাটতে পারে, বেশ পরিষ্কার, ব্যবহার ভালো, এইসব বলছিলেন তিনি।...

> কিন্তু এইসবের জন্য নয়, মেয়েটির বাইশ-তেইশ বছর মাত্র বয়স। দেখতে বেশ সুস্থ এবং—'একটু চুপ করে থেকে কাকা —'সুশ্রী।'[৯]

নারীটি সম্পর্কে তারানাথের স্বীকারোক্তি অকপট। সে বলেছে, 'একবার এ বাড়ির কাজে লেগে গেলে নিজেকে সামলাতে পারতুম না হয়তো।'[১০] এবং পরিশেষে স্পষ্ট হয় তার তীব্র ইন্দ্রিয়তাড়না— 'কিন্তু বুঝলুম মায়াममতাই নয়, চাচ্ছি অন্য কিছু।'[১১] কেবল সুশ্রী এই নারীটিই নয়, তারানাথের বাসনাবহ্নি তাকে কোলকাতার নিষিদ্ধ পল্লিতে পর্যন্ত নিয়ে যায় বহুকাল আগে এবং তার এই বহুগামিতাই তার জীবনের চূড়ান্ত ট্রাজেডিকে নিশ্চিত করে: 'স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিন-চার মাস পরে আমি একবার কলকাতায় গিয়েছিলুম। মনের অবস্থা ভালো ছিল না তখন। কলকাতার থেকে একটা গোপন রোগ নিয়ে আমি ফিরেছি। তারপর বিয়ে করবার কোনো পথ নেই আমার।'[১২] পুঁজিবাদী সমাজের ঔপভোগিক প্রলোভন তারানাথের ব্যক্তিঅস্তিত্বের অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করে তোলে।

'অশ্বত্থের ডালে' গল্পটির আবহ অতিপ্রাকৃতধর্মী। অন্ধকার ও শীতের জ্যোৎস্নারাতের পটভূমিকায় এক রহস্যময় কবিতার ঘোর তৈরি করেছেন গল্পকার এবং এই কাব্যগন্ধী বাস্তবতার মূলে নির্মলের বিচ্ছেদ ও নৈঃসঙ্গ্যযন্ত্রণার উন্মোচন লক্ষ করা যায়। পাড়াগাঁয়ের নির্জনতায় গভীর রাতে পেঁচার ডাক শুনে তন্দ্রাহতের মতো নির্মল বেরিয়ে আসে এবং পাশেই মজুমদারদের শূন্য বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়। সেখানকার পাহারাদার বংশলোচনের কাছে জানা গেল হরনাথ মজুমদার এবং তার স্ত্রীই মৃত্যুর পর পেঁচা হয়ে গাছে ঠাঁই নিয়েছেন। মজুমদার দম্পতির যৌথ দাম্পত্যের বিপরীতে নির্মলের একাকিত্ব ও বিচ্ছিন্নতা যেন প্রকট রূপ নেয়। কারণ :

> ঘরের উত্তর দিকের একটা কোণে আমার কোঠা। ছোট্ট একটা কোঠা। একটা টেবিল রয়েছে, একটা চেয়ার, বইয়ের আলমারি একটা, আর খাট একখানা। আমি একাই এখানে থাকি। বিয়ের আগে যেমন ছিলাম, তেমনই আছি। নিজেকে অবিবাহিত একাকী মানুষ ভাবতে বেশ লাগে।[১৩]

মজুমদার দম্পতির প্রেম মরণোত্তর সময়ে টেকসই হলেও শিল্পতাড়িত প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক সময়ে নির্মলের একাকিত্ব ও বিচ্ছিন্নতা তীব্র হয়ে ওঠে। যুগযন্ত্রণার কালো অমোঘ ছায়া ব্যক্তির জীবনকে নখরবিদ্ধ ছিন্নভিন্ন ক'রে ক্ষণস্থায়িত্বের দিকে ঠেলে দেয় বলে নির্মল বিচ্ছিন্নতার মধ্যে প্রশ্রয় খোঁজে।

জীবনের অর্থহীনতা ও বীতস্পৃহার মধ্যে নিমজ্জমান ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক বৈকল্যের আখ্যান 'কুড়ি বছর পরে'। কয়েক বন্ধুর আত্মমগ্ন স্মৃতিচারণা এমন এক বিন্দুতে পৌঁছায় যেখানে অপেক্ষা করে বিষাদ, ক্লান্তি, বিশ্বাসহীনতা এবং অন্তর্গত ভঙ্গুরতা। এই গল্পটিকে মানুষের সত্তাসন্ধানের গল্পও বলা যায়। অনেক স্বপ্ন-স্মৃতি-রোমাঞ্চ ও বিগত দিনের তীব্র শিহরনের পথ পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত মানুষ এমন একটি বাস্তবতায় উপনীত হয় যেখানে সমস্ত অস্তিত্বকে গ্রাস করে আছে উদ্দেশ্যহীনতা, ভাঙন এবং নৈঃসঙ্গ্য। নীরেন, পীতাম্বর, অনিল এবং গল্পকথক শিবরাম স্কুলজীবনের স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে পুরোনো বন্ধুদের কথা স্মরণ করে। এভাবেই তারা খুঁজে পায় ঈশ্বর শর্মা ও যোগেশ বন্ধুদ্বয়কে। কিন্তু তাদের সব থেকে প্রথাবিরোধী ব্যতিক্রমী বন্ধু অবিনাশ এক বিস্ময় নিয়ে শিবরামের মুখোমুখি হয়। মহানগর কলকাতার ল্যান্সডাউন রোডে শিবরাম অনেক সাধ্যসাধনা করে তার দেখা

পায়। প্রথম সাক্ষাতেই বিনাশ শিবরামকে বলে, 'আমার এখানে দু-একটি পরলোকের আত্মা আসেন, আমি তাদের সঙ্গেই থাকি।'[১৪] এই অপ্রাকৃত আবহ গল্পে রহস্যময়তার জন্ম দেয় এবং শিবরাম বুঝতে পারে, অবিনাশ যে জগতের কথা বলছে তা কখনো স্বাভাবিক মানুষের কাম্য নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বৈনাশিক বাস্তবতায় ব্যক্তির মনোজগতে তৈরি হয় ধস এবং এবং ক্ষয়, হতাশা ও রুগ্‌ণতা জন্ম দেয় বৈকল্যের। ফলে অবিনাশ ঘোষাল এখন আর অন্ধকারের কোনো বিকল্প খুঁজে পায় না। তার সামনে যে পৃথিবী, তা অচেনা এবং কোনো ইশারা নিয়ে আসতে পারে না তা। আলোস্নিগ্ধ রোমান্টিকতার জগৎ থেকে পলাতক হয়েছে অবিনাশ এবং একারণেই তার মীমাংসা–

> এ পৃথিবীতে এমন কোনো কাজ থাকতে পারে না যার জন্যে অন্ধকারের ভিতরেও আলো জ্বালতে হয়। শিবরাম, তুমি কিছুই জান না। তুমি আমার সঙ্গে থাক। আমি তোমাকে এমন জিনিস বুঝিয়ে দেব। তারপর ক্রমে ক্রমে দেখতে পাবে সব। এমন শান্ত সুন্দর সংসর্গ পাবে যে কিছুতেই আর পৃথিবীতে ফিরে যেতে চাইবে না তুমি।[১৫]

'কোনো গন্ধ' এক প্রত্যাশাহীন ফিকে জীবনের কথকতা। সুধীশ ও কাঞ্চনমালার দাম্পত্যজীবন চোরাবালির গভীরে নিমজ্জিত। ভিন্ন বিছানায় রাত কাটায় যে সুধীশ, তার বৈবাহিক জীবন বহু আগেই ভেঙে চৌচির, –'দরজা খোলাই ছিল। আস্তে আস্তে নিজের বিছানায় গিয়ে ঢুকল সে। বিবাহিত হয়েও একা বিছানায় একা শোবার সুবিধা তার হয়েছে। তার কারণ বিয়েটা গেল বোশেখের আগের বোশেখে হয়েছে, ছাতকুঁড়োর সোঁদাল গন্ধ ধরে গেছে দাম্পত্য জীবনের ওপর, বোঝা যায় না, সেটা মিষ্টি না তেতো, কিন্তু পুরনো বটে, ঢের পুরানো।'[১৬] গল্পকার জীবনানন্দ আখ্যানটিতে বাস্তবতা ও রোমান্টিকতার যৌথ বিন্যাসে সুধীশ ও কাঞ্চনমালার মিশ্র জীবনাবেগকে উন্মোচন করেছেন। নির্জন রাতের পটভূমিকায় রোমান্টিকতার মায়াকল্প সৃষ্টি করলেও গল্পটির কেন্দ্রীয় টান জীবনের ব্যর্থতা ও লক্ষ্যহীনতার দিকে। জীবনানন্দের গল্পে ফুটে ওঠা রোমান্টিক বস্তুজগৎ বর্ণিল ও বহুমাত্রিক। কিন্তু এই মায়াবী রোমান্টিকতা ইতিবাচকতার অভিমুখী নয়। পরপর তিনদিন কলেরার ডিউটি করে আসলেও সুধীশ সময়মতো এককাপ চা পায় না, 'সুধীশের শরীরটা মোটেই ভালো লাগছিল না। ঘুমের থেকে উঠে বিছানার ওপর খানিকক্ষণ সে বসে রইল। কেউ চা তৈরি করে আনেনি। বস্তুত সুধীশ ঘুমুচ্ছে কি জেগে উঠেছে সে সব জেনে দেখবার কোনো কৌতূহলও কারু নেই।'[১৭] এই হতাশানিমজ্জিত সময়ের কালো অন্ধকার কাটিয়ে সুধীশ জেগে ওঠে শ্যালিকা শুভার আবির্ভাবে। বিমর্ষতায় ন্যুব্জ সুধীশ শুভার মধ্যে আনন্দ ও মুক্তির ইশারা দেখতে পায়। সে বলেছে, 'এই কদিন ফিনাইল আর স্টুলের গন্ধে ভুলে গিয়েছিলাম যে পৃথিবীতে ভরসাজনক কোনো গন্ধও আবার আছে নাকি?'[১৮] এই মুক্তি ও উচ্ছ্বাস সুধীশের প্রেমহীন জীবনের একমাত্র খোলা বাতায়ন।

নরনারীর উজ্জীবিত প্রেম ও তার ক্ষয়িষ্ণুতার অনুভূতি জীবনানন্দের গল্পে পৌনঃপুনিকভাবে উঠে এসেছে। একদা ঘনিষ্ঠতর প্রেম ও ব্যাকুলতা বাস্তবতার সংযোগে মৃতকল্প হয়ে ওঠে এবং প্রণয়বিহ্বল নরনারী ক্রমশ দূরাগত হয়ে ওঠে। 'কুয়াশার ভিতর মৃত্যুর সময়' কিংবা 'উপেক্ষার শীত'

গল্পদুটি বীতপ্রণয়ের দীর্ঘশ্বাসে কাতর। 'কুয়াশার ভিতর মৃত্যুর সময়' গল্পটিতে বিনোদ ও সরোজিনীর দাম্পত্য জীবনের কথা প্রসঙ্গক্রমে বিবৃত হয়েছে, গল্পের প্রতিপাদ্য হয়েছে বিনোদ তথা হিমাংশু ও অরুণার বিগত প্রণয়ের স্মৃতিকথা। নিজের জীবনকথা নিয়ে গল্প লিখতে গিয়ে বিনোদ নিজেই হয়ে যায় হিমাংশু। আর তার প্রণয়িনী অরুণা। কিন্তু হেমন্তের বিষণ্ন দিনের ঝরা পাতার মতো একদিন হিমাংশুও উপলব্ধি করে, –'অরুণার ভালোবাসা ফুরিয়ে যাচ্ছে।'[১৯] অরুণার উপেক্ষা ও অবহেলা হিমাংশুর আবেগের স্ফুলিঙ্গকে নিবিয়ে দেয়। ফলে সরোজিনীকে বিয়ে করে হিমাংশু তথা বিনোদ বিগত স্মৃতিময়তা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। রোমান্টিক প্রণয়ে স্বল্পস্থায়ী মোহ শেষ পর্যন্ত পরিণতি পায় না। এ কারণে দেখা যায়, –'কিন্তু সে ভালোবাসা এখন আর নেই; অরুণাও যখন বিয়ে করল, তখন তেমন কিছু একটা আঘাতও লাগেনি বিনোদের।'[২০] সময়ের চক্রে জীবন নতুনভাবে নিজেকে মেলে ধরে এবং সেই পরিক্রমায় ক্ষয় হতে থাকে প্রেম-আবেগ ও পুরোনো সত্য। তাই বিনোদও অরুণার উত্তপ্ত প্রেম এখন ধূসর ও মৃতকল্প।

'উপেক্ষার শীত' গল্পটিও প্রেমহীনতার আখ্যান। শরদিন্দুর বিবাহ অনুষ্ঠানে তার প্রেমিকা অরু সেনগুপ্তও এসে হাজির। প্রেম-অপ্রেম, আবেগ-আবেগহীনতা, আকর্ষণ ও বিকর্ষণের মধ্য দিয়ে এই দুজনের সম্পর্কসূত্র চিহ্নিত। হেমনলিনীকে বিয়ে করে শরদিন্দু দাম্পত্য জীবনের সূচনা করতে চাইলেও তার মনোজগতে অরুর স্মৃতি উজ্জ্বল। দুজনের প্রেমে অনিশ্চয়তা এবং সংশয় শরদিন্দু বা অরুকে কোনো নিশ্চিত গন্তব্যে পৌঁছে দেয় না। শরদিন্দু অরুকে বিয়ের আগে বলে, 'যে সময় তোমাকে ভালোবাসা দিতে পারবো না আর, তার ঢের আগেই আমার ভালোবাসাকে তুমি অপ্রয়োজনীয় মনে করবে, আজই হয়তো করছ–কিছু কিছু অন্তত'[২১] এ আখ্যানে অরু-শরদিন্দুর প্রণয়চর্চা আছে, প্রেম নেই সত্যিকার অর্থে। ফলে সমস্ত আখ্যানে প্রেমের ক্লান্তি-বিষণ্নতা ও নৈরাশ্যের আবহ দুজনকে ঠেলে দেয় অমীমাংসায়, দ্বিধায়, গন্তব্যহীনতায়।

প্রচ্ছন্ন টোটেমিক আবহে সত্য হয়ে ওঠা নিয়তিবোধ 'প্যাঁচা ও জোনাকিদের মধ্যে' গল্পে ছায়া ফেলেছে। জীবনের ব্যর্থতা, নৈঃসঙ্গ্য ও পরাভবের বিষণ্নতা গল্পে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এক মুখ্য মোটিফ হিসেবে। সন্তানহীন সুধাংশু ও নির্মলার দাম্পত্য জীবন নিরানন্দভাবে কেটে যায়। কিন্তু স্ত্রী নির্মলা নিজের ওপর অনুভব করে পারিবারিক ও সামাজিক চাপ। পাঁচ বছরেও মা হতে না পারার ব্যর্থতার জন্যে তাকেই দায়ী মনে করা হয়। এই চাপ নির্মলাকে এক প্রান্তিক পরিস্থিতিতে ঠেলে দেয় এবং একধরনের নিয়তিবোধ তাকে ক্রমাগত আচ্ছন্ন করতে থাকে। নির্মলার এই নিয়তিবোধেরই প্রকাশ লক্ষ করা যায়– 'আমি আর বেশিদিন বাঁচব না, কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে তুমি বিয়ে করো।'[২২] দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসা নির্মলার এই উচ্চারণের মধ্যে তার অব্যক্ত যন্ত্রণার ইঙ্গিত উপেক্ষার নয়। কিন্তু অনবরত নীরব জ্বরের পথ ধরে নির্মলা তার গোপন নিয়তির ডাক শুনতে পায়। আপিং যে ব্যাধি সারাতে পারেনি, নির্মলা তার অবসান খুঁজে নেয় আত্মহননের মাধ্যমে– 'তিন ঘণ্টার ভিতরেই সে শেষ হয়ে গেল।'[২৩] মৃত্যুর পর পেঁচা আর জোনাকির রূপে নির্মলা বিভ্রম ছড়ায় সুধাংশুর মধ্যে। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারায় নানারকম প্রাণী, উদ্ভিদ, বৃক্ষ, গাছ-গাছড়া, ফল-মূল প্রভৃতিও

টোটেম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এদেশীয় চিন্তায় ও সংস্কারে পেঁচা নিয়তি ও মৃত্যুবোধের প্রতীককল্প হিসেবে বিবেচিত। জীবনানন্দের কবিতা ও গল্পে পেঁচার মোটিফ নানা মাত্রায় উপস্থিত। আলোচ্য গল্পে নির্মলা মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে পেঁচার মধ্যেই আশ্রয় নিয়েছে বলে সুধাংশুর ধারণা। তার মনে হয়েছে– 'জোনাকিগুলো নিভে যায়, জ্বলে ওঠে, ডালপালার ভিতর পিছলে পিছলে পড়ে, যেন কোনো শিশু খেলা করছে তাদের সঙ্গে। খুব শিশুসুলভ হৃদয় ছিল কল্যাণীর, কত খেলাই না সে খেলত। এখন মৃত্যুর পর বুঝি জোনাকি পেঁচা আর জটাওঅলা গাছের পিছু নিয়েছে।'[২৪] নির্মলাকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে সুধাংশুর মনোজগতে টোটেমীয় ধারণার প্রাচীন ছায়া পরোক্ষে লক্ষণীয়।

জীবনানন্দের গল্পে রোমান্টিকতার লঘু হাওয়া তেমন প্রত্যক্ষ করা যায় না। ভীতসন্ত্রস্ত ভেঙে পড়া মানুষের অভিব্যক্তিই তাঁর গল্পের পরিসরজুড়ে ব্যাপ্ত। হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তির প্রচ্ছন্ন যন্ত্রণা ও পীড়ন জীবনানন্দীয় গল্পের পটে মুখ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু এসবের মধ্যেও বাসন্তী হাওয়ার ইশারা মেলে তাঁর গল্পে। 'প্রণয়হীনতা' গল্পটি এক উন্মুক্ত খোলা জানালা। রোমান্টিক মৃদু হাওয়ার স্পর্শে এ গল্পে অদৃশ্য হয়ে গেছে সুধাংশুর মনোবেদনা। একদা কংগ্রেসকর্মী সুধাংশুর বোহেমিয়ান জীবনে এখন আর কোনো পিছুটান নেই। দিল্লিযাত্রার পথে সুশ্রী লাবণ্যময়ী নির্মলার সঙ্গে পরিচয় ও কথালাপ সুধাংশুর লক্ষ্যহীন জীবনে মুহূর্তের জন্য নিয়ে আসে গভীর আনন্দ ও রোমাঞ্চ। কিন্তু এই রোমাঞ্চ তাকে আর বিদিশা বেপথু করে তোলে না। ধাবমান ট্রেনের গতি ও শব্দের সঙ্গে সুধাংশুর জীবনের হঠাৎ জেগে ওঠা কোমল অনুভূতিও স্থায়ী হয় না। কারণ ততোদিনে সুধাংশু জেনে গেছে– 'মিছেমিছি কথা বাড়িয়ে, গল্প বাড়িয়ে মায়া বাড়িয়ে কি লাভ? হৃদয়াবেগ নিয়ে খেলা করতে গেলে দুঃখ পেতে হয় শুধু'।[২৫] জীবনানন্দ গ্রামীণ ও মফস্বলীয় পটভূমিকায় অধিকাংশ আখ্যান সৃষ্টি করলেও শহুরে বা নাগরিক পরিসরও তাঁর গল্পে অনুপস্থিত নয়। কলোনিয়াল কলকাতার উঠতি চাকচিক্য লেখকের দৃষ্টির অগোচর ছিল না। সেই পর্যবেক্ষণ তাঁর বেশকিছু গল্পে বিধৃত হয়েছে। 'গ্রাম ও শহরের গল্প'টির আখ্যান গড়ে উঠেছে মেট্রোপলিটান আবহে। গল্পের ল্যান্ডস্কেপ নাগরিক, বস্তুবিন্যাস, শব্দচয়ন ও পিকটোরিয়াল ন্যারেটলোজিতে ঔপনিবেশিক মহানগরীর প্যাটার্নই স্পষ্টতা পেয়েছে। গল্পের সংকটটিও নাগরিক জটিলতা-আশ্রয়ী। বহু আগে বকমোহানা নদীর তীরে পাঁড়াগায়ের নিবিড় নির্জনতায় সোমেন ও শচীর যে প্রণয় গড়ে উঠেছিল, সেই সম্পর্ক ভেঙে এখন শচী প্রকাশের স্ত্রী। বন্ধু প্রকাশের কাছে স্বল্প বেতনে পত্রিকার চাকরি খোঁজার সূত্রে সোমেনের অবির্ভাব। প্রকাশের অনুপস্থিতিতে সোমেন শচীর ঘনিষ্ঠ হয়। শচীর মধ্যে পুরোনো প্রেম জাগ্রত হয়, সে ফিরে যেতে চায় বকমোহানা নদীর ধারে। কিন্তু ভাবালু রোমান্টিকতার অন্তঃসারশূন্যতাকে সোমেন পাত্তা দেয় না। বিগত দিনে শচী ও সোমেন দৈহিক সম্পর্কে মেতে উঠলেও সোমেন জানে :

> আজকে সে শচীকে পুরোপুরি নিজের যে কোন প্রয়োজনে লাগাতে পারে–শচী সেজন্য প্রস্তুত–ব্যাকুল কিন্তু এই সোফার ওপর? বকমোহানা নদীর ধারে যা একদিন হয়েছিল বনজঙ্গলের আবছায়ায় নক্ষত্রের নিচে জলের গন্ধের কাছে?
>
> ভাবতে গেলেও ব্যথা–ভাবতে গেলেও ব্যথা।

> এই কামরার ভেতর এক মুহূর্তের জন্যও আর টিকে থাকতে পারছে না। সোমেন একটা হ্যাভেনা নিয়ে এক মুহূর্তের ভিতরেই রাস্তায় উঠলো গিয়ে।[২৬]

এই গল্পের টেকচারে গুরুত্ব পেয়েছে শহুরে মোটিফ। কলোনিয়াল পুঁজির প্রভাবে গড়ে ওঠা মহানগর কলকাতার আধুনিকায়নের চিত্র শচীর চোখে ধরা পড়েছে এভাবে :

> বড় রাস্তার দিকের জানালাটার পাশে এসে রাতের কোলকাতার দিকে একবার তাকাল সে—ট্রামলাইনগুলো খালি পড়ে আছে—রাস্তার সেই বিরাট হাঙরদের এখন ঘুমোবার সময় ...হু হু করে দুটো ট্যাক্সি পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে—তাদের কাছে মহিষের গাড়িগুলোর অবসর অসীম;[২৭]

এই গল্পের সম্মুখভূমিতে নগর কলকাতার এটিকেট ও আবহ থাকলেও নেপথ্যে বা পটভূমিকায় গ্রামীণ জীবন বা আইডিলিক ইমেজের উপস্থিতি জীবনানন্দীয় গল্পের স্বরূপকে তুলে ধরে। ইমেজারি সৃষ্টিতে জীবনানন্দ গ্রামীণ মোটিফকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এই চিত্রকল্পময়তা বা ইমেজিজম তাঁর গল্পকে দিয়েছে কবিতার সুষমা। অন্য অনেক গল্পের মতো এ গল্পেও তাঁর এই শিল্পসিদ্ধির সাক্ষ্য মেলে :

> সোমেন বললে—মনে পড়ে একদিন বকমোহানার নদীর পাড়ে ভাঁটশ্যাওড়া জিউলি ময়নাকাটা আলোকলতার জঙ্গলে তোমাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম; বাড়ি তোমাদের আধ ক্রোশ দূরে সেখান থেকে; তুমি ঘাড় নেড়ে বলেছিলে 'খুব পারবো চিনে যেতে—কতোবার গিয়েছি!' কিন্তু একবারও যাওনি, আম কাঁঠাল বাঁশের জঙ্গলে হারিয়ে গেলে। তারপর তোমাকে একটা পাৎলা শরপুঁটির মতো কানকোতে বেঁধে একটা বাচ্চা রুইর মতো নদী ভেসে এলাম আমি। সেই নদী—জলের গন্ধ—রাত—অন্ধকার—নক্ষত্র—ভিজে বালির চর—তোমার ঠাণ্ডা শরীর কতোদিন আমার হৃদয় শাসন করেছে।[২৮]

তিরিশের দশকের গল্পেও জীবনানন্দ তাঁর চিন্তাসূত্রে আত্মজৈবনিক ছায়ায় সঞ্চরণশীল ছিলেন। কলোনিয়াল সংস্কৃতি ও জীবনযাপনের চিত্র প্রখর না হলেও তাঁর গল্প সেই সমকালীনতাকে স্পর্শ করেছে। ঔপনিবেশিক কাঠামোর বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থায় বাঙালি মধ্যবিত্তের স্বপ্নহীনতার ইতিবৃত্ত ব্যক্তি-জীবনানন্দকেও আচ্ছন্ন করেছে। ফলে সমকালীনতার জটিল বৃত্তে ব্যক্তিও পরাভূত হয় অনিবার্যভাবে। 'নক্ষত্রের বিরুদ্ধে মানুষ' গল্পে অনাদির পরাভব ও মৃত্যুও যুগযন্ত্রণার আঁচ থেকে দূরে নয়। কলোনির শাসনের বিরুদ্ধে দূরে থাক, নিজের পরিবারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তিও নেই অনাদির। এই গল্পে জীবনানন্দের আত্মজৈবনিক বাস্তবতা ট্রাজিক টোনে প্রকাশ পেয়েছে। যক্ষ্মাব্যাধিগ্রস্ত অনাদি স্ত্রীর কাছেও দারুণভাবে উপেক্ষিত। অনাদি চল্লিশটি খাতায় লেখা তার সমস্ত কবিতা ও রচনা বন্ধু লোকনাথকে দিয়ে যায় প্রকাশের জন্য। অনাদি বলেছে :

> বাক্সটি তোমাকেই দিয়ে যাব; চল্লিশটা খাতা আছে। তোমাকে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে যাব। আমি গরিব মানুষ, তোমাকে কোনোই পুরস্কার দিতে পারলাম না। কিন্তু আমার মৃত্যু যেন সামান্য কেরানির মৃত্যু হয় লোকনাথ। এই খাতাগুলো যেন আমাকে বাঁচিয়ে রাখে।[২৯]

জীবনানন্দের অধিকাংশ রচনাও ট্রাঙ্কবন্দি হয়ে পড়েছিল কলকাতার বসতভিটেয়। কবির মৃত্যুর পরই কেবল তাঁকে নতুনভাবে আবিষ্কার করা হয়। সময়-সমাজ-পরিবারবিচ্ছিন্ন অনাদির নেপথ্যে

এক সঙ্গবিবিক্ত কবির মুখ প্রত্যক্ষ করা যায়। তিনি স্বয়ং জীবনানন্দ। ব্যক্তিজীবনের পটে কবি মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষারত স্ত্রীপ্রত্যাখ্যাত অনাদির ক্ষয় ও জীর্ণতাকে অবলোকন করেছেন। স্বামী অনাদিকে একা ফেলে কন্যাকে নিয়ে স্ত্রীর পিতৃগৃহে অবস্থান অনাদির প্রতি তার নির্দয় মনস্তত্ত্বের প্রতিফলন ঘটায়।

তিরিশের দশকের দ্বিতীয় পর্বে লেখা 'এক এক রকম পৃথিবী' গল্পটিতেও কবির নিজস্ব অবয়ব প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এই গল্পের অবিনাশ কবিরই আত্মপ্রতিকৃতি। এই গল্পটি অবিনাশের নিরন্তর পর্যটনের গল্প। তার মনোভূগোলে সময় এক শৃঙ্খলহীন অনন্ত পরিক্রমার মতো। মনোময় পরিভ্রমণের মধ্য দিয়ে এক গভীর ঘোর ও আচ্ছন্নতার দিকে এগিয়ে চলেছে অবিনাশ। রামজীবন বলেছে– 'পৃথিবীর রৌদ্রে রৌদ্রে অস্থির হয়ে ঢের বেড়িয়েছেন আপনি, আজও বেড়াচ্ছেন, কতকাল বেড়াবেন তা আমি জানি না,'[৩০] পৃথিবীবিলগ্ন কবি পুঁজিবাদী দুনিয়ার কোলাহল ছেড়ে সৌন্দর্যময়ী এক নারীর অনুধ্যানে পরিভ্রমণরত। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধূসর পথ পাড়ি দিয়ে সৌন্দর্যময়ী নারীর অন্বেষায় যে-কবি বনলতা সেনের প্রতিমা নির্মাণ করেছিলেন, এ গল্পেও হাজার বছরের অন্ধকার ও ঝিনুকের মতো জোছনার মধ্যে সুন্দরী সাপিনী হয়ে কবির সেই রোমান্টিক নারীর ইশারা জেগে ওঠে:

> কিন্তু অবিনাশের কামনা বৈষয়িক কৌতূহলের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। অবিনাশ যে রূপসিকে চিনেছেন সে সুন্দরী সাপিনী হয়ে হাজার হাজার বছর অন্ধকারে খেলা করে বেড়ায়–যে সাপিনীকে তিনি তাকিয়ে দেখেন মুহূর্তের ভিতরেই রূপসী নারীর মতো অবিনাশের ধূসর পালঙ্কের কাছে জড়িয়ে থাকে–।[৩১]

সমগ্র গল্পটি বিন্যস্ত হয়েছে কবিতার শরীর নিয়ে। অবিনাশের সৌন্দর্যাভিলাষ যেন 'বনলতা সেন' কবিতার সেই পরিব্রাজক কবির মতো যিনি সিংহল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন অনির্দেশের পথে।

জীবনানন্দের প্রেম ও দাম্পত্য জটিলতাকেন্দ্রিক গল্পগুলোতে নারীরা পুরুষের চেয়ে প্রবল, উচ্চকিত এবং আধিপত্যকামী। এই পর্বের গল্পে স্বামী বা পুরুষের আচরণ কিংবা প্রতিক্রিয়া কোমল, ভীরু ও অবদমিত। সোজা কথায়, জীবনানন্দের পুরুষরা নারীর মতো আর নারীরা পুরুষকল্প। জীবনানন্দ যেহেতু চাকরিমুখী, অর্থ-উন্নতি বা বৈষয়িক (ক্যারিয়ারিস্ট) মনস্তত্ত্বের মানুষ নন, তাঁর গল্পের নায়কেরা সেজন্য প্রায়ই দেখা যায় বেকার-অর্ধবেকার কিংবা পুরোপুরি কর্মহীন। এই বেকারত্বের সূত্রেই তাঁর গল্প ঘন হয়ে উঠেছে দাম্পত্য দ্বন্দ্বে ও জটিলতায়। জীবনানন্দের গল্প আলো ঝলমল দুনিয়ার রোশনাই ছড়ায় না, বিষণ্ন মনের আলোছায়ায় ব্যক্তির অন্তর্জগৎ পাখা মেলে তাঁর আখ্যানে। ভোগতৃপ্ত পুঁজিবাদী সময়ের পটে জীবনানন্দ গল্প রচনা করলেও বহির্বিশ্বের জমজমাট চেহারা সামান্যতম আঁচড়ও ফেলেনি তাঁর গল্পে। উত্তম পুরষে লেখা গল্পগুলোতে চরিত্রের উচ্চারণ খুবই অন্তর্ভেদী, তীক্ষ্ণ ও মনোময়। বলা যেতে পারে জীবনানন্দের গল্প তাঁর মনোকথনেরই প্রকাশ্য রূপ।

তথ্যনির্দেশ

১ শ্রীভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ, ৩৮৩
২ *জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র*, ভূমিকা, গতিধারা, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
৩ গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য*, প্রথম দে'জ সংস্করণ ১৯৮৬, কলকাতা, পৃ. ১৮৩
৪ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ*, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৪৭
৫ সিরাজ সালেকীন, *জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্প*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৩২৩
৬ *জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র*, মাংসের ক্লান্তি, পৃ. ৩১
৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১
৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৬
৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩১
১০ প্রাগুক্ত
১১ প্রাগুক্ত
১২ প্রাগুক্ত
১৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১১
১৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১১
১৫ প্রাগুক্ত
১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯
১৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১
১৮ প্রাগুক্ত
১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
২০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
২২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৬
২৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬০
২৪ প্রাগুক্ত
২৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৩
২৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৬
২৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৫
২৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৪
২৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৫
৩০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৭
৩১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৮

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, তেতাল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩২/ডিসেম্বর ২০২৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43ii.002

নজরুলের ছোটগল্প : লোকজচেতনার স্বরূপ অনুসন্ধান

তাশরিক-ই-হাবিব*

সারসংক্ষেপ

কবি ও গীতিকার হিসেবে সমধিক পরিচিত কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিশীল সত্তা উন্মোচনের প্রথম সাহিত্যিক অবলম্বন ছিল ছোটগল্প। গল্পকার হিসেবে তাঁর প্রাতিস্বিক অবস্থান তুলনামূলকভাবে আড়ালে রয়ে গেছে, সংখ্যানুপাতিক স্বল্পতা ও সমালোচনার বিষয় হিসেবে নির্বাচনে গবেষক-সমালোচকদের যথেষ্ট অনাগ্রহবশত। এ প্রবন্ধে ফোকলোরকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তাঁর গল্পসমূহকে পাঠ করার প্রচেষ্টা রয়েছে। নজরুলের সাহিত্যচিন্তার কেন্দ্রমূলে ছিল পরাধীন দেশের গণমানুষের প্রতি সহানুভূতি ও দরদ, তাদের শৃঙ্খলিত জীবনযাত্রা মোচনের দুর্বার প্রচেষ্টা এবং শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধী মনোভঙ্গি। অবিভক্ত ভারতবর্ষের অন্তর্গত বাংলা ভূ-ভাগের ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ তাঁর বিভিন্ন গল্প পাঠপূর্বক অনুধাবন করা যায়। নজরুলের বিভিন্ন গল্প নিবিড় পাঠের আলোকে বাংলার লোকজচেতনার স্বরূপ উন্মোচনে তাঁর সদিচ্ছা ও সৃষ্টিশীল শিল্পসামর্থ্যের তাৎপর্য অনুসন্ধানই বর্তমান প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য।

চাবি শব্দ : নজরুল, লোকজ উপাদান, লোকজ চেতনা, ছোটগল্প।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) বাংলা সাহিত্যের অনন্যসাধারণ কবি ও গীতিকার, যুগপ্রতিম প্রাবন্ধিক ও কথাশিল্পী। যদিও কবিতা ও গানের ভুবনে তিনি কালজয়ী মর্যাদায় আসীন, তবে বাংলা সাহিত্যভুবনে তাঁর পথ চলার অবলম্বন ছিল ছোটগল্প।[১] তাঁর সাহিত্যচর্চার আদর্শ ও অনুধ্যানে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ কায়িক শ্রমজীবী মানুষের প্রতি সমর্থন, আশাবাদ এবং দিনবদলের অঙ্গীকার বরাবর লক্ষণীয়। এরই ধারাবাহিকতায় তাঁর বিভিন্ন গল্পে লোকসমাজের বাসিন্দাদের জীবনচর্চা ও জীবিকানির্ভর সংগ্রামশীলতার অকৃত্রিম চালচিত্র বিভিন্ন লোকজ উপাদানে[২] সমৃদ্ধ লোকজচেতনার অনুষঙ্গে[৩] রূপ পেয়েছে। বিভিন্ন ছোটগল্পে তিনি বাঙালি লোকজীবনসংলগ্ন বিশ্বাস-সংস্কার, মূল্যবোধ, প্রণয়-বিরহ, আবেগ ও স্বপ্ন-প্রত্যাশার রূপায়ণে একান্ত আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর কালজয়ী উপন্যাস *মৃত্যুক্ষুধা*ও (১৯৩০) এক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নজরুলের বিভিন্ন ছোটগল্পে গ্রামীণ লোকসমাজের অন্তর্গত কায়িক শ্রমজীবী মানুষের অবলম্বিত লোকসংস্কৃতির বিশ্বস্ত শিল্পভাষ্য লক্ষণীয়। অবিভক্ত ভারতের পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের পটভূমিতে (এমনকি বীরভূমও) রচিত এসব গল্পে গ্রাম-নগর-মফস্বলের পরিসরে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশাভুক্ত বাসিন্দাদের বৈচিত্র্যময় লোকসংস্কৃতির রূপায়ণ ঘটেছে। লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোকাচার, লোকসাহিত্য, কিংবদন্তি, পুথিসাহিত্য, লৌকিক ধর্মীয় ঐতিহ্য ও লোকভাষা প্রভৃতি লোকজ উপাদান নজরুলের গল্পসমূহে তাৎপর্যবহ মাত্রায় উন্নীত।

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এক্ষেত্রে বাল্যকাল থেকে পরিণত বয়সকালীন অর্জিত অভিজ্ঞতা, গণমানুষের শ্রমক্লিষ্ট জীবিকা ও মাটিঘেঁষা প্রকৃতিলালিত লোকসংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ তাঁর সৃষ্টিশীল মানসিকতাকে অবিরাম অনুপ্রাণিত করেছে। ছোটবেলা থেকেই তিনি জীবনসংগ্রামের তাগিদে ও আন্তরিকতাবশত আমজনতার সঙ্গে মিশেছেন। লেটোর দলে গান করা ও পুথিপাঠ, মক্তবে ইমামতি, মসজিদের মুয়াজ্জিনের কাজ, মাজারের খাদেমগিরি, রুটির দোকানের কর্মচারীর চাকরি, সৈনিক হিসেবে যুদ্ধে যাওয়া – প্রভৃতি কর্মব্যাপ্তির মাধ্যমে[৪] তিনি লোকসমাজের নিবিড় সান্নিধ্যে এসেছিলেন। নজরুলের সাহিত্যভাবনার কেন্দ্রমূলে ছিল গণমানুষের কল্যাণ, তাদের সুস্থ, নির্বিঘ্ন, নিশ্চিন্ত জীবনের প্রত্যাশা। সেকারণেই তিনি সাহিত্যসাধনার অবলম্বন হিসেবে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাবশত বিভিন্ন ছোটগল্প লিখেছেন।

১.১ সমকালীন কথাসাহিত্যে বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চায় নজরুলের স্বাতন্ত্র্য

নজরুলের সমকালে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, গোকুল নাগ, মণীশ ঘটক, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ কথাশিল্পী কলকাতা মহানগর ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রাকে লেখার প্রধান বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তবে ইংরেজি, ফরাসি, রুশ, নরওয়েজীয় ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান সাহিত্যের প্রভাবে 'কল্লোল'-'কালিকলম'-'প্রগতি'-'উত্তরা' প্রভৃতি পত্রিকায় সাহিত্যচর্চাকারী নাগরিক পরিমণ্ডলের লেখকদের লেখনীতে সমাজের শিক্ষিত, অভিজাত, ভদ্র, সম্ভ্রান্ত শ্রেণির মানুষদের এড়িয়ে সমাজের নিচুতলার অবহেলিত ব্রাত্য জনজীবনকে বাস্তবানুগভাবে উপস্থাপনের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। বিবিধ সামাজিক অসংগতি, জীবনধারণের প্রতিকূল পরিবেশ, সমকালীন দৈশিক পরিস্থিতিতে লাঞ্ছিত মানবতার নিষ্পেষণে অস্থিরচিত্ত-সংবেদনশীল নতুন সাহিত্যিক প্রজন্ম যুগের দাবিকে বাস্তবায়নের তাগিদেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীবনবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে সমাজে ব্রাত্য-অপর-ইতরজনকে সাহিত্যের পাতায় যথাযোগ্য গুরুত্ব সহকারে রূপাঙ্কনে অন্তর্নিবিষ্ট হন। এক্ষেত্রে তাঁদের শিল্পাভিজ্ঞানে বিশেষ তাৎপর্যবহ বিবেচিত হয়েছিল সনাতন, প্রথাগত সাহিত্যাদর্শের প্রতি বৈরাগ্য ও সতর্ক অনীহা :

> রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল "কল্লোল"। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তদের সংসারে। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে। প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়।[৫]

নজরুলও নিঃসন্দেহে এ মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে নজরুলের লেখকসুলভ স্বাতন্ত্র্য অনুধাবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গটি হলো তাঁর সামাজিক অবস্থান ও পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে সম্পৃক্ততা। কল্লোল গোষ্ঠীর প্রতিনিধি বা উত্তরসূরি কেউই নজরুলের মতো নিবিড়ভাবে লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মৃত্তিকাস্নাত অনুভবকে নিত্যদিনের জীবনযাপনে, পারিবারিক সংকটময় আবহে, জীবনের সংগ্রামশীল পর্যায়গুলোতে ধারণ করেননি। এদিক থেকে নজরুলের অভিজ্ঞতা, মনস্বিতা এবং শিল্পবোধ বহুলাংশেই লোকমানুষের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক ভাবনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ভবঘুরে, উন্মূলিত মানুষদের নিয়ে লিখিত কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের লেখনীকে নজরুল অতিক্রম করেছেন অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন গ্রাম-শহরকেন্দ্রিক গল্প ও উপন্যাস লিখে। পূর্বোক্ত লেখকদের গল্পে-উপন্যাসে বিশেষভাবেই কলকাতা শহর এবং এর অন্তর্গত রাস্তাঘাট, গলি, বস্তি এবং সংলগ্ন স্থানসমূহ অনেকটা রেখাচিত্রধর্মী ভঙ্গিতে আভাসিত। অথচ

নজরুলের বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাসে বিশ শতকের ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসিত পূর্ববঙ্গ ও নদীয়া-কৃষ্ণনগরের বিভিন্ন পাড়া-মহল্লা, রাস্তঘাট, পুকুর-ঘাট, দোকানপাট, হাট-বাজার, লোকালয়, এমনকি এতদঞ্চল ছাড়িয়ে রানাঘাট, কলকাতা, পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর, ময়মনসিংহ ও বরিশাল এবং অন্যদিকে বীরভূম, রেঙ্গুন ও ওয়ালটেয়ারকে নিয়ে বিন্যস্ত সুবিশাল ভৌগোলিক ব্যাপ্তিবদ্ধ কুশীলবদের সামগ্রিক জীবনপ্রবাহ গ্রন্থিত। এ পর্যায়ে আমরা নজরুলের বিভিন্ন ছোটগল্পে রূপায়িত লোকজ উপাদানসমূহের স্বরূপ উন্মোচনের মাধ্যমে লোকসমাজভুক্ত বাসিন্দাদের লোকজচেতনার রূপরেখা অন্বেষণে অগ্রসর হব।

১.২ লোকবিশ্বাস

লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রাচীন উপাদান লোকবিশ্বাস, যার সঙ্গে আদিম কৌমজীবী মানুষের সম্পৃক্ততার সূত্রপাত ঘটেছে সভ্যতার উন্মেষলগ্নে। যতই সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশ ও সামাজিক বাস্তবতা, ভৌগোলিক পরিসর ও লোকসমাজের গড়ন, ভাবনা-মানসিকতা অনুযায়ী লোকবিশ্বাসের ধারায় রূপান্তর ঘটেছে। ব্যক্তিগত বিশ্বাস যখন গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের নিকট কোনো কারণে স্বীকৃতি পায় এবং যুগ যুগ ধরে তাদের আচার-আচরণ, আলাপ, এমনকি মনোলোকেও প্রভাব বিস্তার করে, শুধু তখনই তা লোকবিশ্বাস হিসেবে গণ্য হয়। বরুণকুমার চক্রবর্তীর মতে, 'সংহত সমাজের মানুষের মনে স্থান না করে নিতে পারলে বিশ্বাস কখনো লোকবিশ্বাসে পরিণত হতে পারে না। ব্যক্তিগত বিশ্বাসের সঙ্গে লোকবিশ্বাসের মূল পার্থক্য এখানেই।'[৬] লোকবিশ্বাস যে সর্বদাই অতীত ধ্যান-ধারণা ও ভাবনাকেন্দ্রিক হবে, তা নয়। বরং এটি সাম্প্রতিক বিষয়কে ভিত্তি করেও গড়ে উঠতে পারে। মূলত ইহলৌকিক শুভাশুভ বিবেচনাই এর গড়ে ওঠার অবলম্বন। গ্রামীণ লোকমানসে লোকবিশ্বাসের প্রভাব অনস্বীকার্য। কারণ শিক্ষাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রাত্যহিক জীবনে ঘটে চলা বিভিন্ন ঘটনার প্রতিক্রিয়াবশত বহু যুগ ধরে প্রচলিত এসব লোকবিশ্বাসের দ্বারস্থ হয়। পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনে যেসব ঘটনা ঘটার পূর্ব অভিজ্ঞতা তাকে কার্যোদ্ধারে সহায়তা করেছিল বলে সে অনুধাবন করে, পরবর্তীকালে পুনরায় সাফল্য অর্জনের জন্য সে ঐ লোকবিশ্বাসে অটল থাকে। নজরুলের একাধিক ছোটগল্পে এসব প্রসঙ্গের উল্লেখ লক্ষণীয়। যেমন– 'পদ্ম-গোখরা' গল্পের শুরুতেই রসুলপুর গ্রামের মীর সাহেবের পরিবার সম্পর্কে প্রতিবেশীদের বিভিন্ন গুজব-রটনা লোকবিশ্বাসের পর্যায়ে উন্নীত হয়। এর মূলে রয়েছে পরিবারটির বর্তমানে বিলীন আর্থিক উন্নতি ও অতীতের সমৃদ্ধ অবস্থা আকস্মিক পুনরুদ্ধারের বৃত্তান্ত। মুর্শিদাবাদের নবাবদের সঙ্গে ভোগবিলাসের প্রতিযোগিতাজনিত কারণে এ জমিদার পরিবারটি দশ বছর পূর্বে যে দৈন্যের শিকার হয়েছিল, তা থেকে তাদের আকস্মিক উত্তরণজনিত গুজব লোকবিশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছেছে। গল্পের শুরুতেই লেখক এর কারণ জানিয়েছেন। জ্বিনের বা যক্ষের ধন প্রাপ্তিই যে মীর পরিবারের রাতারাতি ধনী হয়ে ওঠার কারণ, এর পক্ষে তারা কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করতে পারেনি। কিন্তু বহুজনের মাঝে ব্যাপারটি ছড়িয়ে যাওয়ায় এর সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের প্রশ্নটি এক্ষেত্রে বিবেচ্য ছিল না।

এ গল্পে পুনর্জন্মে বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়, যা লোকধর্মীয় মূল্যবোধের দ্বারা প্রভাবিত। বিয়ের এক বছর পর জোহরার যমজ ছেলেদ্বয়ের আঁতুড়েই মৃত্যুবরণের ঘটনাটি তার মাতৃসত্তায় চরম বেদনা ও হাহাকারের উদ্ভব ঘটায়। নারীর মাতৃরূপ যে স্নেহ-মমতা ও অনুরাগের মাধ্যমে সন্তানের প্রতি নিবিড়ভাবে প্রকাশিত হয়, তা একইসঙ্গে তার জৈবিক ও অন্তর্গত ভালোবাসার সহজাত স্ফুরণবিশেষ। জোহরার এ ভাবাবেগ ও মাতৃত্বময় আকুলতা সন্তানকে গর্ভে ধারণের পরিণতিতে উত্তরোত্তর বাড়লেও অকালেই তাদের মৃত্যুবরণ তার মাতৃহৃদয়ে প্রচণ্ড শোক ও অন্তর্দাহ জাগ্রত করে। জোহরার অতৃপ্ত মাতৃসত্তা তাই শ্বশুরবাড়িতে আশ্রিত বাস্তুসাপরূপী জোড়া পদ্ম-গোখরার প্রতি মাতৃস্নেহে আকুল হয়ে ওঠে। সেগুলোকে নিজের যমজ ছেলে ভেবে দুধপান করানো, নির্ভয়ে কাছে টেনে নিয়ে বাৎসল্য প্রকাশ ছিল সেই ভাবাবেগেরই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু তার অন্তর্লোকে সন্নিহিত এ আবেগের উৎস মূলত সনাতন ধর্মের পুনর্জন্মবাদ বা জন্মান্তরবাদ। ইসলাম ধর্মে এমন ধারণা প্রচলিত নয়। তবে সনাতন ধর্মে পুনর্জন্মের বা জন্মান্তরবাদের ধারণা প্রতিষ্ঠিত, যেখানে ব্যক্তির কৃতকর্মকে পাপ ও পুণ্যের নিরিখে বিবেচনাপূর্বক দায়মুক্তির বিধান অনুসৃত। মূলত নির্বাণ বা পরম মুক্তিলাভই পুনর্জন্মবাদের অভীষ্ট, যা সনাতনী মূল্যবোধের অন্যতম ভিত্তি। ইহজীবনের ব্যাপ্তি যে একটিবারের মানবজন্মেই সম্পন্ন হয়ে যায়, জীবনের এ নশ্বরতা বা ক্ষণস্থায়িত্বের বিপ্রতীপ প্রতিক্রিয়া থেকেই সম্ভবত এ ভাবনার উত্থান, যা পরবর্তীকালে সনাতন ধর্মের কাঠামোতে পুনর্জন্মের মাধ্যমে অনুমোদিত হয়। এ ধারণা অনুযায়ী, মোক্ষ লাভ করার পূর্ব অবধি মানবাত্মাকে অজস্রবার ভিন্ন ভিন্ন রূপে এ পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। শুধু সৎ, নির্মোহ, প্রকৃত সাধকের পক্ষেই সৎকর্মের গুণে মোক্ষ অর্জন করা সম্ভব এবং তার ক্ষেত্রে পুনর্জন্মের চক্রাকার আবর্তন রুদ্ধ হয়ে যায়।[৭] এ গল্পে জোহরার মৃত ছেলেদের পদ্ম-গোখরাজোড়ারূপে ফিরে পাবার গভীর বাৎসল্যজাত আকাঙ্ক্ষায় লৌকিক ধর্মবোধের অন্তরালে সন্নিহিত মাতৃহৃদয়ের আকুতি ও স্নেহের উজ্জীবন পরিস্ফুট। সম্ভবত সনাতন ধর্ম থেকেই এ বিশ্বাস প্রতিবেশী মুসলমান সমাজে গৃহীত হয়েছে। গল্পের পরিণতি অংশে মানবী জোহরার এক জোড়া মৃত সাপ প্রসবের পর মৃত্যুবরণের ঘটনাটি লোকমুখে ছড়ানো গুজব হলেও এর মাধ্যমে সাপদুটির প্রতি তার সন্তানরূপ বাৎসল্যজনিত সুতীব্র আকুতিই পরিলক্ষিত হয়েছে। কারণ সে তাদেরকে 'খোকা' সম্বোধনপূর্বক নিঃসঙ্কোচে কাছে টেনে নিয়েছিল।

১.৩ লোকসংস্কার

লোকবিশ্বাসেরই সম্প্রসারিত রূপ লোকসংস্কার[৮], যা লোকসমাজে প্রবল প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের জীবনযাত্রাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। কবে থেকে লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কারের উৎপত্তি ঘটেছে সঠিকভাবে সে সম্বন্ধে কিছু বলা না গেলেও অনুমান করা যায়, সংস্কার এবং বিশ্বাস অতি প্রাচীন। লোকসংস্কারের মূলে রয়েছে লোকবিশ্বাস এবং তা অবশ্যই সমষ্টিমানুষের দ্বারা সৃষ্ট। বরুণকুমার চক্রবর্তীর অভিমত– 'লোক-সংস্কার হ'ল সেইসব আচার-আচরণ এবং ক্রিয়াকলাপ যেগুলি পালনীয় কিংবা বর্জনীয় বলে সংহত জনসমষ্টি শুধু বিশ্বাস করে না, ব্যবহারিক জীবনে তা মেনেও চলে।'[৯] এর সঙ্গে ঐতিহ্যের সম্পর্ক অধিক ঘনিষ্ঠ। লোকসংস্কারের মূল নিহিত থাকে কোনো জাতির সমষ্টিচেতনার গভীরে এবং ঐহিক শুভাশুভ

ভাবনাই এর অভীষ্ট। তবে লোকবিশ্বাসের সঙ্গে এর মৌলিক ব্যবধান হলো এর সঙ্গে বিভিন্ন আচার-আচরণও সম্পৃক্ত থাকে। লোকসংস্কার সমষ্টিমানুষের জন্য সৃষ্ট এবং যথাযথভাবে পালিত না হলে বিরূপ মানসিকতার সৃষ্টি হয়, যা মানসিক ভীতি ও অস্বস্তিমূলক। লোকবিশ্বাসের চেয়ে লোকসংস্কারের পরিধি অপেক্ষাকৃত ব্যাপক। নজরুলের বিভিন্ন গল্পে উল্লিখিত বিবিধ লোকসংস্কারের রূপায়ণ ঘটেছে।

১.৩.১ নারীর প্রতি আরোপিত মূল্যবোধ ও অনুশাসন

'জিনের বাদশা' গল্পে নারীর প্রতি আরোপিত মূল্যবোধ বিষয়ক লোকসংস্কারের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয় ঐ পরিবারের পুত্রবধূ জোহরাকে কেন্দ্র করে। এক্ষেত্রে বাঙালি নারীসমাজে বিশেষভাবে প্রচলিত 'লক্ষ্মী' বিষয়ক ভাবনার প্রতিফলন রূপায়িত। সনাতন ধর্মে 'লক্ষ্মী' ধন, সমৃদ্ধি, শ্রী ও কল্যাণের দেবী। রূপসী, সৎ গুণের অধিকারী, মিশুক, যত্নশীল, সংসারের প্রতি মনোযোগী ও পরের সেবায় নিয়োজিত নারীকেই 'লক্ষ্মী' মেয়ে বা বধূ হিসেবে অভিহিত করা হয়। তার আগমনে সংসারের আয়-উন্নতি হয়, সুসংবাদ আসে, বিপদ ও সমস্যা দূরীভূত হয়। 'পয়' বা শুভ, মঙ্গলের আধার সেই নারী। কুতুবপুরের সৈয়দ সাহেবের একমাত্র মেয়ে জোহরাকে মীর পরিবারের একমাত্র ছেলে আরিফের স্ত্রী হিসেবে বিবাহের মাধ্যমে বরণ করে নেয়ার ঘটনাটি এক্ষেত্রে লোকবিশ্বাস গড়ে ওঠার কারণ হয়ে উঠেছে। অবশ্য এরূপ ঘটনা যে ঘটতে যাচ্ছে, তার ইঙ্গিত লেখক পূর্বেই দিয়েছেন। কারণ জোহরার রূপের প্রশংসা চারপাশের গ্রামে প্রচারিত হয়েছিল। আরিফের সঙ্গে তাকে দারুণ মানিয়েছে, বিয়ের অনুষ্ঠানে আগত মেহমানদের উচ্চ প্রশংসাই মূলত জোহরার শাশুড়ির মনে এ লোকবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিল যে, তার পুত্রবধূ লক্ষ্মী ও পয়া (সৌভাগ্যবতী) নারী। কারণ তার আগমনের পর থেকেই সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটছিল। যেমন– প্রথমত জোহরার শাশুড়ি ভেবেছিল, তার অসুস্থতা থেকে মুক্তি মিলেছে জোহরারই কারণে। এ ঘটনা জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন জোহরা শ্বশুরালয়ের জীর্ণ প্রাসাদের দেয়ালের ফাটলের ভেতর বাদশাহি আশরফিতে ভরা পেতলের একটি কলস খুঁজে পায়। "কলসিতে সোনার মোহর দেখিয়া আনন্দে তাহারা ... অশ্রুসিক্ত চোখে বারে বারে বলিতে লাগিলেন, 'সত্যিই মা, তোর সাথে মীর বাড়ির লক্ষ্মী আবার ফিরে এলো!' "[১০] শুধু তাই নয়, আরিফ মক্তবের শিক্ষকতা ছেড়ে যখন ব্যবসা শুরু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল, তখনও স্ত্রী জোহরার প্রতি বিশেষ ধরনের বিশ্বাস তার মনে জন্মেছিল। গল্পকার জানিয়েছেন, "বধূর 'পয়' দেখিয়াই বোধ হয়–আরিফ তাহারই কিছু টাকা লইয়া কলিকাতায় আসিয়া কয়লার ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিল। ব্যবসায়ে আশার অতিরিক্ত লাভ হইতে লাগিল।" [১১] এমনকি শ্বশুরবাড়িতে লোভী শ্বশুর-শাশুড়ির চক্রান্তে বিষমেশানো খাবার খেয়েও ডাক্তারি চিকিৎসায় প্রাণ রক্ষা করতে পেরে আরিফ ও তার মা-বাবা জোহরাকেই যে কৃতিত্ব দিয়েছিল, লেখক তা জানিয়েছেন– 'জোহরা সত্য সত্যই পয়মন্ত, আরিফ মৃত্যুর সহিত মুখোমুখি আলাপ করিয়া ফিরিয়া আসিল।'[১২] লেখক *মনসামঙ্গল* কাব্যের বেহুলা-লখিন্দর আখ্যানের বীজটিকেই সম্ভবত জোহরা চরিত্রের পুনর্গঠনে বিন্যস্ত করেছেন। স্বামীর ওপর অগাধ বিশ্বাস ও নির্ভরতা, প্রতিদানে ভালোবাসার মানুষটির প্রতি আমৃত্যু বিশ্বস্ত থাকা, সংসারের কর্মনিপুণা গৃহবধূর ভাবমূর্তিকে ব্যক্তিত্বে ও আচরণে প্রতিষ্ঠিত করার

পাশাপাশি সেবা-নৈপুণ্য-ত্যাগের মাধ্যমে আত্মনিবেদনের যে দৃষ্টান্ত বেহুলা স্থাপন করেছিল লখিন্দরকে বাঁচাতে গিয়ে, সেই পৌরাণিক ভাবাবহকেই নজরুল জোহরা চরিত্রে আরোপ করেছেন। আবার মনসা চরিত্রে প্রতিবিম্বিত জননীর মাতৃত্বময়ী রূপটিও লক্ষণীয়, যে তার সর্পসন্তানদের সর্বতোভাবে রক্ষায় সচেষ্ট। ধর্মীয় পরিচয় ভিন্ন হলেও নদীমাতৃক গ্রামীণ বাংলাদেশের বহুল পরিচিত ও জনপ্রিয় *মনসামঙ্গলের* বেহুলা-লখিন্দরের প্রেমাখ্যানের প্রতি নজরুলের আগ্রহ ছিল। সম্ভবত জোহরা চরিত্রটির গড়নে মনসা ও বেহুলা উভয় নারীই প্রভাব বিস্তার করেছিল।

'রাক্ষুসী' গল্পে বিন্দি নামের বীরবূমের এক বাগদী গৃহবধূর বয়ানে এ বিষয়ক কিছু লোকসংস্কারের দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। তিন ছেলেমেয়ে ও স্বামীকে নিয়ে তার সুখের সংসারে আচমকাই হানা দিয়েছিল রথো বাগদির 'দু-তিনটে স্যাঙ্গা করা কড়ুই রাড়ি' মেয়েটি। তার স্বামী পাঁচুর বাপকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে সে বিন্দির জমানো টাকা হাতিয়ে নেয়ার চক্রান্ত করেছিল। এর পাশাপাশি তাকেও বিয়ে করার প্রলোভন দেখিয়েছিল। বিন্দি স্বামীকে নানাভাবে বুঝিয়েও রথো বাগদির মেয়েটির প্রতি মোহ থেকে স্বামীকে ফেরাতে না পেরে একপর্যায়ে তাকে খুন করে। এ ব্যাপারে তার মনে কোনো অনুতাপ নেই। এর পরিণতিতে প্রবল ব্যক্তিত্বময়ী ও আত্মমর্যাদাসচেতন বিন্দিকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ 'রাক্ষুসী' সম্বোধনে অভিহিত করে। পাড়ার ছেলেরা তাকে খ্যাপাত, প্রতিবেশীরা তাকে কখনো আপন ভাবত না, বরং এড়িয়ে চলত। এমতাবস্থায় সে কারাবাস শেষে বাড়ি ফিরে নয় বছর পূর্বের নিজের জীবনের মর্মন্তুদ আখ্যান প্রতিবেশী মাখনদিকে জানিয়েছিল। সমাজে কোণঠাসা এ বিধবা নারীর বয়ানে লিখিত গল্পটিতে একাধিক লোকসংস্কারের প্রতিফলন ঘটেছে বিন্দির জবানিতে। প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ–

> আমি মনে করতুম, আর যটা দিন বাঁচি এমনি করে সোয়ামির সেবা করে, ছেলে-মেয়ে চরিয়ে, নাতিপুতি দেখে আমার হাতের নোওয়া অক্ষয় রেখে মরি; কিন্তু তা আমার পোড়া বিধাতার সইল না।[১৩]
>
> একটা দেবতার মতো লোক সিদা নরকে নেমে যাচ্ছে এক-এক পা করে, আর বেশি দূর নাই, অথচ ফিরাবার কোনো উপায় নাই। তখন তাকে হত্যা করলে কি পাপ হয়? আমি তার 'ইস্ত্রি', আমারও তো একটা কর্তব্য আছে, আমার সোয়ামি যদি বেপথে যায়, তো আমি না ফিরালে অন্য কে এসে ফিরাবে? আর সে এই রকম বেপথে গেলে ভগবানের কাছে ধর্মত আমিই তো দায়ী।[১৪]

১.৩.২ অশরীরী সংক্রান্ত

গ্রামীণ সমাজে অশরীরী বিষয়ক অজস্র লোকসংস্কার প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। বিশ্বের যে কোনো দেশেই এর প্রচলন স্থানিক সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক ধরনভেদে লক্ষণীয়। জিন-পরি, কবন্ধ, ভূত-প্রেত, ডাইনি, প্রেতাত্মা, দেও-দৈত্য-দানব, পিশাচ প্রভৃতি অশরীরী সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস কালের বিবর্তনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বর্তমানের বিজ্ঞানশাসিত সভ্যতাতেও স্বকীয়রূপে দেশভেদে অস্তিত্বশীল। বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে, লোকপুরাণে, লোককথায় ও লোকগাথায়, লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় এসবের উপস্থিতি লক্ষণীয়। সমাজবিজ্ঞানী-নৃবিজ্ঞানীরা এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন।

আঠারো শতকের শেষভাগ থেকে পুরো উনিশ শতক অবধি দোভাষী পুথির জগৎ ও আরব্য লোককথা, বিশেষত *আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা* বা হাজার এক আরব্য রজনীর অতিলৌকিক-

অবিশ্বাস্য জগৎকে বাঙালি লোকসমাজ যে বিশ্বাসের গুণে আপস করে নিয়েছিল, তা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন কাহিনি, কিংবদন্তিতে জিন-পরিকেন্দ্রিক ঘটনা ও আখ্যানের মাধ্যমে পল্লবিত হয়েছে। এর সঙ্গে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের অশরীরী বিষয়ক ভূত, প্রেত, পেত্নী, দানব, প্রভৃতির উপস্থিতি তার এ বিশ্বাসকে অধিক বিশ্বাসযোগ্য করেছে। নামগত ভিন্নতা সত্ত্বেও অশরীরী হিসেবে এসব সত্তার উপস্থিতিকে প্রকৃতিনির্ভর, পশ্চাৎপদ, আধুনিক বিজ্ঞানশিক্ষাবঞ্চিত লোকসমাজ বাস্তবেরই অংশ হিসেবে গণ্য করেছে। মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ *আল কোরআন*-এ 'জ্বিন' কে নিয়ে একটি সুরা রয়েছে। এ ধর্মগ্রন্থমতে, জ্বিন হলো আগুনের সৃষ্ট অশরীরী, যাকে মানুষ সরাসরি দেখতে পায় না। লোকসমাজে প্রচলিত ধারণা হলো– গুপ্ত, অদৃশ্য, দৃষ্টির আড়ালে বিচরণকারী এ অশরীরী নির্জন স্থানে বসবাস করে, জনপদের আশেপাশে নির্জন দিনে বা ভরদুপুরে, শুনশান অন্ধকার রাতে ঘোরাফেরা করে। মানুষের বাসস্থান ও জনপদ থেকে দূরবর্তী, পরিত্যক্ত, নির্জন ও নোংরা জায়গায় এরা ঘোরাফেরা করে, রাতের অন্ধকারে এরা মানুষের পিছু নেয় এবং তার দিকে নজর রাখে। সুযোগ পেলে এরা শিশু ও নারীদের কোনো বিপদে ফেলে, কারো ক্ষতি সাধন করে। মানুষের মতো তারাও সমাজবদ্ধভাবে থাকে, তাদের আলাদা রাজ্য ও রাজা রয়েছে। তাদেরকে রাজার হুকুম মেনে চলতে হয়। এরূপ বিভিন্ন লোকবিশ্বাস গ্রামীণ সমাজে বহুকাল থেকেই গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন ক্রিয়া-কর্ম ও আচরণ যুক্ত হওয়ায় কালের প্রবাহে এগুলো লোকসংস্কারে পরিণত হয়েছে। 'জিনের বাদশা' গল্পে প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত লক্ষণীয়। মোহনপুর গ্রামের মাতবর চুন্নু ব্যাপারির তৃতীয় পক্ষের ছেলে ও বিশ বছরের দুঃসাহসী যুবক আল্লা-রাখা নারদ আলি শেখের উঠতি বয়সী মেয়ে চান ভানুকে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে তার পরিবারকে নানাভাবে ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে জ্বিনের ছদ্মবেশে। এক্ষেত্রে গ্রামীণ সমাজে জিনকেন্দ্রিক যেসব বিশ্বাস বিদ্যমান, সেগুলোকেই সে নানাভাবে অনুসরণ করে। গ্রামের বাসিন্দাদের নিকট তার দুরন্তপনা এতটাই দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল–

> "গাঁয়ের লোক বলাবলি করে, ও ... যদি মামদোভূত হত, তা হলেও বরং ছিল ভালো। ভূতেও বুঝি এত জ্বালাতন করতে পারে না। ... ওকে মুসলমানরা বলত, 'ইবলিশের পোলা', কায়েতরা বলত, 'অমাবস্যার জম্মিৎ!' বাপ বলত 'হালার পো', মা আদর করে বলত– 'আফলাতুন' "।[১৫]

সে নিজেকে দোভাষী পুথির নায়ক হানিফা ও চান ভানুকে জয়গুন ভেবে প্রেমের ব্যাকুলতায় অস্থির হয়ে তাকে অপহরণের পরিকল্পনা করে। কিন্তু তা বাস্তবায়নের সুযোগ না পাওয়ায় প্রথমে জিনের বাদশা ও এরপর জলদানো সেজে সে চান ভানুকে ভয় দেখায়। কখনো বা অশরীরীর বেশে সুর করে বিলাপ তুলে কেঁদে সে রাতের বেলা চান ভানুর পরিবারকে আতঙ্কিত করে তোলে। নজরুলের বিভিন্ন গল্পে এতদ্বিষয়ক কিছু প্রাসঙ্গিক উল্লেখ থেকে ধারণা করা যায়, এ বিষয়ক লোকসংস্কার গ্রামীণ বাঙালি লোকসমাজে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। তাদের প্রাত্যহিক দিনযাপনের বিভিন্ন ভাবনা, আচরণ, কর্মকাণ্ড যে এ লোকসংস্কারের দ্বারা আবর্তিত হয়, তা অনুধাবনে সহায়ক কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ:

> প্রবল ঝন্‌ঝার মতো এসে সময় সময় ঐ যে দমকা বাতাস আমাকে ঘিরে তাণ্ডব নৃত্য করতে থাকে, ওকি তাঁরই অশরীরী ব্যাকুল আলিঙ্গন?[১৬]

সেইদিন সন্ধ্যা-রাত্রিতে বাড়ির একজন দাসী চিৎকার করিয়া উঠিল, 'ও মা গো, ভূতে ধরলো গো! জিনের বাদশা গো! জিন ভূত!' ... এমন সময় বাড়িময় শোরগোল উঠিল,'ভূত! ভূত! য়্যাদ্দাড়িওয়ালা ভূত।'[১৭]
জিনের বাদশা, তার দৈবী বাণী, যত রকম ভূত ছিল–একানোড়ে, মামদো, সতর চোখীর মা, বেক্ষদোত্তি, কব্ধকাটা– সব মিলেও তার পরাজয় নিবারণ করতে পারলে না![১৮]

১.৩.৩ সাপ হত্যা সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা

বিশ্বের বিভিন্ন সমাজে টোটেম ও ট্যাবুর অস্তিত্ব লক্ষণীয়। অরণ্যচারী-প্রকৃতিনির্ভর প্রাচীন মানব সভ্যতায় গড়ে ওঠা এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরিবার-ধর্ম ও সমাজের নিবিড় সংযোগ বিদ্যমান ছিল। সংস্কৃতিভেদে এদের অস্তিত্ব বৈচিত্র্যময় হলেও লোকসমাজের গড়ন ও সমষ্টিমানসে প্রভাববিস্তারে টোটেম ও ট্যাবুর ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাঙালি মুসলমান ও সনাতন সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে টোটেম ও ট্যাবুর উপস্থিতি লক্ষণীয়। 'পদ্ম-গোখরা' গল্পে মানুষের পাশাপাশি একজোড়া পদ্ম-গোখরা সাপ চরিত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। নদীমাতৃক গ্রামীণ বাংলা ভূ-ভাগে সাপের বসবাস সমতল কৃষি ভূমি, পার্বত্য এলাকাসহ প্রায় সবর্ত্রই লক্ষণীয়। মধ্যযুগে রচিত *মনসামঙ্গল* কাব্যের আলোকে ধারণা করা যায়, এতদঞ্চলে সাপকে সনাতনপন্থিরা যে ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশাসন অনুযায়ী পূজা করে এবং মনসাকে সাপের দেবী হিসেবে অধিষ্ঠিত করেছে, এর অন্তরালে নৃতাত্ত্বিক-সমাজতাত্ত্বিক কারণসমূহও সক্রিয়। টোটেম ও ট্যাবুর মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো এর সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। এ গল্পেও এসব প্রসঙ্গ লক্ষণীয়। যেমন– গল্পের শুরুতেই রসুলপুরের মীরসাহেব পরিবারের আর্থিক উন্নতির আকস্মিক কারণ হিসেবে আরিফের স্ত্রী জোহরার মতো 'পয়া' বা লক্ষ্মী নারীর ভূমিকাকে গ্রামবাসী গুরুত্ব দিয়েছে। কারণ সে শ্বশুরালয়ের জীর্ণ প্রাসাদের ফাটলের ভেতর সাপজোড়ার ক্রুদ্ধ গর্জন শুনতে পেয়েছিল। এরপর এক কলস ভর্তি স্বর্ণমুদ্রা সেখান থেকে উদ্ধারের মাধ্যমে এ পরিবারের অবস্থা যে দুই বছরের মধ্যে নাটকীয়ভাবে বদলে যায়, গল্পের ভাষ্যে লেখক তা জানিয়েছেন। কিন্তু এটিই এ গল্পের মূল প্রসঙ্গ নয়। বরং ওপরে উল্লেখিত প্রসঙ্গে গল্পের বিবরণে জানা যায়, আরিফের বাবা সাপজোড়াকে 'জাতসাপ' হিসেবে অভিহিত করে। সে আরিফকে নিষেধ করে সাপদুটিকে হত্যা করতে। গৃহে বা বাস্তু ভিটায় আশ্রিত বিধায় গ্রামাঞ্চলে এ ধরনের সাপকে 'বাস্তুসাপ' হিসেবে সম্বোধন করা হয়। জাত সাপ হত্যা করলে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়, এ ধারণা গ্রামীণ মুসলমান লোকসমাজে প্রতিবেশী সনাতন ধর্মের প্রভাবজাত। মনসাকে 'সাপের দেবী' হিসেবে বিবেচনায় সাপকে তার সন্তানরূপে প্রতিপালন, দুধ-কলা খাওয়ানো প্রভৃতি আচরণ গ্রামীণ পরিমণ্ডলে প্রচলিত। এ গল্পেও লক্ষণীয়, সাপজোড়া ধীরে ধীরে গৃহেই প্রতিপালিত হতে থাকে, এ পরিবারটির সৌভাগ্যের প্রতীকরূপে। জোহরা সাপজোড়াকে দুধ-কলা খাইয়ে সন্তানস্নেহে প্রতিপালনে মনোযোগী হলেও ভয়ানক বিষধর এ সরীসৃপের প্রতি পরিবারের অন্যদের মনোভাব ছিল এর বিপরীত। সাপজোড়ার কারণেই স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্তির ঘটনা ঘটায় এবং জোহরার মাত্রাতিরিক্ত বাৎসল্য সম্পর্কে অবহিত তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন এদের প্রহার বা হত্যা করেনি। সাপদুটিতে নিজের মৃত যমজ ছেলের সঙ্গে প্রতিতুলনাবশত মাতৃময়ী জোহরা কাছে টেনে নেয়ায় একপর্যায়ে স্বামী আরিফের সঙ্গে তার দাম্পত্যসম্পর্কে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। কারণ রাতের বেলাও সাপজোড়া জোহরার বিছানায় আসায়

আরিফ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এর পরিণতিতে তার কাছে সাপজোড়া রীতিমতো প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে। তার মনে হতে থাকে, স্ত্রী হিসেবে সে জোহরাকে কাছে পাচ্ছে না। এর আরেক কারণ, জোহরা তার পরিবর্তে সাপজোড়ার প্রতি অধিক মনোযোগী, সন্তানস্নেহের আকুতিবশত সরীসৃপজোড়াকেই মৃত ছেলে ভেবে তাদের কাছে টানতে উন্মুখ। সেকারণেই আরিফ একবার তাকে জানিয়েছিল, সাপদুটোকে মেরে ফেলবে। কিন্তু তাতে জোহরার সম্মতি ছিল না। জোহরার মামা বিখ্যাত সর্পতত্ত্ববিদ ছিল, সেকারণেই সম্ভবত সেও সাপজোড়াকে ভয় না পেয়ে বরং পোষ মানিয়েছিল বাৎসল্যগুণে। একপর্যায়ে আরিফের সঙ্গে জোহরার অন্তর্গত সম্পর্কের টানাপড়েন বাড়তে থাকে। ছয় মাস পর বাপের বাড়ি থেকে জোহরা স্বামীগৃহে ফিরতেই সাপজোড়াও তার কাছে আসে এবং আগের মতোই তার আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। জোহরার শাশুড়ি এ ব্যাপারটি মানতে পারেনি। সে জোহরার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে, যদিও তার অনুপস্থিতিতে সরীসৃপজোড়া বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিল। গর্ভবতী অবস্থায় বাপের বাড়িতে অবস্থানকালে জোহরা স্বপ্ন দেখত, তার মৃত ছেলেরা দুধপানের জন্য কবর থেকে উঠে এসে তার কাছে আকুতি জানাচ্ছে। ঘটনাক্রমে আরিফের শ্বশুর রাতের অন্ধকারে সাপদুটিকে মাড়িয়ে দেয় এবং লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলে। গল্পের শেষভাগে জানা যায়, 'ভোর হইতে না হইতে গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, মীর সাহেবদের সোনার বৌ এক জোড়া মরা সর্প প্রসব করিয়া মারা গিয়াছে।'[১৯] বাবার হাতে সাপজোড়ার মৃত্যুর ঘটনা জেনে মৃত সাপজোড়া প্রসবের পর জোহরা নিজেও মৃত্যুবরণ করে। এ ঘটনা অবিশ্বাস্য হলেও গল্পকারের ভাষ্যে জানা যায়, ব্যাপারটি গুজব বা রটনারূপে গ্রামে প্রচারিত হয়েছে। সরীসৃপের প্রতি মানবীয় বাৎসল্য ও ভালোবাসার অসামান্য বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে গিয়ে গল্পকার এভাবেই এ লোকসংস্কারকে গল্পটিতে রূপায়িত করেছেন।

১.৩.৪ বিবিধ

নজরুলের বিভিন্ন ছোটগল্পে লোকসমাজে প্রচলিত অন্যান্য লোকসংস্কারের দৃষ্টান্তও রয়েছে। যেমন– অভিশাপ প্রদানের ব্যাপারটি একাধিক গল্পে উল্লেখিত। সাধারণত কোনো ব্যক্তির ক্ষতি হলে বা বিপদ ঘটলে, এমনকি সে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে বা সেরূপ আশঙ্কা থাকলে যে ব্যক্তির কারণে এমনটি ঘটে বা ঘটতে পারে, তার প্রতি অভিশাপ বা বদদোয়া উচ্চারিত হয়। এর পরিণতিতে দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যার সমাধান না হলেও সে আপাতসান্ত্বনা পায়, দুষ্কৃতকারীর দণ্ডবিধানের প্রচেষ্টায়। প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্তসমূহ নিম্নরূপ :

> কড়ুইরাড়ি আঁটকুড়িরা যারা আমার সাতপুরুষের গিয়াতকুটুম নয়, ... দেবতাদের শাপের মতো এসে আমাদের সব সুখশান্তি নষ্ট করে দিলে![২০]
>
> বত্রিশ নাড়ি পাক দিলে তবে কখনো লোকের মুখ দিয়ে 'শাপমন্যি' বেরোয়![২১]
>
> পীর সাহেবের অভিশাপের ভয়ে লোকে বাড়িতে ভিড় করিতে পারিল না।[২২]

প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে যথাশীঘ্র বিয়ে না দিলে পরিবারে বিপদ ঘনিয়ে আসে, এ লোকসংস্কারের দৃষ্টান্ত রয়েছে 'রাক্ষুসী' ও 'জিনের বাদশা' গল্পদ্বয়ে। প্রথমটির কেন্দ্রীয় চরিত্র বাগদি নারী বিন্দি তার বড়

ছেলের বিয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্রী খুঁজেছিল। সে ভাবছিল, "বড় ছেলে সোমত্ত হয়ে উঠেছে, বেথা না দিলে 'উপর-নজর' হবে।"[২৩] কারো কুনজর বা খারাপ দৃষ্টি লাগার শঙ্কাও লোকসংস্কারের অন্তর্গত। কারণ তা প্রতিকারের জন্য বিশেষ আচার পালন বা ক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়। 'জিনের বাদশা' গল্পে নারদ আলি শেখের উঠতিবয়সী মেয়ের প্রতি জিনের বাদশা আকৃষ্ট হয়ে রাতে বাড়িতে হানা দিলে গ্রামের মেয়েরা জানায় "'আইবো না, অত বড় মাইয়া বিয়া না দিয়া থুইলে জিন আইবো না?' " ... কেউ কেউ বলল চান ভানুর ওপর জিনের আশক হয়েছে, ওর ওপর জিনের নিজের নজর আছে। আহা, যে বেচারার বিয়ে হবে ওর সাথে, তাকে হয়তো বাসর ঘরেই ঘাড় মটকে মারবে।' "[২৪]

গ্রামীণ লোকসমাজে বিশেষ দিন-ক্ষণ মেনে শুভ-অশুভ বিচার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দিব্যি দেওয়া, তুকতাক-বশীকরণ বিষয়ক বিভিন্ন লোকসংস্কারের প্রচলন রয়েছে। আসন্ন বিপদ কাটাতে, কখনো বা ভবিষ্যতের প্রতিবন্ধকতার সমাধান হিসেবে এ লোকসংস্কারের প্রচলন লোকসমাজে পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

অশুভক্ষণ মানা –

> কি কুক্ষণে কাল-সন্ধ্যায় সে ওদের বাড়িতে পা দিয়েছিল![২৫]

অশুভ লক্ষণ–

> সেদিন সকাল হতেই আমার ডান চোখটা নাচতে লাগল, বাড়ির পিছনে অশ্বত্থ গাছটায় একটা প্যাঁচা দিন দুপুরেই তিন বার ডেকে উঠল, মাথার উপর একটা কালো টিকটিকি অনবরত টিক টিক করে আমার মনটাকে আরো অস্থির করে তুলেছিল। আমার অদৃষ্টের সঙ্গে ওদের কি সংযোগ ছিল?[২৬]

দিব্যি করা ও কসম খাওয়া–

> তারপর যখন নানান্ রকমের দিব্যি করে কসম খেয়ে ফুসলিয়ে তাকে ডেকে আনতাম, তখন সে আমার লম্বা চুলগুলো নিয়ে নানান্ রকমের বাঁকা-সোজা সিঁথি কেটে দিতে দিতে বলত, 'দেখো ভাই, আর আমি কখখনো তোমায় মারব না! যদি মারি তো আমার হাতে যেন কুষ্ঠ হয়, পোকা হয়!'[২৭]

জাদু–

> এতদিন বাঁশির এই জাদু-করা সুর কোথায় ছিল?[২৮]
>
> ছুঁড়ি যে ওকে জাদু করেছিল! একেবারে ভেড়া বানিয়ে দিয়েছিল! [২৯]

১.৪ লোকাচার

লোকাচার লোকসংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত, যা বিভিন্ন ক্রিয়া ও আচরণসম্পৃক্ত। এর বিষয়বৈচিত্র্য ও পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও আয়োজন লোকাচার-সম্পৃক্ত বিধায় লোকসমাজের প্রাত্যহিক দিনযাপনে এর অনিবার্য উপস্থিতি লক্ষণীয়। ইহলৌকিক কামনা, বস্তুগত বা বৈষয়িক সমৃদ্ধি অর্জন প্রভৃতি এর লক্ষ্য।[৩০] বিভিন্ন প্রয়োজনে, অভীষ্ট পূরণের তাগিদে মানুষ কখনো নিজের অজান্তে, কখনো সচেতনভাবে বিভিন্ন লৌকিক আচার মান্য করে। কেননা এসব আচার-অনুষ্ঠানে সন্নিহিত থাকে বহু যুগের লোকসমাজের অর্জিত অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও অনুশাসন। মানুষ জীবনের সঙ্গে দৈব বা অতিপ্রাকৃত ভাবনাকে বরাবর

সমন্বিতভাবেই মিলিয়ে চলে। নিত্যদিনের চলার পথে যেসব প্রতিবন্ধকতাকে সে এড়িয়ে চলতে এবং আকাঙ্ক্ষিত ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে চায়, এরই তাগিদে বিভিন্ন লোকাচারের প্রতি সে আগ্রহী হয়ে ওঠে।[৩১] লৌকিক আচারে প্রকাশ পায় ইহলৌকিক কামনারাজি। সামাজিক বিভিন্ন লোকাচার নজরুলের রচিত বিভিন্ন গল্পে লক্ষণীয়। গ্রামীণ সমাজে বিয়ের আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এক্ষেত্রে বংশগত ও পারিবারিক মর্যাদার বিষয়টিও নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। গ্রামের অভিজাত, ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিয়ের আয়োজনে প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ জানানোর পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রচলন অঞ্চল ও জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়ভেদে লক্ষণীয়। গ্রামীণ বাঙালি মুসলমান সমাজেও এর প্রতিফলন ঘটে। 'জিনের বাদশা' গল্পে বর-কনের প্রথমবার নিজেদের দেখা বা দৃষ্টি বিনিময়ের আয়োজন মূলত সনাতন ধর্মের বিয়ের রীতি থেকে গৃহীত। সেখানে পূর্বনির্ধারিত লগ্ন মেনে বিয়ের আয়োজন করা হয়, যেখানে শুভ দৃষ্টি-বিনিময়, কন্যা সম্প্রদান ও অন্যান্য আচার অবশ্যপালনীয়। কোষ্ঠী বিচার, পঞ্জিকা গণনা ও দিন-ক্ষণ মেনে সনাতন বিয়ের রীতির খানিকটা অনুসরণ এ সমাজেও কালের পরিক্রমায় গৃহীত হয়েছে। এ গল্পে লক্ষণীয়, মোহনপুর গ্রামের মাতব্বরের ছেলে আল্লা-রাখা প্রতিবেশী-কন্যা চান ভানুকে পছন্দ করে এবং তাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু পারিবারিকভাবেই চান ভানুর বিয়ের প্রস্তাব পাকা হয় মাজগাঁ গ্রামের ছেরাজ হালদারের ছেলের সঙ্গে। আল্লা-রাখা যে এ বিয়ের আয়োজনে বিঘ্ন ঘটাতে সচেষ্ট, তা বুঝতে পেরে 'তারা বাপ-বেটায় পরামর্শ করে ঠিক করলে–শুধু বিয়েটা হবে ওখানে গিয়ে। রুয়ৎ বা শুভ-দৃষ্টিটা কিছুদিন পরে হবে এবং শুভ-দৃষ্টির পরে ওরা বউ বাড়িতে আনবে।"[৩২] সম্ভাব্য বিপদ অতিক্রমের সমাধান হিসেবে লোকসংস্কারকে লোকাচারের মাধ্যমে বাস্তবায়নের এ দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়, যা তাদের প্রাত্যহিক জীবনাচরণেরই অংশ। আবার আকস্মিক কোনো রোগ-বালাই বা বিপদ থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে গরিব-অনাহারীকে দান-খয়রাতের মাধ্যমে পরিত্রাণলাভের রীতিও লোকাচার হিসেবে প্রচলিত। 'পদ্ম-গোখরা' গল্পে লক্ষণীয়, আরিফ কলেরায় আক্রান্ত হলে তার সুস্থতা কামনায় দরিদ্রদের আর্থিক সাহায্য করার পাশাপাশি বাড়িতে মিলাদের আয়োজন করা হয়। নিজের ওপর আরোপিত বিপদ কাটাতে এভাবে অন্যদের সাহায্যে এগিয়ে আসার প্রবণতা লোকাচারভুক্ত। 'জিনের বাদশা' গল্পের নায়ক আল্লা-রাখার নাম নির্ধারণের ক্ষেত্রেও লোকাচারের প্রভাব লক্ষণীয়। যেমন– 'চুন্নু ব্যাপারির তৃতীয় পক্ষের দুই-দুইবার মেয়ে হবার পর তৃতীয় দফায় যখন পুত্র এল, তখন সাবধানী মা তার নাম রাখলে আল্লা-রাখা। আল্লাকে রাখতে দেওয়া হল যে ছেলে, অন্তত তার অকালমৃত্যু সম্বন্ধে–আর কেউ না হোক মা তার নিশ্চিন্ত হয়ে রইল!'[৩৩] পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সন্তান হিসেবে ছেলেই যে মা-বাবার কাছে অধিক কাম্য, তা যেমন এ লোকাচারে প্রকাশিত হয়, তেমনিভাবে তার সুস্থতা ও নিরাপত্তার প্রতি অভিভাবকদের প্রত্যাশা-উদ্বেগের সমাহার এতে সন্নিহিত রয়েছে। তবে নজরুলের ছোটগল্পে যে লোকাচারের উল্লেখ সর্বাধিক, সেটি হচ্ছে ভূত-জিনকেন্দ্রিক লোকাচার। এটি গড়ে ওঠার অন্যতম কারণ হলো পারিপার্শ্বিক গ্রামীণ পরিমণ্ডল। গ্রামের নদী-পুকুর-বাঁশঝাড়, জঙ্গল, গাছপালা আবৃত স্থান, বিরান জমি, মজা পুকুর, জনবসতিহীন স্থান প্রভৃতি রাতের অন্ধকারে জনমনে যে ভয় ও উদ্বেগ জাগায়, তা বিভিন্ন অশরীরীর বিচরণক্ষেত্র হিসেবে নানাভাবে তাদের ভাবনা ও বিশ্বাসকে প্রভাবিত করে। জিন, ভূত, পরি, ডাইনি, রাক্ষস,

দেও-দৈত্য, পিশাচ সম্পর্কিত বিবিধ প্রাচীন কাহিনি, লোককথা, কিংবদন্তি নানাভাবে লোকমানসে প্রভাব ফেলে। এছাড়া ধর্মীয় মূল্যবোধ-অনুশাসনও এ ধরনের লোকসংস্কারের অংশ হয়ে ওঠে। হিন্দু সমাজে আত্মা, ভূত-প্রেত সংক্রান্ত ধারণার পাশাপাশি মুসলমান সমাজের জিন-পরি প্রভৃতি দোভাষী পুথি, আরব্য লোককথার দ্বারা বাহিত হয়ে গ্রামীণ বাঙালি জনমানসে ঠাঁই পেয়েছে। 'জিনের বাদশা' গল্পে এ বিষয়ক দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। চান ভানুকে বিয়ে করার জন্য প্রতিবেশী যুবক আল্লা-রাখা জিনের বাদশার ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল। কিন্তু এ বৃত্তান্ত চান ভানু বা তার মা-বাবা জানত না। তাই রাতের বেলা বাড়িতে জিনের বাদশার আগমনে তারা ভীত হয়েছিল। এর প্রতিকার হিসেবে তারা 'তওবা আস্তাগফের' দোয়া পড়ছিল ও আল্লাহর নাম জপছিল। লোকমুখে এ ঘটনা প্রচারিত হলে সম্ভাব্য বিপদ কাটাতে মসজিদের মৌলবিকে দিয়ে পবিত্র কোরআন পাঠ ও মিলাদের আয়োজন করেছিল। কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হয়নি। কারণ এক রাতে একটি কালো বিড়াল তালগাছের ওপর থেকে তাদের বাড়ির জানালায় এসে পড়লে তারা ভেবেছিল, চান ভানুকে নিয়ে নতুন কোনো ঝামেলা হতে পারে। কালো বিড়াল অমঙ্গলের প্রতীক, এমন লোকবিশ্বাস গ্রামীণ সমাজে বহুল প্রচলিত। ফলে চানভানুর বিয়ে একমাস পিছিয়ে দিয়ে এরপর তার অভিভাবকরা বিভিন্ন গ্রামের মন্ত্র-সিদ্ধ গুণীনদের দিয়ে বাড়ির ভূত-বিষয়ক উপদ্রব বন্ধ করার চেষ্টা চালায়। এ গল্পে জলদানো বিষয়ক লোকাচারের দৃষ্টান্তও রয়েছে। নদীতে গোসল করতে গিয়ে চান ভানু জলদানোর কবলে পড়লে প্রতিবেশী যুবক আল্লা-রাখা তাকে উদ্ধার করে। সে যে চান ভানুর বিয়ে ভাঙতে ইতঃপূর্বে জিনের বাদশা ও জলদানো সেজে তাকে ভয় দেখিয়েছিল, তা কেউ জানত না। সেদিনের পর থেকে সে বাড়িতেই মায়ের তোলা পানিতে গোসল সারত। জলদানোর উৎপাত থেকে রেহাই পেতে সে হাতে-কোমরে তাবিজ পরিধান করে। এসব আচরণ লোকাচারের অন্তর্গত।

১.৫ লোকসাহিত্য

লোকসাহিত্য বলতে লোকসমাজে প্রচলিত সহজ ভাষায় মুখে মুখে রচিত এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বাহিত বিভিন্ন ধরনের রচনাকে বোঝায়। শুধু গ্রামীণ জনজীবনের পরিসরেই লোকসাহিত্যের ব্যাপ্তি সীমাবদ্ধ নয়। বরং একটি জাতির বা সম্প্রদায়ের জাতীয়-রাষ্ট্রীয় রূপ-রূপান্তর ও ক্রমবিন্যাসের স্তরগুলোর ছাপও লোকসাহিত্যে পাওয়া যায়। লোকসাহিত্য লোকসংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ শাখা, যাতে রয়েছে লোকজচেতনার প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন উপাদান। আবেগ, অনুভূতি, কল্পনা ও উপলব্ধিকে প্রকাশ করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। সেই তাড়নায় কখনো মৌখিকভাবে, কখনো লিখিত রূপে সে আপন ভাষায় নিজেকে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করে। সাহিত্য সৃজনশীল মানুষের অর্থবহ এই প্রকাশ-বেদনার ফল। মৌখিক ধারার লোকসাহিত্য পূর্বে রচিত রয়েছে, লিখিত সাহিত্য রচিত হয়েছে পরবর্তীকালে। নজরুলের বিভিন্ন ছোটগল্পে প্রাপ্ত লোকসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য শাখাগুলো হল ছড়া, প্রবাদ, প্রবচন, রূপকথা, লোককথা, উপকথা, কিংবদন্তি, লোকসংগীত, পুথিপাঠ প্রভৃতি।

১.৫.১. ছড়া

গ্রামীণ সমাজের বালক-বালিকাদের মধ্যে কথোপকথন ও খেলাধুলার অনুষঙ্গে বিভিন্ন ধরনের ছড়ার প্রয়োগ লক্ষণীয়। এটি কখনো নির্মল বিনোদনের উৎস, কখনো বা পারস্পরিক সম্পর্কের আন্তরিকতা বা বিপ্রতীপ মানসিকতারও বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। কোন্দল, বিবাদ বা বৈরী মনোভাব, আক্রমণ ও রেষারেষি প্রভৃতিও ছড়ার মাধ্যমে তাদের মনোভাবনাকে প্রকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখে। আবার বিভিন্ন লোকক্রীড়ায় ছড়া হয়ে ওঠে খেলার অংশ। সঠিকভাবে তা আবৃত্তি করা খেলার নিয়মের অন্তর্গত। এছাড়া শিশুকে ঘুম পাড়াতে বা তার বায়না মেটাতে ঘুমপাড়ানি ছড়া অভিভাবকদের প্রিয় অনুষঙ্গ। লেটোগানের[৩৪] ব্যবহার বালক-কিশোরদের পারস্পরিক সম্পর্কের ও মনস্তত্ত্বের প্রবণতারাশিকে ইঙ্গিতবহ করে। নজরুল সচেতনভাবেই এসব উপাদানকে একাধিক গল্পে সংযুক্ত করেছেন। নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তসমূহের মধ্যে শেষেরটি লেটোগান, অন্যগুলো প্রচলিত ছড়া।

ঘুম-পাড়ানি মাসি-পিসি ঘুম দিয়ে যেয়ো,
বাটা ভরে পান দেবো গাল ভরে খেয়ো![৩৫]
রোদে রোদে বিষ্টি হয়,
খ্যাঁকশিয়ালের বিয়ে হয়।[৩৬]

১.৫.২ প্রবাদ

প্রবাদে লোকসমাজের বহুকালের অভিজ্ঞতার নির্যাস যেমন সঞ্চিত থাকে, তেমনিভাবে জাগতিক-সাংসারিক শিক্ষা, নীতিভাবনার সারবস্তুও পাওয়া যায়। লোকসমাজের প্রাত্যহিক কথোপকথনে প্রবাদের প্রয়োগ বক্তব্যের তাৎপর্যকে স্পষ্ট করে তোলে। স্বল্প পরিসরে লোকজ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে ধারণের অসাধারণ গুণ প্রবাদের বিশেষ দিক। বুদ্ধির ঝিলিক ও কৌশলী ইশারায় কখনো সরাসরি, কখনো পরোক্ষভাবে বিশেষ ইঙ্গিত প্রবাদে প্রতিধ্বনিত হয়। নজরুলের বিভিন্ন গল্পে প্রযুক্ত কিছু প্রবাদের দৃষ্টান্ত :

টকের ভয়ে পালিয়ে এসে তেঁতুল-তলায় বাসা।[৩৭]
মানুষ মরে মিঠাতে, পাখি মরে আঠাতে![৩৮]
চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা।[৩৯]

১.৫.৩ প্রবচন

লোকসমাজে প্রচলিত জ্ঞানগর্ভ কথাকে প্রবচন হিসেবে বিবেচনা করা যায়। নীতি-আদর্শ-অনুশাসনের পাশাপাশি লোকমানসে সঞ্জাত জীবনভাবনা বা জীবনদর্শনের বিচ্ছুরণ এতে লক্ষণীয়। প্রবাদের ভঙ্গিটি ক্ষেত্রবিশেষে কাব্যিক হলেও প্রবচনের উক্তি মূলত নিটোল গদ্য। সমষ্টিজনের বুদ্ধি, শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত প্রবচনে সরাসরি প্রকাশিত হয়। নজরুলের কিছু গল্পে এর প্রয়োগ নিম্নরূপ :

দুনিয়ার সবচেয়ে মস্ত হেঁয়ালি হচ্ছে মেয়েদের মন।[৪০]
পুরুষদের সাত খুন মাফ।[৪১]
শুভকাজে বিলম্ব করা ভালো নয়[৪২]

১.৫.৪ লোককথা-উপকথা

লোকসমাজের বিভিন্ন কল্পনা, স্বপ্ন, প্রত্যাশা, আকাঙ্ক্ষার পরিচয় রূপকথা-লোককথা-উপকথায় মেলে। বাস্তবতার সমান্তরালে অলৌকিক-অতিলৌকিকের প্রতি আগ্রহ ও আকর্ষণ লোকমানসে সন্নিহিত আবেগ, ভালোলাগা, বিশ্বাস, কামনা, সম্ভাবনা, প্রত্যাশা এবং আশঙ্কা বিভিন্ন রূপক-প্রতীকের অনুষঙ্গে এতে উপস্থিত থাকে। এর পাশাপাশি গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের নৈতিকতা, সংস্কার, পারিপার্শ্বিক সমাজবাস্তবতা ও অভিজ্ঞতার রূপায়ণ বিভিন্নভাবে এসব উপাদানে প্রতিফলিত হয়। মৌখিকভাবে প্রজন্মান্তরে বহমান এসব উপাদানে প্রাচীনকালের লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যেমন সংরক্ষিত থাকে, তেমনিভাবে তা বর্তমানকালেও পাঠক-শ্রোতার বিনোদন ও চিত্তসন্তুষ্টির ভাণ্ডার হিসেবে ভূমিকা রাখে। নজরুলের বিভিন্ন গল্পে এসব উপাদানের দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন,

লোককথা–

> প্রেমিকদের সোনার কাঠির স্পর্শে আমি-যে-আমি, তারও আর কোন গ্লানি নেই, সঙ্কোচ নেই[৪৩]
>
> এটা যে একটা পাতালপুরী, দেও আর পরিদের রাজ্যি, তা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিনে![৪৪]
>
> সাপ যেমন মানিক ছেড়ে তার সেই মানিকটুকুর আলোর বাইরে যেতে পারে না, আমারও হয়েছে তাই।[৪৫]
>
> তখন সাঁঝের রানির কালো ময়ূরপঙ্খী ডিঙিখানা ধূলি-মলিন পাল উড়িয়ে সাগর বুকে নেমেছে।[৪৬]

উপকথা–

> হাতি যখন ভাবে, তার চেয়ে বড় জানোয়ার আর নেই, তখন ছোট্ট একটি মশা তার মগজে কাম্‌ড়ে কিরকম 'ঘায়েল' করে দেয় তাকে।[৪৭]
>
> ভেড়ার দলে যখন নেকড়ে বাঘ প্রবেশ করে তখন সমস্ত ভেড়া একসঙ্গে জুটে চারিদিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে চক্ষু বুঁজে মাথা গুঁজে থাকে, মনে করে তাদের কেউ দেখতে পাচ্ছে না।[৪৮]

১.৫.৫ কিংবদন্তি

সত্য, মিথ্যা, সম্ভাবনার সমাহারে লোকমুখে প্রচলিত বিভিন্ন ভাবনা, ধারণা বা বিশ্বাসকে কাহিনির মাধ্যমে বহুযুগ ধরে প্রচলনের মাধ্যম হিসেবে অবলম্বিত কাহিনি, কথা, গল্পগুলোই কিংবদন্তি হিসেবে পরিচিত। এতে প্রাচীন বা সমকালীন ইতিহাসের নির্যাস থাকতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে সেটি পরিবর্তিতভাবেও লোকসমাজে প্রচলিত থাকে। কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস বা প্রামাণিক দৃষ্টান্ত হিসেবে এর সাক্ষ্য ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তথ্য ও সম্ভাবনার নির্যাস কিংবদন্তিতে অধিক গুরুত্ব পায়। ব্যক্তির পাশাপাশি বিভিন্ন বস্তু, ঐতিহাসিক নির্মাণ বা স্থাপত্যকে নিয়েও কিংবদন্তি লোকসমাজে প্রচলিত থাকে। নজরুলের ছোটগল্পে এর দৃষ্টান্ত–

> ঐ যে বাঁধানো কবরগুলো, ওগুলো অনেক কালের পুরানো। তখন ছিল বাদশাহি আমল, আর আমাদের এই ছোট্ট গ্রামটাই ছিল 'ওলিনগর' বলে একটা মাঝারি গোছের শহর। ঐ যে সামনে 'রাজার গড়' আর 'রানির গড়' বলে দুটো ছোট্ট পাহাড় দেখতে পাচ্ছ, ওতেই থাকতেন তখনকার রাজা রানি–রাজকুমার আর রাজকুমারীরা। লোকে বলে, তাঁরা শুতেন হীরার পালঙ্কে, আর খেতেন 'লাল জওয়াহের'। আর, কবরস্থানের পশ্চিম দিকে ঐ যে পির সাহেবের 'দরগা' ওরই 'বর্দোয়ায়' নাকি এমন সোনার শহর পুড়ে ঝার হয়ে যায়। সেই সঙ্গে রাজার ঘরগুষ্টি সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, আজ তাঁর বংশে বাতি দিতে কেউ নেই। পশ্চিমে-হাওয়ায় তাঁদের সেই ছাই-হওয়া দেহ উড়ে উড়ে হয়তো এই গোরস্থানের উপরই এসে পড়েছে।[৪৯]

১.৫.৬ লোকসংগীত

লোকসংগীত হলো লোকসমাজের বাসিন্দাদের অন্তর্গত আবেগ, ভাবনা, সুর, তাল, ছন্দময় গীতোচ্ছ্বাস, যা তাদের নিত্যদিনের বোঝাপড়া, পারস্পরিক সম্পর্ক, ওঠাবসা ও মানবীয় বন্ধনকে গানের মাধ্যমে প্রকাশ করে। ঐতিহ্যের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ ও ব্যক্তিক উপলব্ধিকে সমষ্টিজনের জন্য প্রকাশের আকুলতা লোকসংগীতের সম্প্রসারণের ভিত্তি। অন্তর্গত আবেগ, সংবেদনা, কল্পনা এবং অনুভবকে বাণীময় কাঠামোতে ধারণের গুণে এর আবেদন লোকসমাজে অধিক সমাদৃত। নজরুলের গল্পে এর দৃষ্টান্ত–

লোকগীতি

পরের জন্য কাঁদ রে আমার মন,
হায়, পর কি কখন হয় আপন?[৫০]

১.৫.৭ পুথিসাহিত্য

বাঙালি মুসলিম গ্রামীণসমাজে আঠারো শতকের শেষভাগে ধর্মীয়-অলৌকিক কাহিনিবিশিষ্ট একধরনের কাব্যের বহুল প্রচলন ছিল। এসবের বিষয়বস্তু ছিল আরব-ইরানের লোককাহিনি ও রোমান্সধর্মী রচনার প্রভাবে রচিত নবী-রসুলদের জীবনকাহিনি, সেখানকার বীর ও যোদ্ধাদের বৃত্তান্ত, প্রেমাখ্যান, দুঃসাহসিক অভিযাত্রা ও প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধগাথা প্রভৃতি। উনিশ শতক অবধি এ ধারা লোকসমাজে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। লোকসমাজের চিত্তবিনোদনের উৎস হিসেবে পুথিপাঠের আসর বসিয়ে শ্রোতাদের উপভোগের ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে বাংলার লোকসংস্কৃতির প্রাসঙ্গিক দিক। 'জিনের বাদশা' গল্পে এ প্রসঙ্গের বিভিন্ন উল্লেখ লক্ষণীয়:

> একদিন হঠাৎ আল্লা-রাখার 'সোনাভানে'র পুথি পড়তে পড়তে মনে হল, চান ভানুই সে সোনাভানবিবি এবং সে গাজি হানিফা। তার কারণ, চানের চেয়ে সুন্দরী মেয়ে গাঁয়ে ছিল না। ... আল্লা-রাখা তার বাবরি চুলের মাঝে একটা এবং দুদিকে দুটো–এই তিন তিনটে সিঁথি কেটে, চুলে, গায়ে, জামায় বেশ করে কেশরঞ্জন মেখে, গালে বেশ করে পান ঠুসে সোনাভান ওর্ফে চান ভানুকে জয় করতে বেরিয়ে পড়ল।[৫১]

১.৬ ধর্মীয় লোকজ উপাদানের সমাবেশ

নজরুল পারিবারিক ও বংশপরিচয়গত সূত্রে ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলেও সনাতন ধর্মের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও সংযোগ গড়ে উঠেছিল বাল্যকাল থেকেই। যে চুরুলিয়ায় তিনি বড় হয়েছিলেন, সেখানে ছিল হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিন ধরে পাশাপাশি বসবাসের ঐতিহ্য। নজরুলের পিতা ফকির আহম্মদ বাংলা ও উর্দুতে পণ্ডিত ছিলেন। পাশাপাশি আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষা-সাহিত্যের চর্চা কাজী পরিবারে দীর্ঘদিন অব্যাহত ছিল। মক্তবের মৌলবি কাজী ফজলে আহম্মদের নিকট আরবি ও ফারসিতে নজরুলের হাতেখড়ি হয়। এর পাশাপাশি পিতৃব্য ও লেটো ওস্তাদ কাজী বজলে করিম বাংলা, হিন্দি, উর্দু, ফারসি প্রভৃতি মিশ্র ভাষায় কবিতা লিখতেন। এসব কিছুর মিথস্ক্রিয়ায় ইসলামী ঐতিহ্য ও অনুষঙ্গের সঙ্গে নজরুলের পরিচিতি নিবিড় হয়ে ওঠে।[৫২] অসাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গির আত্মপ্রকাশ নজরুলের সমুদয় সৃষ্টিশীলতার অন্যতম দিক। বিভিন্ন ছোটগল্পে তিনি

লোকমানসে প্রচলিত ইসলামী ও সনাতন ঐতিহ্যবাহী প্রসঙ্গ, চরিত্র ও পুরাণকে নিজস্ব শিল্পভাবনার আলোকে বিন্যস্ত করেছেন। যেমন,

ইসলামী অনুষঙ্গ–

ইসরাফিলের শিঙ্গা, তুমি বাজো সবকে নিসাড় করে দিয়ে।[৫৩]

এখানে (কারবালা) এসেই মনে পড়ে সেই হাজার বছর আগের ধর্ম আর দেশ রক্ষার জন্যে লক্ষ লক্ষ তরুণ বীরের হাসতে হাসতে 'শহীদ' হওয়ার কথা![৫৪]

সনাতন অনুষঙ্গ–

মধু ভেবে আকণ্ঠ হলাহল পানের তীব্র জ্বালায় ছটফট করছি[৫৫]

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর যার কূল-কিনারা পান না, তাকে ধরবেন 'পদীর ভাই গৌরীশঙ্কর'।[৫৬]

ছুড়িটা ঐ শিবের মতন সোজা ভোলানাথ সোয়ামিকে আমার পেয়ে বসল।[৫৭]

১.৭ লোকভাষা

লোকসংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে লোকভাষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন লোকগোষ্ঠীর ভাষা অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়, যার নেপথ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক রূপান্তরের সমন্বিত অভিঘাত। ভাষা মানুষের মনের ভাব প্রকাশের মৌলিক বাহন। তবে এর ভূমিকা এতেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং সভ্যতার আদিম পর্যায় থেকে বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে মানুষ যে সভ্যতার বর্তমান অবস্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছে, এক্ষেত্রে ভাষার ভূমিকাই প্রধান। নজরুলের একাধিক ছোটগল্পে লোকভাষার বৈচিত্র্যময় রূপায়ণ নিম্নরূপ:

ঘ. আজ এই পুরো দুটো বছর ধরে ভাবছি, শুধু ভাবছি,– আর সবচেয়ে আশ্চয্যি হচ্ছি, লোকে আমাকে দেখলেই এমন করে ছুটে পালায় কেন। ... মেয়েরা আমায় দেখলেই কাঁক হতে দুম করে কলসি ফেলে সে কি লম্বা ছুট দেয়! ছেলেমেয়েরা তো নাকমুখ সিঁটকে ভয়ে একেবারে আঁৎকে ওঠে। হাজার গজ দূর থেকে বলে, 'ওরে বাপরে, ঐ এল পাগলি রাক্ষুসী মাগি, পালা–পালা! খেলে, খেলে!' –কেনে। আমি কোন উনোনমুখো সুঁটকোর পাকা ধানে মই দিয়েছি? কোন খালভরা ড্যাকরার মুখে আগুন দিয়েছি? কোন চোখখাগি আবাগির বেটির বুকে বসে তপ্ত খোলা ভেঙেছি? কার গতর আমকাঠ না কুল-কাঠের আখায় চড়িয়েছি? কোন ছেলেমেয়ের কাঁচা মাথাটা চিবিয়ে খেয়েছি?[৫৮]

ঙ. আলি নসিব মিঞা সব বুঝলেন। কিন্তু বুঝেও তিনি কিছুতেই হাসি চাপতে পারলেন না। হেসে ফেলে মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'কি হইছে রে বেডি? ছেমরাডা প্যাঁচার লাহান বাড়িত বইয়্যা রইব, একডা কথা কইব না, তাইনাসেন উয়ারে প্যাঁচা কয়।' নূরজাহান রেগে উত্তর দিল, 'আপনি আর কইবেন না আব্বা, হে বেডায় ঘরে বইয়া কাঁদে, আর আপনি হাসেন। আমি পোলা অইলে এইদুন একচটকনা দিতাম বুস্তম্যারে আর উই ইবলিশা পোলাপানেরে, যে, ঐ হ্যানে পইর‍্যা যাইত উৎক্যা মাইরা। উইঠ্যা আর দানা-পানি খাইবার অইত না!' বলেই কেঁদে ফেললে। ... আলি নসিব মিঞা মেয়ের মাথায় পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'চুপ দে বেডি, এইবারে ইবলিশের পোলারা আইলে দাবার পাইর‍্যা লইয়া যাইব! মুনশি বেডারে কইয়্যা দিবাম, হে ঐ বুস্তম্যারে ধইরা তার কান দুডা এক্কেরে মুত্যা কইর‍্যা কাইট্যা হালাইবো!'[৫৯]

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে স্বামীহত্যার দায়ে দণ্ডপ্রাপ্ত, গ্রামবাসীর দ্বারা অবহেলিত, প্রতিবাদী বীরভূমের বাগদি নারী বিন্দির বিড়ম্বিত জীবনের পরিহাস উপস্থাপনায় লেখক তার সংলাপে স্বতন্ত্র ভাষাবিন্যাসকে সংযোজিত করেছেন। ক্রিয়া, বিশেষ্য ও বিশেষণের আঞ্চলিক উচ্চারণ, বাগধারা, প্রবাদ, আরবি-ফারসি শব্দের সঙ্গে লৌকিক শব্দ ও গালিগালাজের সমাহারে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার

বিরুদ্ধে বিন্দির বিক্ষুব্ধ, বিদ্রোহী সত্তার স্ফুরণ ঘটেছে। সেই নারীর ঘৃণা, তাচ্ছিল্য, আক্রোশ, হতাশা ও ক্রোধের অকপট আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনে এ উদ্ধৃতিতে বিরামচিহ্নের বৈচিত্র্যময় প্রয়োগ লক্ষণীয়। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে পিতা-কন্যার পারস্পরিক সংলাপের অবলম্বন ময়মনসিংহের উপভাষা। একের প্রতি অন্যের আবেগানুভবের উপস্থাপনায় লেখক ব্যবহার করেছেন হাস্য-পরিহাস, বাগধারা, লোকজ উপমা, অপ্রচলিত গ্রাম্য শব্দ, ধর্ম-সংক্রান্ত গালিগালাজ, ক্রিয়া-বিশেষ্য-বিশেষণের আঞ্চলিক রূপকে। প্রত্যুত্তরবাচক সংলাপের ধারাবাহিকতা এ উদ্ধৃতিতে রক্ষিত হয়েছে শানিত অথচ লক্ষ্যভেদী শব্দসমূহ চয়নের অনায়াস নৈপুণ্যগুণে।

নজরুল নতুন সমাজ গঠনের যে স্বপ্ন দেখতেন, এর কলাকুশলীরা ছিল গ্রামবাংলার খেটে খাওয়া লোকসমাজের বাসিন্দা। তাদের পরিশ্রমক্লিষ্ট জীবিকা, আবহমান কাল থেকে বাহিত লোকসংস্কৃতির প্রতি তাদের অনুরাগ এবং নিজস্ব ধরনের জীবনচর্যা–প্রভৃতি অনুষঙ্গের সমবায়ে তিনি লোকজচেতনার শিল্পভাষ্য বিভিন্ন ছোটগল্পে গ্রন্থিত করেছেন। লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলো বহুযুগ ধরে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বহন করে লোকসমাজের বাসিন্দাদের জীবনভাবনা, বিশ্বাস-সংস্কার-মূল্যবোধ, প্রত্যাশা-স্বপ্ন ও সৃষ্টিশীলতার বৈচিত্র্যময় নমুনা। গল্পকার নজরুল গণমানুষের মুক্তি ও কল্যাণের যে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন, তাই লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির অদ্বৈত সম্পর্ককে শিল্পভাষ্যে রূপায়ণে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। এটিই একজন কালজয়ী শিল্পীর সাহিত্যসাধনার অনন্য দৃষ্টান্ত। তাই তিনি কাল থেকে কালোত্তরে অমর, চিরভাস্বর মহিমায় উচ্চাসীন।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ বাংলা কথাসাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাবের বাহন ছিল ছোটগল্প। 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' (সওগাত, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬) শীর্ষক ছোটগল্প তাঁর প্রথম সাহিত্যকর্ম। এছাড়া তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থটিও হলো গল্প সংকলন *ব্যথার দান*। তিনি 'আমার সুন্দর' শীর্ষক প্রবন্ধে জানিয়েছেন–

> আমার সুন্দর প্রথম এলেন ছোটগল্প হয়ে তারপর এলেন কবিতা হয়ে। তার পর এলেন গান, সুর, ছন্দ ও ভাব হয়ে। উপন্যাস, নাটক, লেখা (গদ্য) হয়েও মাঝে মাঝে এসেছিলেন। [*নজরুল-রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩৭]

২ লোকজ উপাদান বলতে লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত উপাদানসমূহকে বোঝায়। সংস্কৃতি বলতে মানবজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সকল প্রক্রিয়াকেই বোঝায়। অর্থাৎ লোকসমাজের বাসিন্দাদের অভ্যাস, আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার, মূল্যবোধ, খাদ্যাভ্যাস, পেশা, শখ, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিল্প-সাহিত্য প্রভৃতির সমবায়ে গড়ে ওঠা সামগ্রিক অভিব্যক্তিই লোকসংস্কৃতিতে প্রতিফলিত হয়। যেসব প্রাকৃতিক উপাদানকে লোকসমাজের বাসিন্দা বুদ্ধি ও কৌশলের মাধ্যমে ব্যবহারোপযোগী করে তোলে প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন উপযোগিতা মেটাতে এবং যাতে তার অন্তর্গত সৃষ্টিশীলতা, সম্ভাবনা ও সাংস্কৃতিক বোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে নিজস্ব ভঙ্গি ও কৌশলে, সেগুলোকেই লোকজ উপাদান বলে। এ প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে জানতে দ্রষ্টব্য : তাশরিক-ই-হাবিব, *বাংলাদেশের উপন্যাসে লোকজ উপাদানের ব্যবহার*, পরানকথা, ঢাকা, ২০২৪।

৩ 'লোকজচেতনা' শব্দবন্ধটি লোকসমাজের অন্তর্গত জনসমষ্টির ভাবনা ও ধারণাগত রূপরেখার ইঙ্গিতবহ, যা তাদের মানসগঠন ও অবস্তুগত সাংস্কৃতিক চিহ্নরাশিকে বিশিষ্টরূপে দ্যোতিত করে। 'লোক' বলতে সমষ্টিবদ্ধ যে মানুষদের বোঝায়, তাদের রয়েছে নির্দিষ্ট সামাজিক পরিচয়, বংশপরম্পরাগত পেশা অবলম্বনের প্রবণতা, নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, স্বকীয় জীবনবোধ ও ধর্ম-দর্শনভাবনা। বিভিন্ন লোকবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানী, 'লোক'-সম্পর্কিত ধারণা প্রকাশের সূত্রে লোকসংস্কৃতি বিষয়ক প্রাসঙ্গিক অভিমত উপস্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ হলো

মারিয়া লিচ সম্পাদিত দুই খণ্ডের *Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend*। (শেখ মকবুল ইসলাম, *লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান : তত্ত্ব, পদ্ধতি ও প্রয়োগ*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৮৫)

৪ সৈকত আসগর, *নজরুলের গদ্যরচনা : ভাবলোক ও শিল্পরূপ*, অস্ট্রিক পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ২৪

৫ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ*, এম.সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৮৪

৬ *লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ৬

৭ সুকুমারী ভট্টাচার্য, *নিয়তিবাদ : উদ্ভব ও বিকাশ*, ক্যাম্প, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ১৭

৮ আবদুল হাফিজ, *লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১

৯ *লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

১০ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-রচনাবলী*, *চতুর্থ খণ্ড*, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৩৬০

১১ *নজরুল-রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০

১২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৬

১৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬

১৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮

১৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৩

১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭

১৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬

১৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৪

১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭১

২০ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-রচনাবলী*, *দ্বিতীয়* খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০-২৮১

২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১

২২ *নজরুল-রচনাবলী*, *চতুর্থ খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৭

২৩ *নজরুল-রচনাবলী*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

২৪ *নজরুল-রচনাবলী*, *চতুর্থ খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮১

২৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭

২৬ *নজরুল-রচনাবলী*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫

২৭ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-রচনাবলী*, *দ্বিতীয়* খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ২৪১

২৮ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-রচনাবলী*, *প্রথম খণ্ড*, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ২৪৩

২৯ *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

৩০ ওয়াকিল আহমদ, *লোকসংস্কৃতি*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৩১৭

৩১ মোমেন চৌধুরী, *বাংলাদেশের লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান : জন্ম ও বিবাহ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ১

৩২ *নজরুল-রচনাবলী*, *চতুর্থ খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৪

৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭২

৩৪ কল্পতরু সেনগুপ্ত, *জনগণের কবি কাজী নজরুল ইসলাম*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১১

৩৫ *নজরুল-রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

৩৬ *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮

৩৭ *নজরুল-রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮

৩৮ *নজরুল-রচনাবলী*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩

৩৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১

৪০ *নজরুল-রচনাবলী*, *প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২
৪১ *নজরুল-রচনাবলী*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০
৪২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০
৪৩ *নজরুল-রচনাবলী*, *প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০
৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮
৪৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯
৪৬ *নজরুল-রচনাবলী*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০
৪৭ *নজরুল-রচনাবলী*, *প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬
৪৮ *নজরুল-রচনাবলী*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪
৪৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪
৫০ *নজরুল-রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬
৫১ *নজরুল-রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৪
৫২ কমলচন্দ্র মণ্ডল, *কালজয়ী নজরুল*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ২৬
৫৩ *নজরুল-রচনাবলী*, *প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫
৫৪ *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭
৫৫ *নজরুল-রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪
৫৬ *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১
৫৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭
৫৮ *নজরুল-রচনাবলী*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪
৫৯ *নজরুল-রচনাবলী*, *চতুর্থ খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯০

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, তেতাল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩২/ডিসেম্বর ২০২৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43ii.003

চাঁদপুর জেলার উপভাষা : ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

তসলিমা খাতুন*

সারসংক্ষেপ

উপভাষাতত্ত্ব হলো ভাষাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রতিষ্ঠিত শাখা। একটি ভাষার পূর্ণতা ও বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ রচনার ভিত্তি সুদৃঢ় করতে উপভাষাতত্ত্বের প্রায়োগিক বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরি। এই প্রেক্ষিতে বাংলা ভাষার বৈচিত্র্যময় উপভাষার সঠিক ও যথাযথ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অপরিহার্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলা উপভাষার গবেষণা আজও পর্যাপ্ত নয়। অথচ অঞ্চলভেদে মানুষের মুখের ভাষা বা কথ্য ভাষায় পার্থক্য বিদ্যমান। প্রতিটি অঞ্চলের ভাষারই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে; রয়েছে ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, বাক্যতাত্ত্বিক ও অর্থতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য। বর্তমান গবেষণার মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত চাঁদপুরের উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ, বিশ্লেষণ ও প্রমিত বাংলার সাথে সম্পর্ক-স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়। এ প্রেক্ষিতে বিষয়বস্তু হিসেবে জেলাটির কথ্যভাষার মৌলিক স্বরধ্বনির অবস্থান, দ্বি-স্বরধ্বনি, সহধ্বনি, স্বরসঙ্গতি, স্বরাগম, স্বরধ্বনিলোপ, অপিনিহিতি, ব্যঞ্জনধ্বনির অবস্থান, অল্পপ্রাণ ধ্বনি প্রভৃতি এই আলোচনায় স্থান পেয়েছে। এক্ষেত্রে জেলাটিতে বসবাসকারী অশিক্ষিত-অর্ধ শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কথ্য ভাষার তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে ধ্বনিতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য নিরূপণ করা হয়েছে। এছাড়াও ধ্বনিতাত্ত্বিক বিভিন্ন সূত্র প্রয়োগের সাহায্যে উপভাষাটির স্বকীয়তা নিরূপণ ও প্রমিত বাংলার সাথে তুলনা উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বোপরি গবেষণাকর্মটির প্রাপ্ত ফলাফল বাংলা ভাষার শব্দ-ভাণ্ডার সমৃদ্ধির পাশাপাশি চাঁদপুর জেলার উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

চাবিশব্দ : বাংলা উপভাষা, চাঁদপুর জেলা, ধ্বনিতত্ত্ব, রূপমূল।

১. ভূমিকা

পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি ভাষার মতো বাংলা ভাষারও বৈচিত্র্যময় উপভাষা রয়েছে। জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন *Linguistic survey of lndia*-গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে বাংলা উপভাষা শ্রেণিকরণের যে নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন তার আলোকে ভাষাবিজ্ঞানীরা উপভাষার বিভাজন করেছেন। তবে বাংলা উপভাষার এই শ্রেণিকরণ সম্পর্কে পূর্ববর্তী মনীষীদের গবেষণা যথেষ্ট নয় বলে অভিমত রয়েছে। এই বিষয়ে ভাষাতত্ত্ববিদ সুকুমার সেন বলেন, 'তন্ন-তন্ন করিয়া বাঙ্গালা উপভাষার ভৌগোলিক জরিপ (Dialect Geography) এখনও প্রস্তুত হয় নাই।'[১] বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ সুকুমার সেনের এই উক্তির আলোকে নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলা উপভাষার গবেষণা পরিকল্পিত ও পূর্ণাঙ্গ নয়। তাই বাংলা উপভাষার পর্যাপ্ত, সুপরিকল্পিত ও পরিপূর্ণ গবেষণা অত্যন্ত জরুরি। এই প্রেক্ষিতে, আলোচ্য প্রবন্ধে চাঁদপুর জেলার উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য নিরূপণের প্রয়াস রয়েছে। চাঁদপুর জেলাটি

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা।

চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অবস্থিত একটি কৃষিপ্রধান অঞ্চল। জেলাটির উত্তরে রয়েছে মুন্সিগঞ্জ ও কুমিল্লা জেলা, দক্ষিণে নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও বরিশাল জেলা, পূর্বে কুমিল্লা ও পশ্চিমে শরিয়তপুর ও মুন্সিগঞ্জ ছাড়াও মেঘনা নদীর অবস্থান। পদ্মা, মেঘনা ও ডাকাতিয়ার মিলনস্থলে অবস্থিত নদী বিধৌত এই জেলাটির অধিকাংশ জনগণ কৃষি ও মৎস্যপেশা নির্ভর। 'নদী যেমন তাদের জীবন কেড়ে নেয়, ঘর-বাড়ি ভেঙ্গে একাকার করে। আবার এই নদীতেই তারা জীবিকার সন্ধানে নামে।'[২] যদিও জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে তারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করছে। তবে ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ জেলাগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করায় এখানকার জনগণকে বিভিন্ন জায়গার মানুষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। সেক্ষেত্রে জেলাটির ভাষাতাত্ত্বিক অবস্থান নির্ণয় জরুরি। পূর্ববর্তী গবেষকবৃন্দ চাঁদপুর জেলাকে কোনো উপভাষার পর্যায়ভুক্ত করেননি। তবে বৃহত্তর চট্টগ্রাম বিভাগকে আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ 'দক্ষিণাঞ্চলীয়'[৩] উপভাষার শ্রেণিভুক্ত করেছেন। গবেষণায় দেখা যায়, চাঁদপুর জেলার উপভাষায় গঠনকৌশল, প্রয়োগকাঠামো ও ভাষাতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। এই প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই জেলাটির ভাষাতাত্ত্বিক বিশেষত্ব নিরূপণ অপরিহার্য। কেননা উপভাষার মধ্যেই নিহিত রয়েছে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিচয় এবং নিজস্ব শব্দভাণ্ডার। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে তাই চাঁদপুর জেলার উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য, মৌলিকত্ব বা বিশেষত্ব নিরূপিত হয়েছে।

১.১. গবেষণা পদ্ধতি

এ গবেষণাটি চাঁদপুর জেলার অশিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কথ্যভাষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রধানত ক্ষেত্র গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। এছাড়াও ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন গ্রন্থ, উপভাষা বিষয়ক গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, জার্নাল, আঞ্চলিক ভাষার অভিধানসহ বিভিন্ন অভিধান ব্যবহার করে পাঠ বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সর্বোপরি, প্রমিত বাংলাসহ অপরাপর উপভাষার সাথে চাঁদপুরের উপভাষার তুলনার ক্ষেত্রে গবেষণাকর্মটিতে তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ রয়েছে।

২. ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

'চাঁদপুর জেলার উপভাষা'র ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ধ্বনিতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য নিরূপণ অপরিহার্য। উপভাষাটিতে প্রাপ্ত ধ্বনিগুলো চলিত শিষ্ট বাংলা ধ্বনির অনুরূপ হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োগভেদে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে পার্থক্য বিদ্যমান। নিম্নে এ জেলার ধ্বনিগুলোর স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকত্বের বিভিন্ন দিক পর্যালোচিত হয়েছে।

২.১.১. স্বরধ্বনির অবস্থান : বাংলা স্বরধ্বনির অবস্থান কখনো রূপমূলের আদিতে, কখনো মধ্যবর্তী স্থানে আবার কখনো অন্ত্যে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। 'চাঁদপুর জেলার উপভাষা'য় ব্যবহৃত স্বরধ্বনিমূলসমূহ প্রমিত কথ্য বাংলা স্বরধ্বনিমূলের অনুরূপ। যথা :

মূলধ্বনি	রূপমূলের আদি	রূপমূলের মধ্য	রূপমূলের অন্ত্য
/ই/(i)	ইছা (চিংড়ি) [ic^{h}a]	বদুইল্যা(জমিতে কাজ করা শ্রমিক) [bɔduilæ] নাইন্ট্যা (গরুর পানি খাবার পাত্র) [naintæ] আইজ (আজ) [aij]	তেলাই (তেল) [telai] বিলাই (বিড়াল) [bilai] মিডাই (গুড়) [midai] আঁই [a:i](আমি)
/এ/(e)	এন্নে (এভাবে) [enne] এডা (এটা) [eda]	আইয়েন (আসেন) [aiyen] দিয়েন (দিবেন) [diyen]	আন্নে (আপনি) [anne] ফাইছে (পেয়েছে) [p^{h}aic^{h}e]
/এ্যা/(æ)	এ্যালা (এখানে) [æla]	ট্যাহা (টাকা) [tæha] হ্যাদাব্যাড়া (টিনের প্রাচীর) [hædabæra]	কাইজ্যা (ঝগড়া) [kaijæ] জাইন্যা (জেনে) [jainæ]
/আ/(a)	আইল (এল) [ail] আইস্যা (হাসি) [aisæ]	কড়াইয়া (কড়াই) [kɔraiya] দুয়ার (দরজা) [duyar]	বান্দা (বাঁধা) [banda] দআ (দোয়া) [dɔ:a]
/অ/(ɔ)	অলদা (হলুদ) [ɔlda] অইছিল (হয়েছিল) [ɔic^{h}il] অন [ɔn](এখন)	কায়চে (খেয়েছে) kayc^{h}e] পয়লা (প্রথম) [pɔyla]	হান্দায় (ভেতরে যায়) [handay] হাতার (সাঁতার) [hatar]
/উ/(u)	উন (উপরে) [un]	বউন (বসুন) [bɔun] লউর (দৌড়) [lɔaur]	নুয়াবউ (নতুন বউ) [nuyabɔu]
/ও/(o)	ওরু (এতোটুকু) [oru]	হুক্কু (ফুফু) [hukku] হোলা (ছেলে) [hola]	নাও (নৌকা) [nao]

ছক- ২: স্বরধ্বনির অবস্থান

প্রমিত কথ্য বাংলার ন্যায় 'চাঁদপুর জেলার উপভাষা'য় রূপমূলের আদি, মধ্য ও অন্ত্য সকলক্ষেত্রেই স্বরধ্বনিমূলসমূহের অবস্থান লক্ষ করা যায়।

২.১.২. দ্বিস্বরধ্বনি (Dipthongs)

'দুটি স্বরধ্বনি মিলে এক অক্ষর (syllable) তৈরি করলেই তা Diphthong তথা যৌগিক বা দ্বিস্বরধ্বনি হিসেবে পরিগণিত হয়'।[৪] তবে, পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি নিঃশ্বাসের একই প্রয়াসে উচ্চারিত না হলে তা দ্বিস্বরধ্বনি হিসেবে পরিগণিত হয় না। মুহম্মদ আব্দুল হাই[৫] প্রমিত কথ্য বাংলায় উনিশটি নিয়মিত ও বারোটি অনিয়মিত দ্বিস্বরধ্বনির কথা বলেছেন। এখানে চাঁদপুরের উপভাষায় ব্যবহৃত অনিয়মিত দ্বিস্বর ধ্বনি দেখানো হল–

১. ই-ই (i-i)→লিইয়ি [liiyi] (নিয়ে), যাইয়ি[jaiyi] (যেয়ে)
২. ই-উ (i-u) →শিউলি [ʃiuli]
৩. এ-ই(e-i)→এইডা [eida] (এটা), হেই[hei] (সেই)
৪. এ-ও (e-o)→ দেয়ো [deyo] (দাও)
৫. এ-উ (e-u)→ ঢেউঞ্চি [d^heunɳc] (বাঁশের ডাল)
৬. এ্যা-ও (æ-o)→দ্যাওয়া[dæoya] (মেঘ)
৭. এ্যা- অ (æ-ɔ)→ল্যায়য়া [læyya](নেয়া)
৮. আ-ই (a-i)→ আইছ্যা[aic^{h}æ] (আচ্ছা), আইত[ait] (রাত)
৯. আ-ও (a-o)→জাওরে[jaore] (যাওয়া), নাও[nao] (নৌকা)
১০. আ-অ (a-ɔ)→ময়দান[mydan] (কোল), জায়গোত[jaigot] (জায়গা)
১১. আ-উ (a-u) বাউনি[bauni] (ধান রাখার ঝুড়ি)
১২. অ-ও (ɔ-o)→কয়োই[kɔyoi] (করো), অয়ো[ɔyo] (হলো)
১৩. অ-অ (ɔ-ɔ)→অয়[ɔy] (হয়)
১৪. ও-ও (o-o)→ গোওয়ালু[gooyalu] (গোয়ালা)
১৫. ও-উ (o-u)→আওয়ুজ [aoyuj](আওয়াজ)
১৬. ও-ই (o-i)→ ওইছে[oic^{h}e] (হয়েছে)
১৭. ও-আ (o-a)→যাওয়ার [jaoyar](যাবার), ওয়া (এক)
১৮. উ-ই(u-i)→উইততোর[uittor] (উত্তর)
১৯. উ-উ(u-u)→লুউর [luur](দৌড়). মুউ[muu] (তরকারির ঝোল)

'চাঁদপুর জেলার উপভাষা'য় নিয়মিত দ্বি-স্বরধ্বনির পাশাপাশি অনিয়মিত দ্বি-স্বরধ্বনির ব্যবহারও লক্ষণীয়। যথা :

১. ই-আ (i-a)→ বিয়া [biya](বিয়ে)

২. ই-এ (i-e)→গিয়ে [giye](যাওয়া)
৩. ই-ও (i-o)→দিওনা[diona] (না দেওয়া)
৪. এ-আ(e-a)→দেয়া[deya] (গরুছানা)
৫. এ-ও (e-o)→ দেওনি [deoni](দেবে নাকি)
৬. এ্যা-আ (æ-a)→ম্যায়াপিডা[mæyapida](ম্যারাপিঠা)
৮. ও-আ (o-a)→ দোয়ার [doyar](দরজা)
৯. ও-অ (o-ɔ)→ লোয়[loy] (নেয়)
১০. উ-এ(u-e)→পুয়ে[puye] (পরিপূর্ণ)
১১. উ-আ(u-a)→জুয়াল[juyal] (জোয়াল)
১২. উ-ও (u-o)→জাগুর[jagur] (মাগুর মাছ)

এই সকল নিয়মিত ও অনিয়মিত দ্বি-স্বরধ্বনি ছাড়াও আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ[৬] প্রমিত কথ্য বাংলায় যেসকল দ্বিস্বরধ্বনির প্রয়োগ দেখিয়েছেন, সেগুলো 'চাঁদপুরের উপভাষা'য় লক্ষণীয়। যথা :

১. ই-এ্যা (i-æ)→ থাইল্যা [t^hailæ] (ডাল)
২. উ-এ্যা (u-æ)→ পলুয়্যা [pɔluyæ] (পোলাও)

এছাড়াও চাঁদপুর জেলার উপভাষায় প্রাপ্ত দ্বিস্বরধ্বনিগুলোর স্বাতন্ত্র্য নিরূপণ করতে গিয়ে স্বতন্ত্র কিছু দ্বিস্বরধ্বনির সন্ধান পাওয়া যায়; যেগুলোকে জেলাটির নিজস্ব দ্বিস্বরধ্বনি বলা হয়। নিম্নে জেলাটির নিজস্ব দ্বিস্বরধ্বনিগুলো উদাহরণসহ দেখানো হলো :

১. ই-আ (i-a)→ বেলিয়া [beliya] (বেলায়)
[আঁই রুটি বেলিয়া খইতে আইচ] (ai ruti beliya k^hoite aic) (আমি রুটি বেলে খেতে আসছি)
২. আ-আ (a-a)→ ঘাটলায়া [g^hatlaya](ঘাটে)
[আঁই হুইর ঘাটলায়া যাইতেয়াছি] (ai huir g^hatlaya jaiteyac^{h}i) (আমি পুকুর ঘাটে যাচ্ছি)
৩. অ-ই (ɔ-i)→অইতে[ɔite] (হতে)
[চাইল অইতে বাত অয়] (cail ɔite bat ɔy) (চাল থেকে ভাত হয়)

চাঁদপুর জেলায় ব্যবহৃত দ্বিস্বরধ্বনিগুলো প্রমিত কথ্য বাংলা দ্বিস্বরধ্বনি থেকে পৃথক। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'গৌড়ীয় উপভাষা'র[৭] কিছু অঞ্চল ও 'ঢাকাই উপভাষা'র[৮] সাথে কিছুটা সাদৃশ্য এই উপভাষায় পরিলক্ষিত হয়।

২.১.৩. সহধ্বনিমূল (Allophone):

বাংলা ভাষায় মূলধ্বনির উচ্চারণগত বৈচিত্র্যের প্রতিরূপ হলো সহধ্বনি। 'সহধ্বনি (Allophone) হলো স্বনিম বা মূলধ্বনির বিভিন্ন উচ্চারণগত বৈচিত্র্য, অন্য কথায়– Positional variant of Phoneme'।[৯] নিম্নে চাঁদপুর জেলার উপভাষার সাতটি স্বরধ্বনিমূলের সহ-ধ্বনি দেখানো হলো :

ই	/i/- উচ্চ-সম্মুখ সংবৃত স্বরধ্বনি	[গড়ই] [gɔroi]→ [টাকি মাছ]
		[গিয়ি] [giyi]→ [গুই সাপ]
এ	/e/ উচ্চ-মধ্য সম্মুখ অর্ধ-সংবৃত	[এগ্গা][egga]→ [একটা]
		[বেচা][beca]→ [বিক্রি করা]
এ্যা	/æ/- নিম্ন-মধ্য সম্মুখ অর্ধ-বিবৃত	[এ্যাক্কালে][ækkale]→ [এক সময়]
		[ধইল্যা][d^hoilæ]→ [এক প্রকার পিঠা]
আ	/a/- ধ্বনিটি নিম্ন-মধ্য বিবৃত	[আবাল][abal]→ [ষাঁড়]
		[হাচা][haca]→ [সত্য]
অ	/ɔ/- নিম্ন-মধ্য পশ্চাৎ অর্ধ-বিবৃত	[অইনো][ɔino]→ [হয়নি]
		[কতা][kɔta]→ [কথা]
ও	/o/- উচ্চ-মধ্য অর্ধ-সংবৃত পশ্চাৎ	[ওজ্জু][ojju]→ [ওজু]
		[আওগ্গ][aoggo]→ [আমাদের]
উ	/u/- উচ্চ-পশ্চাৎ সংবৃত	[উননিশ][unnis]→ [উনিশ]
		[লউর][lɔlur]→ [দৌড়]

উপাত্ত বিশ্লেষণ

'চাঁদপুর জেলার উপভাষা'য় সহধ্বনি ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, রূপমূলের দুটি ক্ষেত্রেই এগুলোর কমবেশি প্রয়োগ হয়ে থাকে। তবে রূপমূলগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে অধিকাংশই চলিত শিষ্ট বাংলার অনুরূপ অর্থ বহন করলেও উচ্চারণ ও বানানের ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত। এক্ষেত্রে কখনো কখনো দেখা গেছে, ব্যঞ্জনধ্বনি স্বরধ্বনিতে পরিণত হচ্ছে, আবার কখনো কখনো স্বরধ্বনি অর্থ ঠিক রেখে ব্যঞ্জনধ্বনিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো চাঁদপুর জেলার উপভাষাকে স্বতন্ত্র ঔপভাষিক মর্যাদা দিয়েছে।

২.১.৪. স্বরসঙ্গতি (Vowel Harmony):

চাঁদপুরের উপভাষায় রূপমূলের তিনটি স্থানে মৌলিক স্বরধ্বনিগুলোর পরিবর্তন হয়ে থাকে। যথা:

২.১.৪.১. রূপমূলের আদিতে
২.১.৪.২. রূপমূলের মাঝে
২.১.৪.৩. রূপমূলের শেষে

২.১.৪.১. আদ্যস্বরের পরিবর্তন: নিম্নরূপে এ উপভাষায় আদ্যস্বরের পরিবর্তন ঘটে থাকে। যথা :

ক. উচ্চ-সংবৃত সম্মুখ /ই/(i) :

চলিত শিষ্ট বাংলায় আদিস্বর উচ্চ-সংবৃত সম্মুখ /ই/(i) ধ্বনি হলে চাঁদপুরের উপভাষায় তা পরিবর্তিত হয়ে নিম্ন-বিবৃত মধ্য /আ/(a) রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যথা :

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
ইশারা[isara]	আশারা[asara]	ই →আ(i-a)

খ. উচ্চ-মধ্য অর্ধ-সংবৃত সম্মুখ /এ/(e):

খ.১. চলিত শিষ্ট বাংলায় আদিস্বর উচ্চ-মধ্য অর্ধ-সংবৃত সম্মুখ /এ/(e) ধ্বনি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এ উপভাষায় উচ্চ-সংবৃত সম্মুখ /ই/(i) রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যথা :

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
এটা[eta]	ইটা[i:ta]	এ →ই(e-i)

খ.২. চলিত শিষ্ট বাংলায় আদিস্বর উচ্চ-মধ্য অর্ধ-সংবৃত সম্মুখ /এ/(e) ধ্বনি অনেক ক্ষেত্রে চাঁদপুরের উপভাষায় নিম্ন-মধ্য অর্ধ-বিবৃত সম্মুখ /এ্যা/(æ) রূপে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। যথা:

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
এরা[era]	এ্যাতারা[ætara]	এ → এ্যা(e-æ)

খ.৩. চলিত শিষ্ট বাংলায় আদিস্বর উচ্চ-মধ্য অর্ধ-সংবৃত সম্মুখ /এ/(e) ধ্বনি কখনো কখনো উপভাষটিতে পরিবর্তিত হয়ে নিম্ন-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /অ/(ɔ) রূপে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। যথা:

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
এখন[ek^{h}ɔn]	অহন[ɔhɔn]	এ →অ(e-ɔ)

খ.৪. চলিত শিষ্ট বাংলায় আদিস্বর উচ্চ-মধ্য অর্ধ-সংবৃত সম্মুখ /এ/(e) ধ্বনি অনেক ক্ষেত্রে চাঁদপুরের উপভাষায় নিম্ন-বিবৃত মধ্য /আ/(a) রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা :

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
এসেছিলে[esec^{h}ile]	আসছিলা[asc^{h}ila]	এ →আ(e-a)

গ. উচ্চ-সংবৃত পশ্চাৎ /উ/(u):

চলিত শিষ্ট বাংলায় উচ্চ-সংবৃত পশ্চাৎ /উ/(u) ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে চাঁদপুরের উপভাষায় উচ্চ-মধ্য অর্ধ-সংবৃত পশ্চাৎ /ও/(o) রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা :

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
উকুন[ukun]	ওয়ুন[oyun]	উ → ও(u-o)

২.১.৪.২. মধ্যস্বরের পরিবর্তন : চাঁদপুরের উপভাষায় নিম্নরূপে মধ্যস্বরের পরিবর্তন ঘটে থাকে। যথা:

ক. নিম্ন-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /অ/(ɔ) স্বরধ্বনি :

ক.১. চলিত শিষ্ট বাংলায় মধ্যস্বর নিম্ন-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /অ/(ɔ) ধ্বনি হলে অনেক সময় পরিবর্তিত হয়ে চাঁদপুরের উপভাষায় উচ্চ-সংবৃত পশ্চাৎ /উ/(u) রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যথা :

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
কপাল[kɔpal]	কুপাল [kup^{h}al]	অ → উ(ɔ-u)
দরজা[drɔja]	দুয়ার [duyar]	

ক.২. চলিত শিষ্ট বাংলায় মধ্যস্বর নিম্ন-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /অ/(ɔ) ধ্বনি অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়ে এ উপভাষায় উচ্চ-মধ্য অর্ধ-সংবৃত পশ্চাৎ /ও/(o) রূপে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। যথা :

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
দেবর [debɔr]	দেওর [deor]	অ → ও(ɔ-o)

ক.৩. চলিত শিষ্ট বাংলায় মধ্যস্বর নিম্ন-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /অ/(ɔ) ধ্বনি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এ উপভাষায় পরিবর্তিত রূপে নিম্ন-বিবৃত মধ্য /আ/(a) রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা:

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
বর্ষা[bɔrsa]	বারসা[barsa]	অ → আ(ɔ-a)

ক.৪. চলিত শিষ্ট বাংলায় মধ্যস্বর নিম্ন-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /অ/(ɔ) ধ্বনি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এ উপভাষায় উচ্চ-সংবৃত সম্মুখ /ই/(i) রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা:

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
করবেন[kɔrben]	কইরেন[kiren]	অ → ই(ɔ-i)
চামচ[camɔc]	চামিচ[camic]	

খ. উচ্চ-সংবৃত পশ্চাৎ /উ/(u):

খ.১. চলিত শিষ্ট বাংলায় মধ্যস্বর উচ্চ-সংবৃত পশ্চাৎ /উ/(u) কোনো-কোনো ক্ষেত্রে চাঁদপুরের উপভাষায় নিম্ন-বিবৃত মধ্য /আ/(a) ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যথা :

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
হাতুড়ী[haturi:]	হামার[hamar]	উ → আ(u-a)

খ.২. চলিত শিষ্ট বাংলায় মধ্যস্বর উচ্চ-সংবৃত পশ্চাৎ /উ/(u) স্বরধ্বনি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এ উপভাষায় নিম্ন-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /অ/(ɔ) রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যথা:

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র

হলুদ [hɔlud]	অলুদ [ɔlud]	উ → অ (u-a)

খ.৩. চলিত শিষ্ট বাংলায় মধ্যস্বর উচ্চ-সংবৃত পশ্চাৎ /উ/(u) থাকলে অনেক ক্ষেত্রেই চাঁদপুরের উপভাষায় উচ্চ-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /ও/(o) রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যথা :

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
সুন্দর [sundor]	সোন্দর [sondor]	উ → ও (u-o)

গ. উচ্চ-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /ও/(o) :

গ.১. চলিত শিষ্ট বাংলায় মধ্যস্বর উচ্চ-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /ও/(o) থাকলে তা পরিবর্তিত হয়ে চাঁদপুরের উপভাষায় নিম্ন-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /অ/(ɔ) ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যথা :

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
কোথায় [kot^{h}ay]	কন [kɔn]	ও → অ (o-ɔ)

গ.২. চলিত শিষ্ট বাংলায় মধ্যস্বর উচ্চ-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /ও/(o) থাকলে তা পরিবর্তিত হয়ে চাঁদপুরের উপভাষায় উচ্চ-সংবৃত পশ্চাৎ /উ/(u) রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা :

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
ধোঁয়া[d^{h}uya]	ধুমা[d^{h}uma]	ও → উ(o-u)

ঘ. উচ্চ-মধ্য অর্ধ-সংবৃত সম্মুখ /এ/(e):

ঘ.১. চলিত শিষ্ট বাংলায় উচ্চ-মধ্য অর্ধ-সংবৃত সম্মুখ /এ/(e) ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে চাঁদপুরের উপভাষায় নিম্ন-বিবৃত মধ্য /আ/(a) রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যথা :

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
টমেটো [tɔmeto]	টমাটো [tɔmato]	এ → আ (e-a)
জিজ্ঞেস [jigges]	জিগাই [jigai]	

ঘ.২. চলিত শিষ্ট বাংলায় মধ্যস্বর উচ্চ-মধ্য অর্ধ-সংবৃত সম্মুখ /এ/(e) ধ্বনি থাকলে পরিবর্তিত হয়ে এ উপভাষায় উচ্চ-সংবৃত সম্মুখ /ই/(i) রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যথা :

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
ভেঙ্গে[b^{h}enge]	ভাঙ্গি[b^{h}aingi]	এ → ই(e-i)

২.১.৪.৩. অন্ত্যস্বরের পরিবর্তন : উপভাষাটিতে নিম্নরূপে অন্ত্যস্বরের পরিবর্তন ঘটে থাকে। যথা:

ক. নিম্ন-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /অ/(ɔ) ধ্বনি:

ক.১. চলিত শিষ্ট বাংলায় অন্ত্যস্বর নিম্ন-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /অ/(ɔ) ধ্বনি থাকলে পরিবর্তিত হয়ে চাঁদপুরের উপভাষায় উচ্চ-সংবৃত সম্মুখ /ই/(i) রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা:

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
বাম [bam]	বাই [bai]	অ → ই (ɔ-i)

ক.২. চলিত শিষ্ট বাংলায় অন্ত্যস্বর নিম্ন-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /অ/(ɔ) ধ্বনি থাকলে পরিবর্তিত হয়ে এ উপভাষায় উচ্চ-সংবৃত পশ্চাৎ /উ/(u) রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা :

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
দিব [dibo]	দিমু [dimu]	অ → উ (ɔ-u)

ক.৩. চলিত শিষ্ট বাংলায় অন্ত্যস্বর নিম্ন-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /অ/(ɔ) ধ্বনি থাকলে পরিবর্তিত হয়ে এ উপভাষায় উচ্চ-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /ও/(o) রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যথা :

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
ভয় [vɔy]	ডরো [dɔro]	অ → ও (ɔ-o)

খ. নিম্ন-বিবৃত মধ্য /আ/:

খ.১. চলিত শিষ্ট বাংলায় অন্ত্যস্বর নিম্ন-বিবৃত মধ্য /আ/(a) ধ্বনি থাকলে অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়ে চাঁদপুরের উপভাষায় উচ্চ-সংবৃত সম্মুখ /ই/(i) রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যথা :

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
ডালা (ঝুড়ি) [dala]	ডালি [dali]	আ → ই(a-i)

খ.২. চলিত শিষ্ট বাংলায় অন্ত্যস্বর নিম্ন-বিবৃত মধ্য /আ/(a) ধ্বনি থাকলে অনেকক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়ে চাঁদপুরের উপভাষায় উচ্চ-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /ও/(o) রূপে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যথা:

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
হয়না [hɔyno]	অয়নো [ɔyno]	আ → ও(a-o)

গ. উচ্চ-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /ও/(o) স্বরধ্বনি :

গ.১. চলিত শিষ্ট বাংলায় অন্ত্যস্বরে উচ্চ-মধ্য অর্ধ-বিবৃত পশ্চাৎ /ও/(o) ধ্বনি থাকলে পরিবর্তিত হয়ে কখনো-কখনো চাঁদপুরের উপভাষায় উচ্চ-সংবৃত পশ্চাৎ /উ/(u) রূপে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যথা:

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
টমেটো [tɔmeto]	টমাটু [tɔmatu]	ও → উ(o-u)

ঘ. উচ্চ-মধ্য অর্ধ-সংবৃত সম্মুখ /এ/(e):

ঘ.১. চলিত শিষ্ট বাংলায় অন্ত্যস্বরে উচ্চ-মধ্য অর্ধ-সংবৃত সম্মুখ /এ/(e) থাকলে অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়ে এ উপভাষায় উচ্চ-সংবৃত সম্মুখ /ই/(i) রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা :

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
দিয়ে[diye]	দিই[dii]	এ → ই(e-i)

ঘ.২. চলিত শিষ্ট বাংলায় অন্ত্যস্বরে উচ্চ-মধ্য অর্ধ-সংবৃত সম্মুখ /এ/(e) থাকলে অনেক সময় পরিবর্তিত হয়ে এ উপভাষায় নিম্ন-বিবৃত মধ্য /আ/(a) রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যথা:

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
নিয়ে[niye]	নিয়া[niya]	এ → আ(e-a)
দিয়ে[diye]	দিয়া[diya]	

ঙ. উচ্চ-সংবৃত সম্মুখ /ই/(i):

ঙ. চলিত শিষ্ট বাংলায় উচ্চ-সংবৃত সম্মুখ /ই/(i) অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হয়ে চাঁদপুরের উপভাষায় নিম্ন-বিবৃত মধ্য /আ/(a) রূপে উচ্চারিত হতে দেখা যায়। যথা:

চলিত শিষ্ট বাংলা	প্রচলিত রূপমূল	পরিবর্তন সূত্র
মুরগি [murg]	মুরগা [murga]	ই →আ (e-a)

উপাত্ত বিশ্লেষণ

'চাঁদপুর জেলার উপভাষা'র ধ্বনিতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য নিরূপণের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, রূপমূলের আদি, মধ্য ও অন্ত্য সকল ক্ষেত্রেই স্বরসঙ্গতির প্রভাব ঘটেছে; একটি স্বরধ্বনি অপর স্বরধ্বনিকে প্রভাবিত করেছে। এই প্রভাবে অনেকক্ষেত্রে পূর্ববর্তী স্বরটি পরিবর্তিত রূপ লাভ করেছে আবার কখনো পরবর্তী স্বরটি পরিবর্তিত হয়েছে। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে উপভাষাগত বৈশিষ্ট্যের কারণেও স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটতে দেখা গেছে। যথা : চাঁদপুর জেলার উপভাষায় /এ/(e) → /অ্যা/(æ), /অ/(ɔ) আবার /উ/(u) → /ও/(o) কিংবা /অ/(ɔ) → /উ//(u) ইত্যাদি রূপে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনগুলো একটি অপরটিকে প্রভাবিত করার ফলে হয়ে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই উপভাষায় প্রাপ্ত রূপমূলগুলোতে প্রগত, পরাগত কিংবা পারস্পরিক স্বরসঙ্গতির বৈশিষ্ট্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদ্যমান রয়েছে।

২.১.৫. স্বরাগম (Vowel Shift)

'স্বরাগম' শব্দটির অর্থ হলো স্বরধ্বনির আগাম ব্যবহার কিংবা আগে স্বরধ্বনি ব্যবহারের প্রবণতা। অন্যভাবে বলা যায়, 'স্বরাগম হলো উচ্চারণের সুবিধার্থে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বে একটি অতিরিক্ত স্বরধ্বনির ব্যবহার।'[১০] ধ্বনির স্থানভেদে শব্দের আদি (initial), মধ্য (medial) ও অন্ত্য (final) সকলক্ষেত্রে এই স্বরাগম ঘটতে পারে। 'শব্দের মধ্যে যে স্থানে স্বরধ্বনিটি এসে যুক্ত হয় সেই

স্থানভেদ অনুসারে স্বরধ্বনির আগমকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– আদি স্বরাগম (vowel prothesis), মধ্য স্বরাগম (anaptyxis) ও অন্ত্য স্বরাগম (cata thesis)।'[১১] বাংলা ভাষার প্রায় প্রতিটি উপভাষায় স্বরাগমের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। যেমন: 'কুমিল্লার উপভাষা'[১২], 'বরেন্দ্রী উপভাষা'[১৩], 'দিনাজপুরের উপভাষা'[১৪] প্রভৃতি। চাঁদপুর জেলার মাঠকর্ম জরিপে দেখা গেছে, এ উপভাষাটিতে সকলক্ষেত্রে স্বরাগমের ব্যবহার রয়েছে।

ক. আদি স্বরাগম (Vowel Prothesis)

চলিত শিষ্ট বাংলা	**উপভাষার রূপমূল**
ক. ছিল[c^hilo]	আছিল[ac^hilo]
সূত্র: ছইল[c^hil]	আছইল[c^hil]
[ব্যস্বব্য]	[স্বব্যস্বব্য]
খ. স্ত্রী [stri]	ইসতিরি[istiri]
সূত্র: সতরই [stri]	ইসতইরই [istiri]
[ব্যব্যব্যস্ব]	[স্বব্যব্যস্বব্যস্ব]
গ. স্পর্ধা [spord^{h}a]	আসপদদা [aspodda]
সূত্র: সপরধআ [sprd^{h}a]	আসপদদআ [aspdda]
[ব্যব্যব্যব্যস্ব]	[স্বব্যব্যব্যব্যস্ব]

খ. মধ্য স্বরাগম (Anaptyxis)

ক. গ্লাস [glas]	গেলাস [gelas]
সূত্র: গলআস [glas]	গএলআস [gelas]
[ব্যব্যস্বব্য]	[ব্যস্বব্যস্বব্য]

গ. অন্ত্য স্বরাগম (Vowel Catathesis)

ক. কিস্ত্ [kist]	কিসতি [kisti]
সূত্র: কইসত [kist]	কইসতই [kisti]
[ব্যস্বব্যব্য]	[ব্যস্বব্যব্যস্ব]

সুতরাং, চাঁদপুরের উপভাষায় রূপমূলের আদি, মধ্য ও অন্ত্য সকলক্ষেত্রে স্বরাগমের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

২.১.৬. স্বরধ্বনিলোপ (Vowel Elision)

প্রমিত বাংলার ন্যায় চাঁদপুর জেলার উপভাষায় স্বরধ্বনির বিলুপ্তি বা স্বরলোপকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা :

ক. আদি স্বরলোপ (Aphensis);

খ. মধ্য স্বরলোপ (Syncope);

গ. অন্ত্য স্বরলোপ (Apocope);

ক. আদি স্বরলোপ (Aphensis) : রূপমূলের আদিতে বা প্রথমে স্বরধ্বনির বিলুপ্তি ঘটলে ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়মে তাকে আদি স্বরলোপ বলা হয়। বাংলা উপভাষাগুলোতে স্বরধ্বনির বিলুপ্তি খুব বেশি পরিলক্ষিত হয় না। চাঁদপুরের উপভাষাতে এই প্রবণতা রূপমূলের আদি, মধ্য ও অন্ত্য সকল ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। যথা :

ক.	চলিত শিষ্ট বাংলা	উপভাষার রূপমূল	স্বরলোপ
	আপত্তি[apotti]	পততি [pɔtti]	আ-স্বরলোপ

খ. মধ্য স্বরলোপ (Syncope):

চলিত শিষ্ট বাংলা	উপভাষার রূপমূল	স্বরলোপ
বোতল[botol]	বতল [bɔtol]	ও- স্বরলোপ
চড়ুই[crui]	চড়ই[cɔrɔi]	উ- স্বরলোপ

গ. অন্ত্য স্বরলোপ (Apocope):

চলিত শিষ্ট বাংলা	উপভাষার রূপমূল	স্বরলোপ
বরই[broi]	বোর [bor]	ই-স্বরলোপ

২.১.৭. অপিনিহিতি (Epenthesis) :

অপিনিহিতি ধ্বনি পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম বা প্রক্রিয়া। ভাষাবিজ্ঞানী মুহাম্মদ আব্দুল হাই[১৫]-এর মতে, বাংলাদেশের প্রায় সকল অঞ্চলেই এই নিয়মের বহুল ব্যবহার রয়েছে। চাঁদপুর জেলার উপভাষায় অপিনিহিতির প্রভাব রয়েছে। যথা :

চলিত শিষ্ট বাংলা	অপিনিহিতি
পড়ি [pori]	পইড়া [pɔira]
করি [kori]	কইরা [kɔira]
বসি [bosi]	বইসা [bɔisa]
রবিবার [robibar]	রইববার [rɔibbar]
বাড়িতে [barite]	বাইত [bait]

২.১.৮. স্বরধ্বনিসমূহের বৈপরীত্যের পরিচয় (ন্যূনতম রূপমূলজোড়- Chained Minimal Pair)

ধ্বনিসমূহের বৈপরীত্য নির্দেশিত হয়ে থাকে একটি ভাষা বা উপভাষার মূলধ্বনির উপস্থিতি থেকে। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা ধ্বনিমূল বিচারের ক্ষেত্রে এ ধারার উল্লেখ করেছেন।[১৬] যথা :

১. স্বরধ্বনির উচ্চতায় বৈপরীত্য, ও

২. জিহ্বা ও ঠোঁটের অবস্থানে বৈপরীত্য।

১. স্বরধ্বনির উচ্চতায় বৈপরীত্য

ক.	/অ/(ɔ)	/আ/(a)
	মধ্যে[mod^{h}d^{h}e]	মাইজে[maije]
	কাতল[katol]	কাতলা[katla]
খ.	/অ/(ɔ)	/উ/(u)
	লবণ[lɔbon]	নুন[nun]
	টক[tɔk]	চুয়া[cuya]
গ.	/অ/(ɔ)	/এ/(e)
	কলা[kɔla]	কেলা[kela]
ঘ.	/ই/(i)	/অ/(ɔ)
	কিছুক্ষণ[kic^{h}uk^{h}ɔn]	কতক্ষণ[kɔtɔkk^{h}n]
ঙ.	/ই/(i)	/এ/(e)
	বিককিরি[bikkiri]	বেচা[beca]
চ.	/এ/(e)	/আ/(a)
	মেরে[mere]	মাইরা[maira]
	জেলে[jele]	জাউল্লা[jaulla]
ছ.	/এ/(e)	/উ/(u)
	ছেলে[c^{h}ele]	হুলা[hula]

২. জিহ্বা ও ঠোঁটের অবস্থানের বৈপরীত্য :

ক.	/আ/(a)	/ও/(o)
	নৌকা[nouka]	নাও[nau]
খ.	/ও/(o)	/আ/(a)

	ভালো[valo]	ভালা[b^hala]
গ.	/ও/(o)	/উ/(u)
	গোসল[gosol]	গুসল[guc^hol]
	শোনা[s^hona]	হুনা[huna]
ঘ.	/ই/(i)	/ও/(o)
	ইঁদুর [idur]	ওদোর[odor]

২.১.৯. স্বরধ্বনির পরিবেশ বন্টন

চাঁদপুর জেলার উপভাষার স্বরধ্বনি বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো নিরূপিত হয়। যথা :

১. প্রমিত বাংলার সাতটি মৌলিক স্বরধ্বনির সবকয়টি এই উপভাষায় রয়েছে; তবে প্রয়োগভেদে স্বতন্ত্র বিদ্যমান; যথা : ইশান [isan] → আশান [asan], এখানে ই [i]র → আ [a]তে রূপান্তরিত হয়েছে। আবার এগুলো [egulo]→ ইজ্জারে [ijjare], এখানে এ[e]→ ই[i]তে পরিবর্তিত হয়েছে। উল্লেখ্য, উপভাষাটির প্রায় সবগুলো মৌলিক স্বরধ্বনির উচ্চারণ বৈচিত্র্য বিদ্যমান। আর এই বৈচিত্র্যগুলো চাঁদপুরের উপভাষাকে স্বকীয় করে তুলেছে।

২. চাঁদপুর জেলার উপভাষায় রূপমূলের আদি, মধ্য ও অন্ত্য সকলক্ষেত্রেই মৌলিক স্বরধ্বনিগুলোর ব্যবহার লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ /অ/(ɔ) ধ্বনির ব্যবহার দেখানো যেতে পারে। যথা : অয় (ɔy)→ (হয়), বাজেকতা (bajekɔta)→ (বাজেকথা), সুযুগ (sujug)→ (সুযোগ)। এখানে অর্থ অভিন্ন হলেও রূপমূলে ব্যবহারের ক্ষেত্রে উচ্চারণ ও বানানে প্রমিত বাংলার পৃথক রূপ পরিলক্ষিত হয়।

৩. উপভাষাটিতে নিয়মিত ও অনিয়মিত দ্বি-স্বরধ্বনি ব্যতীত স্বতন্ত্র কিছু দ্বি-স্বরধ্বনির প্রয়োগ দেখা যায়, যেগুলোকে এই উপভাষার নিজস্ব দ্বি-স্বরধ্বনি বলা যেতে পারে। যথা :

ক. ই – আ (i-a); খ. আ – আ (a-a); গ. অ – ই (ɔ-i) ইত্যাদি। উল্লিখিত দ্বিস্বরধ্বনিগুলোর প্রয়োগ চাঁদপুর জেলার উপভাষার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য।

৪. উপভাষাটিতে সহধ্বনির ক্ষেত্রেও প্রমিত বাংলার অনুরূপ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এখানে মৌলিক স্বরধ্বনিগুলোর প্রতিটিরই দুটি করে সহধ্বনি রূপমূলের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়ে থাকে। তবে সেখানে অর্থে অভিন্নতা সত্ত্বেও উচ্চারণ ও বানানের ক্ষেত্রে ভিন্নতা লক্ষণীয় যথা : /আ/(a) - দুটি সহধ্বনি : আঁতুর [atur] → আতোর[ator], কতা [kɔta] → কথা [kɔt^ha]

৫. চাঁদপুর জেলার উপভাষায় স্বরসঙ্গতির প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উপভাষাটিতে রূপমূলের আদি, মধ্য ও অন্ত্য সকলক্ষেত্রেই একটি স্বরধ্বনি অন্য স্বরধ্বনিকে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত

করছে। যথা: ইশারা[isara] → আশারা[asara], এখানে পরবর্তী স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে প্রভাবিত করে পরিবর্তন করেছে। আবার পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির পরবর্তী স্বরধ্বনিকে পরিবর্তন করতেও দেখা যায়; যথা : ডালা[dala]→ ডালি[dali] ইত্যাদি।

৬. উপভাষাটিতে রূপমূলের আদি, মধ্য ও অন্ত্য সকলক্ষেত্রে স্বরাগম-এর প্রয়োগ দেখা যায়। তবে রূপমূলের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বরাগমের ব্যবহার প্রমিত বাংলা থেকে উপভাষাটিকে স্বতন্ত্র করেছে। উদাহরণের সাহায্যে পরিবর্তনগুলো দেখানো হলো; যথা : স্পর্ধা [spord^{h}a]→ আসপদদা [aspodda], ক্লাস [klas]→কিলাস [kilas], বেঞ্চ [benc]→বেঞ্চি[benci] ইত্যাদি।

২.২. ব্যঞ্জনধ্বনি

২.২.১. ব্যঞ্জনধ্বনির অবস্থান : চাঁদপুর জেলার ভাষায় প্রচলিত ব্যঞ্জনধ্বনির তালিকা :

	ওষ্ঠ্য	দন্ত্য	দন্তমূলীয় মূর্ধন্য	পশ্চাৎ দন্তমূলীয়	দন্তমূলীয়	প্রশস্ত দন্তমূলীয় তালব্য	জিহ্বামূলীয়	কণ্ঠমূলীয়
স্পৃষ্টধ্বনি অঘোষ অল্পপ্রাণ	প (p^{hh}_{h})	ত(t)	ট(t)			চ(c)	ক (k)	
স্পৃষ্টধ্বনি অঘোষ মহাপ্রাণ	ফ (p^{hh}_{hh})	থ(t^{h})	ঠ(t^{h})			ছ(c^{h})	খ(k^{h})	
স্পৃষ্টধ্বনি ঘোষ অল্পপ্রাণ	ব(b)	দ(d)	ড(d)			জ(j)	গ(g)	
স্পৃষ্টধ্বনি ঘোষ মহাপ্রাণ	ভ (b^{h})	ধ (d^{h})	ঢ(d^{h})				ঘ(g^{h})	
নাসিক্য ঘোষ ধ্বনি	ম (m)	ন (n)					ঙ(n)	
শিষধ্বনি অঘোষ অল্পপ্রাণ				শ(s^{h})	স(s)			
শিষধ্বনি ঘোষ				য়(ý)				

অল্পপ্রাণ								
শিষধ্বনি ঘোষ মহাপ্রাণ								হ(h)
পার্শ্বিক ঘোষ মহাপ্রাণ				ল(l)				
কম্পনজাত ঘোষ অল্পপ্রাণ				র(r)				
তাড়নজাত ঘোষ অল্পপ্রাণ				ড়(r)				

ছক ৩: ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ স্থান

চাঁদপুর জেলার উপভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দেখা যায়, রূপমূলের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধ্বনিগুলো সমানভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে উপভাষাটিতে বেশকিছু ধ্বনির অনুপস্থিতিও লক্ষণীয়। পরিবর্তিত ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যবহার উদাহরণের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হলো : নাসিক্যধ্বনি /ঞ/(n)/,ণ/(n)-এর ব্যবহার উপভাষাটির রূপমূলে লক্ষণীয় নয়। সেক্ষেত্রে পরিবর্তিত ধ্বনি হলো: /ঞ/(n)-/য়/(y)→ মিঞা [mina] → মিয়া [miya], /ণ/(n)- /ন/(n)→ শ্রাবণ[s^hrabon] →শাওন[s^haon]।

এছাড়াও উষ্মধ্বনির ক্ষেত্রে /শ/(s^h), /স/(s) ব্যবহার থাকলেও /ষ/(s) ধ্বনিটির অনুপস্থিতি রয়েছে। যথা : পৌষ → পইশ[pɔis^h], এছাড়াও /স/(s) ধ্বনিটি /ছ/(c^h) ধ্বনিতে পরিবর্তিত হতেও দেখা গেছে; যথা: সালাম [salam]→ছালাম [c^halam]। এ উপভাষায় /ঢ়/(r) ধ্বনিটি /ড়/(r) তে পরিবর্তিত হতে দেখা যায়; যথা : আষাঢ় [asar]→আশাড়[as^{h}ar]। প্রমিত কথ্য বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে উল্লিখিত পার্থক্যগুলো ছাড়া সকলক্ষেত্রে অভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

২.২.২. ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যবহার : চাঁদপুরের উপভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যবহার প্রমিত কথ্য বাংলা থেকে স্বতন্ত্র।

নিম্নে এ উপভাষার ব্যঞ্জনধ্বনির অবস্থানগত বিবরণ প্রদত্ত হলো :

অঘোষ অল্পপ্রাণ জিহ্বামূলীয় স্পৃষ্ট /ক/(k):

আদিতে মধ্যে শেষে

কতা[kɔta] (কথা) এ্যাককানে [ækkane](এক জায়গায়) চারকি [carki](চাকরি)

কইরতো[koirto] (করতাম) পুস্কুনি[puskuni] (পুকুর) মিরকা[mirka] (মৃগেল)

কইরা[koira] (করে) পাইঙকাস[paiŋkas] (পাঙ্গাস) মুক[muk] (মুখ)কাডে[kade] (কাটে)

হাক [hak](শাক)

উপাত্ত বিশ্লেষণ : রূপমূলের আদি, মধ্য, অন্ত্য সকলক্ষেত্রে অঘোষ অল্পপ্রাণ জিহ্বামূলীয় স্পৃষ্ট /ক/(k) চলিত শিষ্ট বাংলার ন্যায় চাঁদপুর জেলার উপভাষায় ব্যবহৃত হয়।

অঘোষ মহাপ্রাণ জিহ্বামূলীয় স্পৃষ্ট /খ/(k^h):

আদিতে	মধ্যে	শেষে
খেল[k^hela] (খেয়াল)	রাইখেন [raik^{h}en](রাখেন)	খাবাইয়া[k^habaiya] (খাওয়া)

উপাত্ত বিশ্লেষণ : এ উপভাষায় রূপমূলের শুরুতে ও মাঝে /এ/(e), /আ/(a) যুক্ত অঘোষ মহাপ্রাণ জিহ্বামূলীয় স্পৃষ্ট /খ/(k^h) ধ্বনি চলিত শিষ্ট বাংলার অনুরূপ ব্যবহৃত হলেও রূপমূলের শেষে এর প্রয়োগ দেখা যায় না। এক্ষেত্রে উপভাষাটি অল্পপ্রাণ ধ্বনির বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছে।

অল্পপ্রাণ ঘোষ স্পৃষ্ট জিহ্বামূলীয় /গ/(g)

আদিতে	মধ্যে	শেষে
গিরস্তি[girsti] (গৃহস্থ)	সাইরগা[sairga] (সরে গেছে)	লগে[lɔge] (সাথে)
গর [gɔr](ঘর)	মইরগা [mɔirga](মারা যাওয়া)	আওগ্গ[aoggɔ] (আমাদের)
গাচ[gac] (গাছ)		বাগগা[bagga] (ছাটাই করা)

উপাত্ত বিশ্লেষণ : এ উপভাষায় রূপমূলের আদি, মধ্য ও অন্ত্যে অবস্থিত /ই/(i), /আ/(a), /অ/(ɔ), /এ/(e) যুক্ত অল্পপ্রাণ ঘোষ স্পৃষ্ট জিহ্বামূলীয় /গ/(g) চলিত শিষ্ট ভাষার অনুরূপ হয়ে থাকে।

মহাপ্রাণ ঘোষ প্রশস্ত দন্তমূলীয় স্পৃষ্ট /ঘ/(g^h):

আদিতে	মধ্যে	শেষে
ঘুরাইয়া[g^huraiya] (ঘুরিয়ে)	রসিঘর[rɔsig^{h}ɔr] (রান্নাঘর)	x
ঘনকথা[g^hɔnɔkotha] (বেশি কথা)		

উপাত্ত বিশ্লেষণ : চাঁদপুর জেলার উপভাষায় রূপমূলের শুরুতে ও মধ্যে /উ/(u), /অ/(ɔ)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত মহাপ্রাণ ঘোষ প্রশস্ত দন্তমূলীয় স্পৃষ্ট /ঘ/(g^h) চলিত শিষ্টের ন্যায় ব্যবহৃত হয়।

তবে এ উপভাষায় রূপমূলের শেষে /ঘ/(g^h) ধ্বনির ব্যবহার নেই। এখানে উপভাষাটিতে অল্পপ্রাণতার বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

অল্পপ্রাণ অঘোষ প্রশস্ত দন্তমূলীয় স্পৃষ্ট /চ/(c):

আদিতে	মধ্যে	শেষে
চাচতো [cacato](চাচাতো)	কাচকি [kacki](মলা মাছ)	বেচে[bece](বিক্রি করে)
চাইর [cair](চার)	ধানচালঅইন [d^hancalɔin](ধান চালনি)	মাচ[mac] (মাছ)
চাইল [cail](চাল)	চামিচ[camic] (চামচ)	
চুয়া [cuya](টক)	এলিচা[elica](হেলেঞ্চা)	

উপাত্ত বিশ্লেষণ : চাঁদপুর জেলার উপভাষায় রূপমূলের শুরুতে ব্যবহৃত অল্পপ্রাণ অঘোষ প্রশস্ত দন্তমূলীয় স্পৃষ্ট /চ/(c) চলিত শিষ্টের অনুরূপ উচ্চারিত হলেও মাঝে /চ/(c) ধ্বনির উচ্চারণ ক্ষীণ হয়ে যায়। এটি উপভাষাটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

মহাপ্রাণ অঘোষ প্রশস্ত দন্তমূলীয় স্পৃষ্ট /ছ/(c^h):

আদিতে	মধ্যে	শেষে
ছালুন[c^halun] (তরকারি)	আছিল[ac^hil] (ছিল)	মুইছা[$muic^h$a] (মুছে)
ছাতিম[c^hatim](টাকি)	গেছিগা[gec^higa](গেছে)	কইচ্ছে[kɔicc^he] (করেছে)
গুছলাঘর[guc^hlag^hɔr](গোয়াল ঘর)	অইছে [ɔic^he](হয়েছে)	
কছুয়[kɔc^huy] (কচুয়া)	মিছা[mic^ha] (মিথ্যা)	

উপাত্ত বিশ্লেষণ : এ উপভাষায় রূপমূলের আদি, মধ্য ও অন্ত্যে অবস্থিত /ছ/(c^h)ধ্বনি /আ/(a), /ই/(i), /এ/(e)-এর সাথে সংযুক্ত অবস্থায় চলিত শিষ্ট বাংলার ন্যায় উচ্চারিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উপভাষাটিতে মহাপ্রাণতার লক্ষণ দেখা যায়।

অল্পপ্রাণ ঘোষ স্পৃষ্ট প্রশস্ত দন্তমূলীয় /জ/(j):

আদিতে	মধ্যে	শেষে
জলপই [jɔlpoi](জলপাই)	বাজান[bajan] (বাবা)	হাজা[haja] (সম্মিলিত)
জরম [jɔrom](জন্ম)	বুইজ্জেন্নি [buijjenni](বুঝেছেন)	কাদিজা[kadija] (খাদিজা)
জাগুর [jagur](মাগুর)	মেজেজানি[mejejani](মেজবানি)	
জাগা [jaga](জায়গা)		

উপাত্ত বিশ্লেষণ : উপভাষাটির /জ/(j) ধ্বনি /আ/(a), /অ/(ɔ), /উ/(u), /এ/(e)-ইত্যাদির সাথে যুক্ত অবস্থায় চলিত শিষ্ট বাংলার অনুরূপ ব্যবহৃত হয়।

মহাপ্রাণ ঘোষ স্পৃষ্ট প্রশস্ত দন্তমূলীয় /ঝ/(j^h):

আদিতে	মধ্যে	শেষে
ঝি [j^hi](মেয়ে)	X	মাইঝে [maij^{h}e] (মধ্যে)

উপাত্ত বিশ্লেষণ : এ উপভাষায় /ঝ/(j^h) ধ্বনিটি কেবল রূপমূলের শুরুতে চলিত শিষ্টের অনুরূপ ব্যবহৃত হয়, মাঝে ও শেষে পরিলক্ষিত হয় না। এক্ষেত্রে উপভাষাটিতে অল্পপ্রাণতার লক্ষণ পরিদৃষ্ট।

অল্পপ্রাণ অঘোষ দন্তমূলীয় মূর্ধন্য স্পৃষ্ট /ট/(t):

আদিতে	মধ্যে	শেষে
টিকেট[tiket] (ক্রিকেট)	লেপটিন [leptin](টয়লেট)	ডাট[dat] (মজবুত)
টাইন্না [tainna](টেনে)	রাতটারি [rattari](রাতের বেলা)	ফাট [p^{h}at](পাট)
টেয়া[teya] (টাকা)		হেটা [heta](সেটি)

উপাত্ত বিশ্লেষণ : চাঁদপুর জেলার উপভাষায় রূপমূলের সকলক্ষেত্রে /ই/(i), /আ/(a), /এ/(e), /অ/(ɔ)-এর সাথে যুক্ত /ট/(t)ধ্বনিটি চলিত শিষ্ট বাংলার মতোই উচ্চারিত হয়ে থাকে।

মহাপ্রাণ অঘোষ দন্তমূলীয় মূর্ধন্য স্পৃষ্ট /ঠ/(t^h):

আদিতে	মধ্যে	শেষে
ঠিকি [t^hiki](সঠিক)	X	পিঠা[pit^{h}a] (পিঠা)

উপাত্ত বিশ্লেষণ : এ উপভাষায় রূপমূলের শুরুতে ও শেষে /ঠ/(t^h) চলিত বাংলা ভাষার অনুরূপ উচ্চারিত হয়ে থাকে। তবে মাঝের /ঠ/(t^h)-এর উচ্চারণ হ্রস্ব হওয়ায় ধ্বনিটি মহাপ্রাণতা হারায়।

অল্পপ্রাণ ঘোষ স্পৃষ্ট ধ্বনি /ড/(d):

আদিতে	মধ্যে	শেষে
ডুল্লার [dullar](লাল)	কাডুল[kadul] (কাঠাল)	আণ্ডা [anda](আমরা)
ডুম্বুর [dumbur](ডুমুর)	আডুইন্না [aduinna](হাঁটা)	ভেন্‌ডি [vendi](ঢেঁড়শ)
ডিয়া[diya] (বাছুর)	হিডানো[hidano] (পিটানো)	বেডি [bedi](মহিলা)

উপাত্ত বিশ্লেষণ : এ উপভাষায় রূপমূলের আদিতে ও শেষে /ড/(d) ধ্বনির উচ্চারণ অপরিবর্তিত থাকলেও মাঝে /ড/(d) উচ্চারণ সংক্ষিপ্ত শোনা যায়।

অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পৃষ্ট ধ্বনি /ত/(t):

আদিতে	মধ্যে	শেষে
তোগো[togo] (তাদের)	হেতারা [hetara](তারা)	কিতা[kita] (কি)

ত্যাল[tæl](তেলাপিয়া) হাইতান [haitan](পাবে) কইতে [kɔite](বলতে)

তুয়ান [tuyan](তুফান বতল[bɔtol](বোতল) রুইত[ruit] (রুই মাছ)

উপাত্ত বিশ্লেষণ : চাঁদপুর জেলার উপভাষায় ব্যবহৃত /ত/(t) ধ্বনিটি রূপমূলের সকলক্ষেত্রে চলিত বাংলার অনুরূপ হয়ে থাকে।

অল্পপ্রাণ ঘোষ স্পৃষ্ট ধ্বনি /দ/(d):

আদিতে	মধ্যে	শেষে
দজি[doji](খুন্তি)	বদিল্লা[bɔdilla] (বদলা)	চান্দ [candɔ](চাঁদ)
দুয়া [duya](দোয়া)		

উপাত্ত বিশ্লেষণ : এ উপাভাষায় ব্যবহৃত /দ/(d) ধ্বনিটি রূপমূলের সকলক্ষেত্রে চলিত ভাষার অনুরূপ।

মহাপ্রাণ ঘোষ স্পৃষ্ট ধ্বনি /ধ/(d^h):

আদিতে	মধ্যে	শেষে
ধইন্না [d^hɔinna](ধনেপাতা)	x	x
ধইরা [d^hɔira](ধরে)		

উপাত্ত বিশ্লেষণ : এ উপভাষায় ব্যবহৃত /ধ/(d^h) ধ্বনিটি রূপমূলের শুরুতে ব্যবহৃত হলেও মাঝে, শেষে বিলুপ্ত কিংবা পরিবর্তিতরূপে প্রয়োগ হয়। এখানে উপভাষাটিতে অল্পপ্রাণতার প্রভাব পরিলক্ষিত।

অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পৃষ্ট ওষ্ঠ্য ধ্বনি /প/(p):

আদিতে	মধ্যে	শেষে
পাতাকফি [patakɔp^hi](বাঁধাকপি)	হাকপান [hakpan](পাশন)	হাপ্পা [happa](পেঁপে)
পাকঘর[pakg^hɔr] (রান্নাঘর)	পাত্তিসাপটা[pattisapta](পাটিশাপটা)	হাপ [hap](সাপ)
পুষ্কনি [puskɔni](পুকুর)		
পালা[pala] (পিলার)		

উপাত্ত বিশ্লেষণ : এ উপভাষার অনেকক্ষেত্রে /প/(p) ধ্বনিটি চলিত শিষ্ট বাংলার অনুরূপ উচ্চারিত হয়।

মহাপ্রাণ অঘোষ স্পৃষ্ট ওষ্ঠ্য ধ্বনি /ফ/(p^h):

আদিতে	মধ্যে	শেষে
ফাট [p^hat](পাট)	বাফের[bap^{h}er] (বাপের)	কফি[kɔp^{h}i] (কপি)

ফরাগ [p^hɔrag](পাঞ্জাবি) কাফড় [kap^{h}or](কাপড়)

উপাত্ত বিশ্লেষণ : উপভাষাটিতে ব্যবহৃত /ফ/(p^h) ধ্বনিটি রূপমূলের আদি, মধ্য, অন্ত্য সকলক্ষেত্রে /প/(p) রূপে পরিবর্তিত হয়। উল্লেখ্য, উপভাষাটিতে /প/(p) ধ্বনির স্থলে /প/(p) ব্যবহৃত হওয়ার পাশাপাশি /ফ/(p^h) ব্যবহারের প্রবণতাও পরিলক্ষিত হয়। এই উপভাষায় মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রভাবের সূত্রটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পৃষ্ট ওষ্ঠ্য ধ্বনি /ব/(b):

আদিতে	মধ্যে	শেষে
বত [bɔt](ভাত)	হবরে [hɔbore](তাড়াতড়ি)	জিব[ji:b](জিহ্বা)
বেয়ান [beyan](সকাল)	ডেরাইবার [deraibar](ড্রাইভার)	হিবা [hiba](গরুর খাবার পাত্র)
বাইয়ুন [baiyun](বেগুন)	হাবুল[hablu] (পেঁপে)	পাইনজাবি [painjabi](পাঞ্জাবি)
ব্যাকে[bæke] (সবাই)	তবন[tɔbɔn] (লুঙ্গি)	
বালা [bala](ভালো)		

উপাত্ত বিশ্লেষণ : উপভাষাটিতে রূপমূলের সকলক্ষেত্রে /ব/(b) ধ্বনির ব্যবহার চলিত শিষ্ট বাংলার ন্যায় হয়ে থাকে।

অল্পপ্রাণ নাসিক্য ঘোষ ওষ্ঠ্য ধ্বনি /ম/(m):

আদিতে	মধ্যে	শেষে
মাগ [mag](মাঘ)	কুমোড় [kumor](কুমড়া)	ছালম[c^halɔm] (তরকারি)
মেগনি [megni](মেহগনি)	হামুক [hamuk](শামুক)	উরুম [urum](মুড়ি)
মৌ [mu](ঝোল)	আমাগো [amago](আমাদের)	হারুম [harum](পারব)

উপাত্ত বিশ্লেষণ : এ উপভাষার রূপমূলের প্রতিটি ক্ষেত্রে /ম/(m) ধ্বনির ব্যবহার চলিত শিষ্ট বাংলার অনুরূপ।

অল্পপ্রাণ কম্পনজাত দন্তমূলীয় /র/(r):

আদিতে	মধ্যে	শেষে
রাইত [rait] (রাত)	মুরকা[murka] (মুরগী)	হুরি [huri](শুটকি)
রাখি [rak^{h}i](রেখে)	কুরমা [kurma](কুমড়া)	ডুম্বুর [dumbur](ডুমুর)

উপাত্ত বিশ্লেষণ : এ উপভাষায় রূপমূলের শুরুতে ও শেষে /র/(r)-এর উচ্চারণ চলিত শিষ্টের ন্যায় হলেও মাঝের উচ্চারণ হ্রস্ব হয়।

পার্শ্বিক ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্ত্যধ্বনি /ল/(l):

আদিতে	মধ্যে	শেষে

লামানো [lamano](নামানো)	ছালুন [c^{h}alun](তরকারি)	হেলা[hela] (খেলা)
লাইল [lail](আইল)	হালং [haln](পালং)	কেলা[kela] (কলা)
লেপটিন [leptin](টয়লেট)	হগল [hɔgol](সকল)	ডাইল [dail](ডাল)

উপাত্ত বিশ্লেষণ : উপভাষাটিতে রূপমূলের সকলক্ষেত্রেই /ল/(l) ধ্বনির প্রয়োগ থাকলেও মাঝে /ল/(l) ধ্বনিটি ক্ষীণভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে। আবার কখনো কখনো /ল/(l) ধ্বনি /ন/(n) রূপেও উচ্চারিত হয়।

ঘোষ নাসিক্য দন্তধ্বনি /ন/(n):

আদিতে	মধ্যে	শেষে
নুন [nun](লবন)	আনছত [anc^{h}ɔt](এনেছিস)	হেন [hen](ভাতের মাড়)
নাঠা[nat^{h}a] (চতুর)	ঘনকতা[g^{h}ɔokɔt^{h}a] (বেশি কথা)	কেন্নে [kenne](কীভাবে)

উপাত্ত বিশ্লেষণ : এ উপভাষায় রূপমূলের প্রথমে ও শেষে অবস্থিত /ন/(n) ধ্বনির উচ্চারণ চলিত শিষ্ট বাংলার ন্যায়। তবে মাঝে অবস্থিত /ন/(n)-এর উচ্চারণ সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। আবার /ন/(n) ধ্বনি অনেক সময় এ উপভাষায় /ল/(l) রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে।

২.২.৩. অল্পপ্রাণ ধ্বনি :

প্রমিত বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিসমূহের অন্যতম অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হলো অল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতা; যা উপভাষাগুলোর ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। তবে চাঁদপুরের উপভাষায় মহাপ্রাণ ধ্বনির পাশাপাশি অল্পপ্রাণ ধ্বনির প্রভাব পরিলক্ষিত। উপভাষাটিতে রূপমূলের আদি, মধ্য, অন্ত্য সকলক্ষেত্রেই এই অল্পপ্রাণতার বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। যথা :

রূপমূলের আদিতে :

চলিত শিষ্ট বাংলা	উপভাষার রূপমূল
ফাল[p^{h}al]	পাল[pal]
ফালা[p^{h}ala]	পালা[pala]
ঘড়ি [g^{h}ori]	গড়ি[gori]
ছেলে[c^{h}ele]	হোলা[hola]
খালি [k^{h}ali]	কালি[kali]
ফাগুন [p^{h}aun]	হাগুন[hagun]
কাছের মানুষ [kac^{h}er manus]	কাচের মানুষ[kacer manus]
পিঠা[pit^{h}a]	পিডা[pida]
কাছে [kac^{h}e]	কাচে[kace]

মেরেছে [merec^{h}e]	মাইচ্চে[maicce]
শিক্ষা [sikk^{h}a]	হিক্কা[hikka]

২.২.৪. ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবেশ বণ্টন

১. বাংলা বর্ণমালার প্রায় সবগুলো ব্যঞ্জনধ্বনি চাঁদপুর জেলার উপভাষায় পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। তবে /ড়/(r) কখনো কখনো /র/(r) রূপে উচ্চারিত হয়। এছাড়া /ঢ়/(r)-এর স্থলে /ড়/(r)-এর প্রয়োগ ঘটে। যথা: আষাঢ় (asar) → আষাড় (asar) ইত্যাদি।

২. উপভাষাটিতে /ঝ/(j^{h}), /ঠ/(t^{h}) ও /ধ/(d^{h}) রূপমূলের শুরুতে অপরিবর্তিত থাকলেও মধ্যে, শেষে মহাপ্রাণতা লোপ পেতে দেখা যায়। সেক্ষেত্রে চাঁদপুরের উপভাষায় রূপমূলের মাঝে ও শেষে /ঝ/(j^{h}), /ঠ/(t^{h}) ও /ধ/(d^{h}) ধ্বনিগুলো মহাপ্রাণতা হারায়।

৩. এ উপভাষায় /প/(p) ব্যঞ্জনধ্বনি রূপমূলে প্রয়োগকালে অনেকক্ষেত্রে /ফ/(p^{h}) রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবার কখনো /ফ/(p^{h}) → /প/(p) রূপেও পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। যথা : পাতা(pata)→ ফাতা (p^{h}ata), ফাল(p^{h}al) → পাল (pal)।

৪. জেলাটিতে /হ/(h) ধ্বনিটি রূপমূলে ব্যবহারের ক্ষেত্রে /য়/(y) আবার কখনো /অ/(ɔ) রূপে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য রূপমূলের শুরুতে /হ/(h) থাকলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে /অ/(ɔ) হয়; যথা: হাঁস (has) → আঁস (as) এবং মধ্যে অবস্থিত /হ/(h), /য়/(y) রূপে পরিবর্তিত হয়ে থাকে; যথা: বেহাল (behal) → বেয়াল (beyal)।

৫. 'চাঁদপুর জেলার উপভাষা'য় ব্যবহৃত /ল/(l) ও /ন/(n) ধ্বনি দুটি রূপমূলে প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেকসময় পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে থাকে। যথা: /ল/(l) → /ন/(n) তে রূপান্তরিত হয়। আবার কখনো /ন/(n) → /ল/(l) তে পরিবর্তিত হয়। যথা: লবন (lɔbɔn) → নুন (nun), নল (nɔl) → লল(lɔl)।

৬. এই উপভাষাটিতে অল্পপ্রাণ ধ্বনির আধিক্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। যথা : ঘড়ি (g^{h}ori) →গড়ি (gɔri)। তবে অনেকসময় মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রয়োগও লক্ষণীয়। যথা : পতাকা (pɔtaka) → ফতাকা (p^{h}ɔtaka)

৭. চাঁদপুর জেলার উপভাষায় সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি ভেঙে উচ্চারিত হয় আবার কখনো কখনো সংযুক্ত অবস্থায়ও উচ্চারিত হতে দেখা যায়; যথা: ভেঙ্গে (b^{h}enge) → ভাঙ্গি (b^{h}angi)। এ উপভাষাটিতে সংযুক্ত বর্ণের সরলীকরণ হতেও দেখা যায়; যথা: কৃপণ (kripɔn) → কিপটা(kipta)।

৮. শিষধ্বনি /শ/(s^{h}), /ষ/(s), /স/(s)-এর ক্ষেত্রে উপভাষাটির উচ্চারণে কেবল /শ/(s^{h}) ও /স/(s) ধ্বনির ব্যবহার হয়ে থাকে। এ উপভাষায় /ষ/(s) ধ্বনিটিকে স্বতন্ত্ররূপে ব্যবহার করতে দেখা যায় না।

৩. প্রাপ্ত ফলাফল

আলোচ্য গবেষণা থেকে প্রাপ্ত চাঁদপুর জেলার উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য নিম্নরূপ :

ক. 'চাঁদপুর জেলার উপভাষা'য় প্রমিত বাংলার সকল মৌলিক স্বরধ্বনির ব্যবহার রয়েছে, তবে প্রয়োগভেদে স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। যথা : প্রমিত কথ্য বাংলার /অ/(ɔ) স্বরধ্বনি /উ/(u), /ও/(o), /আ/(a) রূপে আবার কখনো /এ/(e) স্বরধ্বনি /এ্যা/(æ), /ও/(o), /আ/(a) রূপে উচ্চারিত হতে দেখা গেছে। এছাড়াও প্রায় প্রতিটি মৌলিক স্বরধ্বনির স্বতন্ত্র প্রয়োগ উপভাষাটিতে পরিলক্ষিত হয়েছে। যথা : কসাই →কুসাই(kusai), এসেছি → আসছি(asc^hi) ইত্যাদি।

খ. 'চাঁদপুর জেলার উপভাষা'য় প্রমিত কথ্য বাংলার ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো বিদ্যমান রয়েছে, কেবল /ঢ়/(r) ধ্বনিটি /ড়/(r) আবার কোথা-কোথা /র/(r) রূপে উচ্চারিত হতে দেখা গেছে। এছাড়াও নাসিক্যধ্বনি ও উষ্মধ্বনির সবগুলো এ উপভাষায় লক্ষণীয় নয়।

গ. এ উপভাষায় প্রমিত কথ্য বাংলার দ্বিস্বরধ্বনি ও সহধ্বনি ছাড়াও স্বরসঙ্গতি, স্বরাগম, ধ্বনিলোপ, অপিনিহিতি ইত্যাদির প্রভাব পরিলক্ষিত। এগুলো বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 'বাঙালি উপভাষা'র অন্তর্গত 'ঢাকাই উপভাষা'[১৭] ও 'কুমিল্লার উপভাষা'র[১৮] সাথে সাদৃশ্য দেখা গেছে।

ঘ. চাঁদপুর জেলার উপভাষায় অল্পপ্রাণ ধ্বনির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। এক্ষেত্রে 'বাঙালি উপভাষা'র অন্তর্ভুক্ত 'কুমিল্লার উপভাষা'[১৯]তে মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রভাব থাকায় বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়। আবার 'গৌড়ীয় উপভাষা'[২০] ও 'পাবনার উপভাষা'[২১] সাথে সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

ঙ. চাঁদপুর জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের উপভাষায়, একটি রূপমূল উপজেলাভেদে ভিন্ন-ভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হয়েছে; অর্থাৎ অর্থ অভিন্ন হলেও রূপমূলের ক্ষেত্রে অনেক সময় স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত। মূল গবেষণায় এই সকল রূপমূলের স্বাতন্ত্র্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যথা : 'বাছুর' রূপমূলটিকে চাঁদপুর জেলার তিনটি উপজেলায় স্বতন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে।

'চাঁদপুর জেলার উপভাষা: ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ' শিরোনামের গবেষণাটি চাঁদপুরের ঐতিহাসিক অবস্থান নির্ধারণ ও নিজস্ব শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে ধারণা করা যায়।

৪. উপসংহার

সবশেষে পূর্ববর্তী গবেষকবৃন্দের পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং মাঠকর্ম থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, চলিত শিষ্ট বাংলার মৌলিক স্বরধ্বনি সাতটি চাঁদপুর জেলার উপভাষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে এদের মধ্যে /আ/(a), /এ/(e), /উ/(u)-এর অধিক ব্যবহার উপভাষাটিতে লক্ষণীয় এবং /অ/(ɔ) এর ব্যবহার স্বল্প। এছাড়াও প্রমিত বাংলার উনচল্লিশটি ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে ত্রিশটির ব্যবহার উপভাষাটিতে দেখা যায়। এই ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো রূপমূলের আদি, মধ্য ও অন্ত্য সকলক্ষেত্রে সমানভাবে ব্যবহার হয় না, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। রূপমূলের শুরুতে কিছু ধ্বনি ব্যবহৃত হলেও মধ্য, অন্ত্যে ব্যবহার হয় না কিংবা পরিবর্তিত রূপ

ধারণ করে। আবার কিছু ক্ষেত্রে রূপমূলের প্রথমে ও শেষে প্রমিত বাংলার অনুরূপ ব্যবহার দেখা গেলেও মাঝে উচ্চারণ বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়; অর্থাৎ মাঝে ধ্বনিটির হ্রস্ব উচ্চারণ হয়। এছাড়াও উপভাষাটিতে মহাপ্রাণ ধ্বনির পাশাপাশি অল্পপ্রাণ ধ্বনির প্রভাব লক্ষণীয়। তবে রূপমূলে ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক ধ্বনিই মহাপ্রাণতা হারিয়েছে। উপভাষাটিতে সমীভবনের প্রভাব পরিলক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি ধ্বনি বিপর্যয়ের লক্ষণও পরিদৃষ্ট হয়। সর্বোপরি বলা যায়, প্রমিত বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য ধারণ সত্ত্বেও উপভাষাটির ধ্বনিতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকত্ব বিদ্যমান, যা উপভাষাটিকে চট্টগ্রাম বিভাগের অপরাপর জেলা থেকে স্বতন্ত্র মৌলিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ভাষা হিসেবে প্রতীয়মান করে তুলেছে।

তথ্যনির্দেশ

১ সুকুমার সেন, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, কলকাতা: ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ১৯৭১, পৃ. ১৭৬
২ শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা চাঁদপুর*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৪, পৃ.৩১
৩ আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ.১৫৫
৪ মুহম্মদ আবদুল হাই, *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব*, ঢাকা: বর্ণ মিছিল, ১৯৭৫, পৃ. ১৩
৫ মুহম্মদ আবদুল হাই, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪
৬ আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ.২৩০
৭ আবদুর রহীম খোন্দকার, 'গৌড়ীয় উপভাষা', *সাহিত্যিকী*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যা: শরৎ-বসন্ত, ১৮শ বর্ষ, ১৩৮৮, পৃ. ১৬৭
৮ মুহম্মদ আবদুল হাই, 'ঢাকাই উপভাষা', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, *সাহিত্য পত্রিকা*, সংখ্যা: প্রথম, হীরক জয়ন্তী, পঞ্চবিংশ বর্ষ, ১৩৮৮, পৃ. ২৪৭
৯ শ্যামল কান্তি দত্ত, *সিলেটের উপভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১৮, পৃ. ১০০
১০ রামেশ্বর 'শ, *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৮৮, পৃ. ৪৮৪
১১ তসলিমা পারভীন, *পাবনার উপভাষা*, ঢাকা: আলেয়া বুক ডিপো, ২০০৯, পৃ. ৩৬
১২ রামেশ্বর 'শ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৮
১৩ তসলিমা খাতুন, 'কুমিল্লার উপভাষা: ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ', কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, *কলা ও মানবিক অনুষদ জার্নাল*, সংখ্যা: ১, ২০১৬, পৃ. ২২২
১৪ পি. এম. সফিকুল ইসলাম, *বরেন্দ্রী উপভাষা*, ঢাকা: আলেয়া বুক ডিপো, ২০০৯, পৃ. ১১৬
১৫ মুহম্মদ আবদুল হাই, 'ঢাকাই উপভাষা', পৃ. ২৪৭
১৬ আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮
১৭ মুহম্মদ আবদুল হাই, 'ঢাকাই উপভাষা', পৃ. ২৪৭
১৮ তসলিমা খাতুন, 'কুমিল্লার উপভাষা: ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ', পূর্বোক্ত, পৃ. ২২২
১৯ তসলিমা খাতুন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২২
২০ আবদুর রহীম খোন্দকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭
২১ তসলিমা পারভীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, তেতাল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩২/ডিসেম্বর ২০২৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43ii.004

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়াবনামা* : বয়ানে মন্তাজ

মৌমিতা রায়*

সারসংক্ষেপ

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়াবনামা* উপন্যাসে আখ্যান বয়ানের গভীরে যে সূক্ষ্ম নির্মাণকৌশল লুকিয়ে আছে, তা অনেকক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের 'মন্তাজ' বা সম্পদনার নীতির সমান্তরাল। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে উপন্যাসের নিবিড় পাঠের মাধ্যমে ইলিয়াস কীভাবে একই বাক্যে উত্তম ও নামপুরুষের মিশ্রণ ঘটিয়ে দৃষ্টিকোণের মিথস্ক্রিয়া তৈরি করেন, তা দেখানো হয়েছে। তেভাগা আন্দোলন, দেশভাগের সংকট এবং রাজনৈতিক স্বপ্নভঙ্গের স্মৃতিকে মূর্ত করতে তিনি ইন্দ্রিয়ের অতি-সংবেদনা ও সামূহিক অবচেতনের যে বিন্যাস ঘটিয়েছেন, তা-ই কার্যত ভাষিক 'মন্তাজ' হয়ে উঠেছে। এই প্রবন্ধ *খোয়াবনামা*-য় ব্যবহৃত এই চালচ্চিত্রিক কৌশল কতটুকু অীভনবত্ব তৈরি করেছে তারই বিশ্লেষণ প্রয়াস।

চাবি শব্দ : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *খোয়াবনামা*, মন্তাজ, মন্তাজ, দৃষ্টিকোণ, দেশভাগ, মিথস্ক্রিয়া।

১

বর্তমান প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের (১৯৪৩-১৯৯৭) *খোয়াবনামা* (১৯৯৬) উপন্যাসের নিবিড় পাঠের মধ্য দিয়ে এর কাহিনি-বয়ান কৌশল বিশ্লেষণ করা, যেখানে ইলিয়াসের গদ্যভঙ্গির চমৎকারিত্বের উৎস-অনুসন্ধান করা হবে। তাঁর উপন্যাসে মূলত টুকরো টুকরো ঘটনা আর টানটান কথার মন্তাজ-এ পট নির্মিত হলে সেখানে কয়েকটি চরিত্র বিম্বিত হয় এবং চেতনাপ্রবাহের বিস্তার ঘটে[১] –বিষয়টি সমালোচকের দৃষ্টিগ্রাহ্য হলেও, এ-যাবৎ পর্যালোচিত হয়নি। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস *খোয়াবনামা* উপন্যাসের ভাষায় যে মন্তাজ তৈরি করেন তা নির্মাণের কৌশল হলো দৃষ্টিকোণ নির্বাচনে একই বাক্যে মিশ্র পুরুষের মিথস্ক্রিয়া সাধন, ইন্দ্রিয়ের অতি-সংবেদনা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দৃশ্যায়নের বিস্তৃতিকে গুটিয়ে আনা, মনোগহিনের সামষ্টিক অবচেতনের নির্মিতি ইত্যাদির মিশেলে বিবরণধর্মী পরিচর্যায় ধাঁধা সৃষ্টি করা। এই পরিচর্যারীতি তিনি বেছে নেন তেভাগা আন্দোলনের উত্তুঙ্গ মুহূর্তে কৃষক-দাবি কবজা করে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সুযোগে, একে পাকিস্তান আন্দোলনে রূপ দেয়া এবং এরপর রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থতা ও স্বপ্নভঙ্গ ইত্যাদি সংকটের বয়ান তৈরি করতে গিয়ে; তাঁর রচিত ভাষ্যে বাংলাভাগ নিজেই একটি মন্তাজ হয়ে ওঠে।

এ-প্রসঙ্গে মন্তাজ ধারণাটি আলোচনার দাবি রাখে :

> the filmic technique of one shot cutting to an implicitly connected shot to create a synthetic perception that is neither the first nor the second shot. Leaping from image to image, the viewer's consciousness concludes the dialectics of montage by synthesizing imaginatively, associationally.[২]

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।

—মন্তাজ এমন একটি পরিচর্যা রীতি যেখানে দুটি দৃশ্য পরপর সংযোজন করে সংশ্লেষণ ঘটানো হয়, ফলে দৃশ্যদুটির অর্থের বাইরে তৃতীয় একটি তাৎপর্য মননশীল দর্শকের রাডারে ধরা পড়ে। মন্তাজ হলো চলচ্চিত্রের সম্পাদনা রীতি, আবার সাহিত্যে পরিচর্যা-কৌশল হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগে দৃশ্য সম্পাদনার প্রয়োজনে মন্তাজ ধারণার উদ্ভব। এর চূড়ান্ত উৎকর্ষ সাধিত হয় সোভিয়েত রাশিয়ার বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে যখন সের্গেই মিখাইলোভিচ আইজেনস্টাইন (১৮৯৮-১৯৪৮) বিশ্ব-চলচ্চিত্রে বিপ্লব আনলেন। তাঁর মতে, ছবির প্রতিটি দৃশ্যে এমন উপাদান থাকবে যা এককভাবে এবং তার পূর্বের ও পরের দৃশ্যের সঙ্গে সংযুক্তভাবে দর্শকের মনকে ক্রমাগত আকৃষ্ট চমকিত ও উদ্বেলিত করবে।[৩] সে সময় 'আইজেনস্টাইন যে সম্পাদনা রীতির উদ্ভব করেছিলেন তাকে তিনি 'Montage of Attractions' আখ্যা দিয়েছিলেন'।[৪] 'তথাকথিত প্লট বা কাহিনীর অনুপস্থিতি, কেন্দ্রস্থ কোনো নায়ক চরিত্রের অনুপস্থিতি– এসব ছিল তখনকার যুগে অভাবনীয়'।[৫]

মন্তাজের আঙ্গিক বিশ্লেষণে একে চারটি রূপে ভাগ করা হয় : শব্দ-বাক্য-ইমেজ সাজানোর ফলস্বরূপ পদ্ধতি সাপেক্ষ উপায়; কাল সাপেক্ষ উপায় (স্থান অভিন্ন, কালের পরিবর্তন); স্থান সাপেক্ষ উপায় (কাল অভিন্ন, স্থানের পরিবর্তন); উপাদানের সম্পর্ক সাপেক্ষ উপায় (ইমেজগুলির রৈখিক, সমান্তরাল, সমপৃষ্ঠ, বিপ্রতীপ বা দ্বান্দ্বিক উপস্থাপনা)।[৬] 'সম্পাদনার সরল কোলাজ মোটেই মন্তাজ নয়, কেননা মন্তাজের 'greatest-creative-multiple impulse' ওতে নেই'।[৭]

সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের যোগ নিবিড়। এদের বিভিন্ন উপাদানকে সমন্বিত করার পদ্ধতির মধ্যেও গভীর মিল রয়েছে। পূর্বজ-প্রাচীন সাহিত্যের থেকে নানান ঋণ গ্রহণ করেছে চলচ্চিত্র। স্বয়ং আইজেনস্টাইন মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট ও পুশকিনের কবিতার চলচ্চিত্র নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন।[৮] এছাড়া মন্তাজরীতির মূর্ত ফর্মের জগৎ থেকে অনুভূতির বিমূর্ত জগতে চলে যাওয়া আরও প্রাঞ্জল প্রাচীন জাপানি হাইকু কবিতাগুলিতে; আইজেনস্টাইন এদের বলেছেন এক-একটা মন্তাজের দৃশ্য-তালিকা[৯]।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বয়ানকৌশল চলচ্চিত্রের মন্তাজের মতন শক্তিশালী প্রকাশ-মাধ্যম হয়ে ওঠে। প্রথমে বিবরণ প্রদানের বেলায় দৃষ্টিকোণ নির্ণয়ে কীভাবে মন্তাজ ঘটে তার বিশ্লেষণে আসা যাক। উপন্যাস তো আর সিনেমার মতো ভিজ্যুয়াল মাধ্যম নয়, তাই এখানে দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন হলে আমরা বুঝতে পারি একটির পর একটি শট নেয়া হচ্ছে; একটি ঘটনাকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে, নানা রূপে দেখানো হচ্ছে। কথাসাহিত্যে দৃষ্টিকোণ নির্বাচনের গুরুত্ব প্রসঙ্গে সমালোচক সৈয়দ আকরম হোসেনের অভিমত স্মর্তব্য: মূলত, একজন কথাসাহিত্যিকের দৃষ্টিকোণ নির্ণয় কবির কবিতার ছন্দ-নির্বাচনের মতই সচেতনা-সাপেক্ষ।[১০]

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বয়ানকৌশল নির্মাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বা স্বভাব একই বাক্যে মিশ্র পুরুষের ব্যবহার। এর ফলে যদিও বাক্যে উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হয়, তবে নাম পুরুষের কাজটিকে পূর্ণ গুরুত্ব দেওয়া যায়; তার মানে হলো আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রত্যক্ষণ

(perception) নিয়ে খেলতে শুরু করেছেন এবং কথকের (narrator) আড়াল ঘুচিয়ে প্রকাশ্যে চলে আসছেন। তিনি এক পৃথক সত্তা হিসেবে উপন্যাসে হাজির থাকছেন এবং এমন নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখছেন কাহিনির ওপর, যে তাঁর নির্মিতি একেবারে স্বতন্ত্র ও প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কেবল লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ এবং চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দুর মিশ্রণ সম্পাদনা করেই ক্ষান্ত হন না। এ ধরনের কাজ কথাসাহিত্যের বিকাশ-পর্ব থেকেই বহুবার ঘটেছে বাংলা গল্প-উপন্যাসে। তিনি একই কাহিনিভাগে চরিত্রের ভিতরে প্রবেশ করে উত্তম-পুরুষ আমি হয়ে ঘটনার বিবরণ দেওয়ার পর, ঘটনা এবং চরিত্র থেকে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে পৃথক অবস্থান থেকে ঘটনাটির বর্ণনা দান করেন নাম-পুরুষ 'সে' ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে। পরিণামে ঘটনাটি পাঠকেরা দুটি অবস্থান থেকে দেখতে পারেন, একটি চলমান ঘটনা-প্রবাহের অংশ হয়ে এবং অন্যটি নির্মোহ, দূরবর্তী, পৃথক অবস্থান থেকে। উদাহরণস্বরূপ : *'রেইনকোট'* গল্পে দৃষ্টিকোণ নির্বাচনে এই স্বভাবটি বজায় রেখেছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। সম্পূর্ণ গল্পটি বয়ান করা হয়েছে রচয়িতার সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে, অর্থাৎ ব্যবহৃত হয়েছে নাম পুরুষবাচক সে বা চরিত্রের নাম। কিন্তু পুরো গল্পটি চেতনাপ্রবাহ রীতিতে রচিত হওয়ায়, নুরুল হুদার প্রেক্ষণবিন্দুর যুক্ততা থাকায়, গল্পটি মনে হয় আমার তথা পাঠকের বয়ানে সৃষ্ট। লেখক 'আমি' ও 'সে' একাকার করে ভাষিক বিভ্রাট ঘটান, ফলে মনোজাগতিক টানাপড়েনের ব্যাকরণহীন চিন্তাপ্রবাহ জমজমাট হয়ে ওঠে।

খোয়াবনামার প্রথম বাক্যটিকে ব্যবচ্ছেদ করলেই দৃষ্টিকোণ নির্বাচনে মিশ্র পুরুষের ব্যবহার কীভাবে এবং কেন সাধন করেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তা বোঝা সম্ভবপর হবে :

> পায়ের পাতা কাদায় একটুখানি গেঁথে/ যেখানে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে/ গলার রগ টানটান করে/ যতোটা পারে উঁচুতে তাকিয়ে/ গাঢ় ছাই রঙের মেঘ তাড়াতে/ তমিজের বাপ কালো কুচকুচে হাত দুটো নাড়ছিল,/ ঐ জায়গাটা ভালো করে খেয়াল করা দরকার।[১১]

– প্রথম ছয়টি ক্রিয়া সংঘটিত করে তমিজের বাপ কিন্তু সপ্তম ক্রিয়াটি লেখক পাঠককে সঙ্গে নিয়ে করছেন। বাক্যের প্রথম অংশের ছয়টি ক্রিয়া নাম পুরুষের দৃষ্টিকোণে রচিত, পরবর্তী অংশ উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণে রচিত। 'যেখানে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে' বাক্যাংশের 'যেখানে' বাদ দিয়ে বাক্যটি সরল রূপে নাম পুরুষে লেখা যেত এভাবে : পায়ের পাতা কাদায় একটুখানি গেঁথে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গলার রগ টানটান করে যতোটা পারে উঁচুতে তাকিয়ে গাঢ় ছাই রঙের মেঘ তাড়াতে তমিজের বাপ কালো কুচকুচে হাত দুটো নাড়ছিল। কিন্তু আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বাক্যের পরবর্তী অংশে ('ঐ জায়গাটা ভালো করে খেয়াল করা দরকার') উত্তম পুরুষ 'আমাদের' সর্বনামটি উহ্য রেখে জটিল বাক্য নির্মাণ করেছেন প্রধান খণ্ডবাক্যটি জুড়ে দিয়ে। একইসঙ্গে, দেখার বিষয়, এখানে স্থান অভিন্ন কিন্তু কালের পরিবর্তন ঘটছে অর্থাৎ কাল সাপেক্ষে মন্তাজ নির্মিত হচ্ছে ফ্ল্যাশ-ফরোয়ার্ড টেকনিক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে।

লক্ষণীয়, বিবরণধর্মী পরিচর্যা রীতির ব্যবহারের সময় দৃষ্টিকোণের মিশ্রণ তৈরির মধ্য দিয়ে (শটের মিশ্রণ ঘটে) মন্তাজ সৃষ্টি করেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। *খোয়াবনামার* উদাহরণ :

> তখন কি বিল কি জমি, কি পানি কি ডাঙা কারো কোনো আব্রু নাই। তখন মানুষ বলো, গোরুবাছুর বলো, মেয়েমানুষ বলো আর ছোলপোল বলো, মাছ বলো শামুক বলো, –সব, সব শালা উলঙ্গবাহার হয়ে বেহায়ার মতো খ্যামটা নাচন নাচে।[১২]

– এখানে রৈখিক উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে উপাদানের সম্পর্ক সাপেক্ষে মন্তাজ ঘটছে। লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবরণ দেওয়া হচ্ছিল, এর মধ্যে চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটে। চরিত্রের দৃষ্টিকোণ আচমকা ঢুকে পড়ে তার বলার ভঙ্গি, আঞ্চলিক শব্দ এবং নিজস্ব অনুভূতিসমেত। তবে তা বিবৃত হয় একই অনুচ্ছেদে, এমন-কি কোনো উদ্ধৃতিচিহ্নের আড়ম্বর-ব্যতীত। অঘোষিত এই প্রবেশ পাঠককে বুঝিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, কারণ পাঠককে সাথে নিয়েই (পূর্বের উদ্ধৃতিতে) আখতারুজ্জামান ইলিয়াস *খোয়াবনামার* যাত্রারম্ভ করেছেন। এরপর এগিয়ে গেলে কয়েকটি বাক্যের পর আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উপমা নির্বাচনে পাঠক অনুমান করতে পারে যে লেখকের সঙ্গে মিশে যাওয়া এই দৃষ্টিকোণটি মাঝিপাড়ার কারও হতে পারে :

> রাত বাড়ে, বিল জুড়ে তার (পাকুড় গাছ) ছায়া খালি ছড়াতে থাকে, ছড়াতেই থাকে। অমাবস্যার ঘনঘোট অন্ধকার কি পূর্ণিমার হলদে জ্যোৎস্না কিংবা কৃষ্ণপক্ষের ঘোলা লাল আলোয় সেই সমস্ত ছায়া গতরে মুড়ে ... –সব, সবই মায়ের কাছে ভাতের জন্য কাঁদতে কাঁদতে গায়ে মাথায় জাল জড়িয়ে ঘুমিয়ে-পড়া মাঝিপাড়ার বালকের মতো একটানা নিঃশ্বাস নেয়।[১৩]

– আবারও স্থান নিশ্চল কিন্তু কাল বহমান। একইসঙ্গে পুনরাবৃত্ত 'সব' ছান্দিক মুগ্ধতা ছড়াচ্ছে, ফলে রিদ্‌মিক মন্তাজ ঘটছে। বিবরণের এক পর্যায়ে আরও কতক বাক্যের পর একই অনুচ্ছেদে স্পষ্ট হয় যে দৃষ্টিকোণটি তমিজের বাপের ছিল : 'মুনসিকে এক নজর দেখার সুযোগটা নিতেই তমিজের বাপের এখানে আসা।'[১৪]

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পে-উপন্যাসে বিবরণ প্রদানের বেলায় প্রেক্ষণবিন্দুর অভাবনীয় বিমিশ্রণ লক্ষ গ্রাহ্য হয় কখনো এবং আমরা বলতে পারি এখানেই তাঁর নিজস্বতা সুচিহ্নিত। দৃষ্টান্ত :

> ক. বিলের শিওরে পাকুড়গাছে বসে সকাল থেকে শকুনের চোখে মণি হয়ে ঢুকে মুনসি সূর্যের আকাশ পাড়ি দেওয়া দেখবে, দেখতে দেখতে হঠাৎ রোদে মিশে গিয়ে রোদের সঙ্গে রোদ হয়ে ওম দেবে বিলের গজার ...আর পুটির হিম শরীরে।[১৫]
>
> খ. জয়নাব তার বন্ধ চোখ দিয়ে ওহিদুল্লাহর খোলা নোনা দুই চোখে অদৃশ্য সব ছবি এবং অনেক আগে সম্পন্ন গতিবিধি প্রকাশ করে দেয়।[১৬]

ক-সংখ্যক দৃষ্টান্তে, মুনসি শকুনের রূপ ধরে আছে। শট শকুনের চোখের মণিতে থমকে থাকে, পরে বিছিয়ে যায় বিলের বিস্তীর্ণতায়, তখন রঙের বদল ঘটে সূর্য-রশ্মির পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে– এই দৃশ্যের মাত্রা অন্তত একদিনব্যাপী। আমরা যদি ভুলে না যাই যে, উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট দুইশো বছর বিস্তৃত তাহলে এই দৃশ্য সংযোজনের মাত্রা এবং টোন বোধগম্য হবে; ইন্টেলেকচুয়াল মন্তাজে উত্তীর্ণ এ-দৃশ্যটি তাৎপর্য বহন করে দুইশো বছরের রূপান্তরের।

ওপরের দুইটি উদাহরণে যথাক্রমে একজন মৃত (মুনসি) এবং অন্যজন মৃতপ্রায় (মা) ব্যক্তি অন্যের চোখে নিজের দেখার কাজটি প্রদান করার মধ্য দিয়ে দৃষ্টিকোণের সংশ্লেষণ তৈরি করে, ধৃতরাষ্ট্রের সঞ্জয়ের চোখে কুরুক্ষেত্র-দর্শনের মতন। মন্তাজ সৃষ্টিতে পাশাপাশি শটগুলোর বিন্যাসে এদের

সংযুক্তির মাঝে ডিজ্‌ল্‌ভ্‌ (দ্রবীভূতকরণ), ফেইডস (বিবর্ণকরণ), সুপার ইম্পোজিশন (দুটো শটের মিশ্রণ), ওয়াইপ (মুছে ফেলা) ইত্যাদি ইফেক্ট সম্পাদনায় ব্যবহৃত হয়। ওপরে যেমন খ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে 'দুধভাতে উৎপাত' গল্পের জয়নাব ধীরে ধীরে মুছে গিয়ে ওহিদুল্লাহর দৃশ্যপট পরিষ্কার হয়ে উঠছে।

সমালোচক শহীদ ইকবাল মনে করেন, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্প-উপন্যাসের মৃত্যুদৃশ্যে ফ্যান্টাসি ও ইমেজ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রায় উদ্ভাসিত হয়। পাঠক ও লেখকের মাঝে মনে হয় তৃতীয় কোনো ব্যক্তি বুঝি এ দৃশ্য বর্ণনা করছে।[১৭] এর তাৎপর্য হলো, মৃত বা লোকান্তরিত ব্যক্তি বিশ্বাসীর মনোজগতে সর্বদা জাগরুক। মৃত মুনসি এবং সন্ন্যাসীর বিদ্যমানতায় ভক্তি-বিশ্বাস স্থাপন *খোয়াবনামা* উপন্যাসের অন্তিময়তার গভীর-তলের ভিত্তিভূমি নির্মাণ করছে। ফলে, তমিজের বাপ কিংবা বৈকুণ্ঠের প্রেক্ষণবিন্দু ব্যবহার করে বিশ্বাসের দুনিয়ায় বিদ্যমান মুনসি-সন্ন্যাসীর কাহিনি, সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে উঠিয়ে আনেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস।

২

ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতিসংবেদনশীলতা, বিচলন এবং সর্বগ্রাসী হয়ে দৃশ্যজুড়ে ছড়িয়ে, বিছিয়ে পড়া লক্ষণীয় আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিবরণ-নির্মিতিতে। নিচের উদাহরণে লক্ষণীয়, গন্ধ, শব্দ এবং আলোর আয়োজনে, বিস্তৃতি রূপান্তরিত বা দ্রবীভূত (ডিজ্‌ল্‌ভ্‌) হচ্ছে বিন্দুতে; খোয়াবের প্রকৃতিও তাই, বিষয়টি *খোয়াবনামা*র দ্বিতীয় মন্তাজের উৎস-ভূমি হিসেবে দেখা যেতে পারে।

> গন্ধ : খাওয়া দাওয়ার পর বৈকুণ্ঠের জর্দার নেশা-ধরা গন্ধে ছোটো বারান্দাটা আরো চাপা হয়ে আসে। এমন কি ছোটো উঠানটাও উঠে আসে ধানের তুষের গন্ধ নিয়ে। তারপর তমিজের বাপের ঘরটাও এই বারান্দায় আসন পাততে চাইলে তমিজের পা ছুঁয়ে যায় কেরামতের হাটুর সঙ্গে।[১৮]
>
> শব্দ : তার এই ধ্যান মূর্তিতে আর তিনজনে একেবারে চুপ করে যায় এই নীরবতার সুযোগে কুলসুমের একটানা কান্না চেপে বসে গোটা বাড়িতে, বাড়ির সামনের ডোবা এবং ডোবারও ওপারে রাস্তা, রাস্তা ডিঙিয়ে শেষ বিকালের ধানকাটা জমিও সেই কান্নার কবজা হয়ে একটি অখণ্ড পিণ্ডের আকার নেয়।[১৯]
>
> শব্দ ও আলো : বাড়ির সামনের খুলি পার হয়ে ডোবার কোমর পানিতে অল্প একটু বুদবুদ তুলে বুদবুদের টুপটুপ বোল নিজের শরীরে বরণ করে আওয়াজটি রাস্তা ডিঙিয়ে ওই বোলের সবটাই ঝেড়ে ফেলে শিশির পড়ার ফিসফিসানি মেনে নিয়ে ঢুকে পড়ে সন্ধ্যার খাপের মধ্যে এবং কুয়াশা ঝোলানো কালচে গোলাপি আসমানকে মিশমিশে কালো করে আসমানকে তো বটেই, ওই সঙ্গে নিজেকেও একেবারে আড়াল করে দেয়। বলতে কী, চেরাগ আলি ফকিরের গানের গড়িয়ে চলাতেই গিরির ডাঙায় সেদিন সন্ধ্যা নামলো একটু আগেই।[২০]

জর্দা ও ধানের তুষের গন্ধ, কুলসুমের কান্নার শব্দ, এরপর চেরাগ আলী ফকিরের গানের শব্দ ও গিরির ডাঙায় আঁধার নামা– এই তিন আয়োজন যে স্থান-কাল তথা দৃশ্যের যোজনা করছে তা সরলভাবে লং এবং ক্লোজ শট নেওয়ার মাধ্যমে রচিত নয়; বরং এখানে অনুভূতির সম্মিলন ঘটানোর মধ্য দিয়ে একটি দৃশ্যের মধ্যে আরেকটি দৃশ্য অনুপ্রবিষ্ট হয়ে, বিশেষত শেষোক্ত শব্দ ও আলোর মিশ্রণে (সুপার ইম্পোজিশন), মেখে গিয়ে মন্তাজ তৈরি করছে।

৩.

খোয়াবনামা উপন্যাসের বিবরণ-পটে মন্তাজ সৃষ্টির সঙ্গে চরিত্র বিম্বিত করার সম্পর্কের বিষয়টি পর্যালোচিত হবে এই পরিচ্ছেদে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চরিত্রনির্মাণ কৌশলের লক্ষণীয় দিক হলো : মহৎ চরিত্রায়নের বিপরীতে গিয়ে চরিত্র নির্মাণ করেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। অর্থাৎ, উপন্যাসে পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদের যোজনা হয় অতি-বিস্তারিত বিবরণের মাধ্যমে যেখানে চরিত্রগুলো দৈনন্দিন ভাবনাচিন্তা, ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে সাধারণ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে, আর সম্পূর্ণ কাহিনি পরিবেশিত হয়েছে গালগল্প আকারে। যেমন উপন্যাসের ঘটনাভাগে দেখা যায় মাঝির বংশের তমিজ চাষির জাতে উঠতে চায় বলে ফুলজানকে বিয়ে করে। বিয়ে করার পথ সুগম করতে সে আগেই ফুলজানের অনাগত সন্তানের পিতা হয়ে নেয়। এরপর সে বিয়ের আসরে জমি লিখে না দিলে বিয়ে করবে না বলে ঝামেলাও সৃষ্টি করে। অর্থাৎ, উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রটিকেই তেভাগা আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা না করে– চাষা হওয়ার জন্য যা দরকার তা-ই করতে মরিয়া– এমন একটি চরিত্র হিসেবে গড়ে তোলেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। অন্যদিকে উপন্যাসের শেষে তমিজ তেভাগা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে কি-না এমন একটি শোনা কথা বা গুজব গালগল্পের মাধ্যমে উঠিয়ে আনা হয়।

ইসমাইল হোসেন চরিত্রটিও একই আদলে নির্মিত হয়েছে। সে তেভাগার কর্মীদের হাতে রাখে শ্বশুরবাড়ির জমিদারি সামাল দেওয়ার জন্য, এমন বিবরণ উপন্যাসে হাজির হয় বিস্তারিত চিন্তন-ক্রিয়ার আকারে। অথচ দেশভাগের পরে হিন্দুদের জমি দখল দূরে থাক, অল্পমূল্যে কিনে নেওয়ার প্রস্তাবেও সে মানবিকতা বোধের কারণে সম্মত হয় না, এমন দৃশ্যায়ন রচিত হয় না, সংযোজিত হয় কেবল অপরের মুখে শোনা কথার আকারে।

খোয়াবনামা উপন্যাসটিতে তমিজের মতো তেভাগা-কর্মীকে গ্রাস করে প্রকট হয়ে ওঠা মুসলিম লীগ নেতা ইসমাইলের বিকাশকে যদি ধরা যায় এই উপন্যাসের কাহিনি-সূত্র, তাহলে পরিষ্কারভাবেই লক্ষণীয় কেন্দ্রীয় ব্যক্তি-চরিত্র নয়, চিন্তা বা আদর্শের বাহক হয়ে উঠছে কাহিনির চরিত্ররা; যা মন্তাজ রীতির টাইপেজ[২১] (Typage) ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

অর্থাৎ আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উপন্যাসে মহৎ চরিত্র নির্মাণ করার বদলে লাভ-ক্ষতির হিসেব কষা সাধারণ মানুষ সৃষ্টি করার প্রবণতা লক্ষণীয়। মহৎ কাহিনিগুলোকে তিনি অন্য লোকের মুখে শোনা-কথার বিবরণ আকারে হাজির করেন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কোনো ব্যক্তিমূর্তি তৈরি করতে চান না, তিনি জনসমষ্টির যৌথতা নির্মাণ করতে চান।

ঔপন্যাসিক সত্তা, স্বপ্ন, সময় এবং বিলয় একীভূত আকারে উপস্থাপন করেন মুনসি, সন্ন্যাসী, চেরাগ আলী, তমিজের বাপ এবং তমিজ চরিত্রের বিন্যাসে। এদের কারোরই মৃত্যুদৃশ্য নির্মাণ করেন না, এটিও হয়ে ওঠে গালগল্প-নির্ভর এবং এদের দেহত্যাগের মধ্য দিয়ে মহত্ত্ব-প্রাপ্তি হয়, তারা পরিণত হয় লোককথার নায়কে। এভাবেই তারা যৌথ-নির্জ্ঞানে ঠাঁই করে নেয়।

খোয়াবনামা উপন্যাসে সামষ্টিক অবচেতন রূপ লাভ করেছে, চেরাগ আলীর 'পাওয়া শোলক' হয়ে উঠেছে যার আধার। তার বিপরীতে উপস্থাপন করা হয়েছে তেভাগা ও পাকিস্তান নিয়ে কেরামতের

রচিত কবিতাকে। অর্থাৎ একদিকে হয়ে ওঠা লোক-পুরাণ ধারণ করে আছে চেরাগ আলীর শোলক, অন্যদিকে লিখিত ইতিহাস নির্মাণ হচ্ছে কেরামত আলীর কবিতা বা গানে। দুজনের পার্থক্য বিবরণ, কথোপকথন এবং মূল্যায়ন আকারে হাজির হয় নিম্নরূপ উদাহরণসমূহে :

ক. চেরাগ আলির গলা ভারি, কিন্তু নদীর পানিতে, পানির বাতাসে আর বাতাসের হিমে ও তাপে সেই স্বরে ভাঙনের চিহ্ন, চিড় খাওয়ার দাগ। সেখানে বিজলির এরকম রাগী গর্জন নাই।[২২]

খ. তেভাগা তো হয়েই যাচ্ছে, কেরামতের তখন কদর আরো বাড়বে।... পাকিস্তান হয়ে পড়ায় তার 'লীগ কংগ্রেসের হিংসা কেন গেলো না' বইটার বিক্রি পড়ে গেছে। ইসমাইলের কথায় সে এখন 'নয়া ওয়াতন পাকিস্তান' নামে একটা গান বাঁধার কথা খুব ভাবছে।[২৩]

গ. (কেরামত:) ...তোমার শোলক লেখা লাগবি তোমাক লিজে। হামার গান বান্দি হামি লিজেই।...

(চেরাগ আলী:) এই গান লেখবার পারবা? না হামি পারমু? গান বান্দা এক কথা আর পাওনা শোলক আরেক জিনিস।[২৪]

ঘ. তমিজের বাপ শোনে আর ভাবে, হায়রে, কোনকালের সব পাওনা গান গড়াতে গড়াতে এই ফাতড়া মানুষটার (কেরামত) পাল্লায় পড়ে সেটার কী চেহারা হয়েছে...[২৫]

চেরাগ আলীর হয়ে ওঠা বাংলার প্রকৃতিকে ধারণ করে, তার স্বর গড়ে তুলেছে নদীমাতৃক বাংলার প্রকৃতি, তার দর্শন কালের চিহ্ন আত্মস্থ করে পাওয়া। কিন্তু কেরামত চলে বাজার অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণে, সে জনপদের ইচ্ছাকে বহন করে না বরং নির্মাণ করে, সে গান বাঁধে, গান লেখে। এই বঙ্গের মানুষের প্রত্যাশাকে ধারণ করে চেরাগ আলী আর মেনে নিতে বাধ্য হওয়া বাস্তবতায় রূপান্তরিত-রূপ উঠিয়ে নিয়ে আসে কেরামত; এর ফলে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ব্যবধান তৈরি হয়ে যায়।

উপন্যাসের দর্শনভাগ প্রধানত রচিত হয় বিবরণে। *খোয়াবনামার* বিবরণপটে ভাষা প্রশ্নেও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের লক্ষবিন্দু গণমানুষের জীবনজীবিকার ওপর নিবদ্ধ। ফলে এর সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ব্যবস্থার সমালোচনা করেন তিনি তির্যক ভাষা-বুনটে। উপন্যাসে প্রভুর প্রতি দাসসুলভ আনুগত্য থেকে তাদের মতো করে ইংরেজি শেখা এবং ইংরেজ শাসন থেকে স্বাধীন হওয়ার রাজনৈতিক সংগ্রামের বৈপরীত্য তীক্ষ্ণ বিদ্রুপের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস–

কয়েক পুরুষের জমিদারি, পিতামহের মন্ত্রিত্ব ও এক পুরুষ গ্যাপ দিয়ে নিজের উপমন্ত্রিত্ব এবং তিন পুরুষ ধরে বিয়ে-করা ও না-করা ইংরেজ ও এ্যাংলো ইনডিয়ান মেমসায়েবদের সঙ্গে প্রেম ও যৌবন সঙ্গম প্রভৃতি কারণে খাঁটি সায়েবদের সাহচর্যের ফলে খান বাহাদুরের গলার ভেতর থেকে বেরুতে বেরুতে বাঙলা ভাষা অনেকটাই দুমড়ে যায়। বাঁকা বাঙলা, ভাঙা উর্দু ও সায়েবদের চেয়েও সায়েবি ইংরেজির মিশেলে মুসলমান কৃষকের ওপর হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের জুলুমের কথা বলতে বলতে তার গলা ভারাক্রান্ত হয়, আট মিনিটের বেশি বলা তার পক্ষে আর সম্ভব হয় না।[২৬]

কোরান ও সুন্নার আদর্শে জীবন যাপন করার লক্ষে পাকিস্তান কায়েমের জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান বাঙলা ভাষায় জানালেও নিজের পেশাগত অভ্যাসের কারণে এবং সৈয়দ আমির আলির 'স্পিরিট অফ ইসলাম'-এর প্রায় অর্ধেকটাই মুখস্ত থাকার ফলে সাদেক উকিলের বেশির ভাগ কথাই বেরিয়ে আসে ইংরেজিতে। ইসলামের বিজয়গাথা প্রচার ও সেই সঙ্গে রাজভাষার ব্যাকরণগত শুদ্ধতা বজায় রাখতে তার মনোযোগ, যত্ন ও নিষ্ঠা একেবারে নিরঙ্কুশ।[২৭]

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন কীভাবে পাকিস্তান আন্দোলনে পর্যবসিত হচ্ছে অর্থাৎ ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ বিরোধিতা মুছে গিয়ে হিন্দু-মুসলমান দ্বিজাতির ধারণার উদ্ভব হচ্ছে কীভাবে, রাজনীতির সে প্রসঙ্গ উঠে এসেছে এখানে। এক-একটি বাক্যে এতোগুলো প্রসঙ্গ এমনভাবে উঠে এসেছে যে গতিশীল প্রতীকী দৃশ্যগুলো মুহূর্তের মধ্যে তীক্ষ্ণ-তাৎপর্যময় বোধে সাড়া জাগাবে পাঠককুলের মধ্যে, চলচ্চিত্রে যে কাজটি করে ইন্টেলকচুয়াল মন্তাজ। উপনিবেশের দাসত্ব থেকে ইংরেজি এবং ধর্মভীতি হতে জাত আরবি-উর্দু কিংবা সংস্কৃত আকর্ষণ কীভাবে গণমানুষকে ভাষাহীন, অধিকারহীন করে তোলে তা-ও দেখানো হয়েছে উপন্যাসে :

> এরকম কঠিন সংস্কৃত কথা চেরাগ আলির জিভে আসবে কী করে?[২৮]
>
> মওলানার মোনাজাত হচ্ছিলো উর্দুতে, উর্দুতে সমবেত জনতার অজ্ঞতা এই ভাষার প্রতি তাদের ভক্তিতে উস্কে দেয় এবং এর রহস্যময়তা আরবি আয়াতের সঙ্গে সবরকম ফারাক মোচন করে।[২৯]

এখানে লক্ষণীয়, ওপরের দুইটি উদাহরণেই অজ্ঞতা দূরত্বের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, ফলশ্রুতিতে এক ধরনের ভক্তি-ভাবাবেগ তৈরি হচ্ছে। অর্থাৎ জনতার সমস্যার সমাধান না মিললেও তারা বশ্যতা স্বীকার করে নিচ্ছে, পরিণামে ভাষিক-রাজনীতির কার্যকারণ-পরিপ্রেক্ষিত নির্মিত হচ্ছে।

বক্তব্য নির্মাণে *খোয়াবনামা* উপন্যাসে বাংলাভাগ নিজেই একটি মন্তাজ হয়ে ওঠে। যেমন সোভিয়েত চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে স্মর্তব্য : Montage is the whole film.[৩০] হিন্দু এবং মুসলমান তাদের নিজেদের ভেতরে কত জাত-পাতের বিভাজন মানে তার কাহিনি তৈরি করেছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস; ফলে হিন্দু আর মুসলিম দুই জাতি – এই তত্ত্বের পাশে *খোয়াবনামা*র কাহিনি বিভ্রম সৃষ্টি করে। *খোয়াবনামায়* বিদ্যমান জাত নিয়ে অন্তত দুইটি পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। প্রথমত, উপন্যাসে মুসলমান চরিত্রের ক্ষেত্রে গিরিডাঙার মাঝিদের হানাফি জামাতের অনুসারী, নিজ গিরিরডাঙার চাষীদের মোহাম্মদি জামাতের অনুসারী এবং মাদারপাড়ার ফকিরদের মাদার তরিকার অনুসারী হিসাবে দেখানো হয়। পরবর্তীতে আবদুল কাদেরের বিয়ের ঘটনার সূত্রে লক্ষণীয় যে, 'সমাজের উঁচুতলায় 'জাত' পুঁজিতান্ত্রিক লগ্নি ও ক্রয়বিক্রয়ের বিষয় হয়ে ওঠে'[৩১]। একইসঙ্গে হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ নায়েব, জগদীশ সাহা, যুধিষ্ঠির কর্মকার, কায়স্থ জমিদার, বৈকুণ্ঠ গিরি প্রত্যেকে আলাদা জাতের অধিভুক্ত।

দ্বিতীয়ত,

> *খোয়াবনামায়* মাঝি বা জেলে, কামার, ফকির প্রভৃতি সমাজের মধ্যে আত্মিক সম্পর্কও দৃশ্যমান হয়।... বাংলায় ১৭৬০ থেকে ১৭৮০ সালের মধ্যে সংঘটিত ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের যে প্রভাব যমুনার চরাঞ্চল থেকে কাৎলাহার পর্যন্ত বিস্তৃত হয় তার স্মৃতি ও উত্তরাধিকার যৌথভাবে বহন করে এই সব জাতের মানুষ। ফলে উপন্যাসে বিদ্রোহের এই স্মৃতিকে তাদের সামাজিক সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হিসেবে ক্রিয়াশীল থাকতে দেখা যায়।[৩২]

ফলে, বলা যেতে পারে হিন্দু-মুসলিম নয়, বরং শ্রেণিসত্যকে সামনে রাখছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। যে সাতচল্লিশের দাঙ্গার ইতিহাসকে প্রকট সত্য করে তুলে ধরে দেশভাগকে বৈধতা দেওয়া হয় সেই ঘটনা *খোয়াবনামায়* পরিবেশিত হয় অতি তুচ্ছ আর মিথ্যার বেসাতি হিসেবে, আবদুল আজিজের সম্বন্ধী আহসান আলির ভাষ্যে, সে কলকাতার দাঙ্গায় হিন্দুদের আক্রমণের

শিকার এবং শরণাগতও হয় অন্য হিন্দু দোকান-মালিকের কাছে। দেশভাগ যে আদতে ধর্ম আর শ্রেণি-সংগ্রামের জগাখিচুড়ি, এবং কীভাবে সেটা পাকানো হলো তা-ও লক্ষ করা জরুরি :

> পাকিস্তান হাসিলের কর্মসূচিতে চাষির দাবি অন্তর্ভুক্ত হলে সেই স্বপ্ন প্রায় বিশ্বাসে পরিণত হয়।...আখ্যান জুড়ে সেই স্বপ্নটাই বিক্ষিপ্ত ক্রমবিন্যাসে অবয়ব পায়, তেভাগা আন্দোলনের বিস্তার আর কৃষকচেতনায় তার ভাবচ্ছাপ থেকেই মুসলিম লীগ বাধ্য হয়েছিল সেই দাবিকে তাদের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণে! সেই অকপট আশ্বাসে আর দ্বিজাতি তত্ত্বের গণবিকারে – বাংলার চাষি-কৃষকের সমর্থনে পাকিস্তান আন্দোলন গণোচ্ছ্বাসে পরিণত হয়েছিল। সেই প্রবল উত্তালকে যমুনার 'সাত স্রোত আর উনপঞ্চাশ ঢেউ' বলে ভাবলে, কিংবা তেভাগা আন্দোলনকে বিষয়গত ও মনোগত দুটি ধারায় বাঙালি নদীর শীর্ণকায়া স্রোতের রূপকে দেখলে কি ইলিয়াসের নির্মাণের সঙ্গে আরও সহৃদয়তা স্থাপিত হয় না পাঠকের![৩৩]

আর এভাবেই বিষয় নির্বাচনে মন্তাজ তৈরি হয়েছে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়াবনামায়*, যা বুদ্ধিবৃত্তিকে আন্দোলিত করে, বজ্রালোকের মতো পাঠক হৃদয়ে পৌঁছায়। গণমানুষের আকাঙ্ক্ষা এবং উপনিবেশিত রাজনৈতিক বাস্তবতার ফারাক, বিপরীত-চিত্রে দেখানো হচ্ছে, অথচ এর পাঠকের মননে ছায়া ফেলছে ভিন্ন কোনো খোয়াব। *খোয়াবনামা* বইটিকে যদি কাৎলাহার পাড়ের মানুষের স্বপ্নের দলিল হিসেবে চিন্তা করি তাহলে দেখব, তা হারিয়ে গেছে আবদুল আজিজের আলেম মামাশ্বশুরের কাছে, যার আয়-রোজগারের উৎস পানিপড়া আর তাবিজ বিক্রি। কিন্তু খোয়াবের ব্যাখ্যা করা বইটির সূত্রগুলো তথা মুনসির শোলক রয়ে গেছে তমিজের বাপের নাতনি সখিনার মগজে। পাকুড়গাছ হারিয়ে যায় ইটভাটার গনগনে চুল্লির মধ্যে, খোয়াবনামা হারিয়ে যায় তাবিজ-বেচা আলেমের খপ্পরে–এই আর্থ-রাজনৈতিক রূপান্তরের মধ্যেও শ্রমজীবী মানুষের স্বপ্ন আঁকড়ে থাকা স্বভাবে আশাবাদের ক্ষীণ আলো হয়ে থাকে তমিজের বাপের ঠাঁই চোরাবালির পাশে উঁইঢিবির সামনে জ্বলতে থাকা জোনাকিরা। পুনরায় লক্ষণীয়, পাঠকের চিন্তনে greatest-creative-multiple impulse এভাবেই মন্তাজের অনুভূতি যোগায় *খোয়াবনামা* উপন্যাসের বয়ান।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কথাসাহিত্যের বয়ানে নিরীক্ষা-প্রবণতা দারুণভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। তিনি কাহিনির মেজাজে ঝাঁঝালো আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারঙ্গম[৩৪]। তিনি তাঁর পুরো সাহিত্যিক জীবনে মূলত দুইটি উপন্যাস রচনা করেছেন এবং এ কাজটি করার জন্য হাত মকশো করতে পাঁচটি গল্পগ্রন্থের আটাশটি গল্প লিখেছেন। অসংখ্য ফুটনোট/অনুচিন্তন ডায়েরিতে টুকে রেখে আয়াসসাধ্য, পরিশ্রমনিষ্ঠ একটি সাহিত্যিক জীবন যাপন করেছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। তাঁর বয়ান-নির্মিতির প্রতিটি ক্ষেত্রে – দৃষ্টিকোণ বাছাই, দৃশ্যায়ন, চরিত্রায়ন, সমাজেতিহাস তথা বিষয় নির্ধারণ – তিনি বিপরীতের যোজনা করেছেন। ফলে, বিষয় ও বয়ানের চমকপ্রদ ধাঁধায় আবেশ তৈরি হয় আর পাঠককুল তাঁর ভাষিক-মন্তাজ দক্ষতা প্রত্যক্ষ ও অনুভব করেন।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ আলাউদ্দিন মণ্ডল, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : নির্মাণে বিনির্মাণে*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৯, পৃ. ৩৮২

২ Sheng-Mei Ma, *East-West Montage : reflections on Asian bodies in diaspora*, Honolulu : University of Hawai, Press, 2007), pp. xi-xii

৩ সত্যজিৎ রায়, *বিষয় : চলচ্চিত্র*, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৯, পৃ. ৩২

৪ প্রাগুক্ত

৫ প্রাগুক্ত

৬ ধীমান দাশগুপ্ত, *সিনেমার আঙ্গিক*, কলকাতা : বাণীশিল্প, ১৯৯৩, পৃ. ৬৪

৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

৯ ধীমান দাশগুপ্ত [সম্পা.], *চলচ্চিত্রের টেকনিক ও টেকনোলজি*, কলকাতা : বাণীশিল্প, ২০০৬, পৃ. ৭১

১০ এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন : 'উপন্যাসের সংঘাতময়, সাকার ও দৃষ্টিময় ঘটনাপুঞ্জ পাঠক কীভাবে এবং কোথা থেকে প্রত্যক্ষ করবেন, অর্থাৎ ঔপন্যাসিক কার দৃষ্টিকোণ (point of view) বা প্রেক্ষণবিন্দু অবলম্বনে পাঠককে উপন্যাসের সপ্রাণ ঘটনা ও চরিত্রচিত্ত অবলোকন করাবেন– এ-প্রশ্ন উপন্যাসনির্মিতি প্রসঙ্গে নিগূঢ়। ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিকোণের শিল্পমার্জিত পরিচর্যাকৌশলেই উপন্যাস চিত্রাত্মক নাটকীয় দৃশ্যানুগ বিবরণধর্মী গীতময় ও ব্যঞ্জনাময় হয়ে শিল্পসমন্বয়ে সমগ্রতা লাভ করে।'

– সৈয়দ আকরম হোসেন, *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১০, পৃ. ৯১

১১ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *রচনাসমগ্র ২*, *খোয়াবনামা*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৮, পৃ. ৩৩৩

১২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪

১৩ প্রাগুক্ত

১৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫

১৫ প্রাগুক্ত

১৬ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, 'দুধভাতে উৎপাত', *রচনাসমগ্র ১*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৭, পৃ. ১৯০

১৭ শহীদ ইকবাল, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস: মানুষ ও কথাশিল্প*, ঢাকা : অন্বেষা, ২০০৯, পৃ. ১১০

১৮ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *রচনাসমগ্র ২*, *খোয়াবনামা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৩

১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৪

২০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৫

২১ A performance technique of Soviet Montage cinema. The actor's appearance and behavior are presented as typical of a social class or the other group.
–Glossary of Film Terms, University of West Georgia, Retrieved July 30, 2024, from: https://www.westga.edu/academics/university-college/writing/glossary_of_film_terms.php
'নির্বাক চলচ্চিত্র-প্রস্ফুটনের পথে তার শীর্ষমুহূর্ত ঘোষিত হল বিশাল জনতার বিস্তৃত জয়গানে। ব্যক্তি-নায়কের পরিবর্তন ঘটল "mass-hero" তে।...সমষ্টি-কার্য নিয়ে চিত্রকল্প রচনা সে-ই ছিল প্রথম।...প্রচলিত বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থেকে এর চিহ্নিত বৈপরীত্য বিদ্যমান।... আইজেনস্টাইন কথিত individuality within the collective'.

– ধীমান দাশগুপ্ত [সম্পা.], *চলচ্চিত্রের টেকনিক ও টেকনোলজি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০-৯২

২২ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, *রচনাসমগ্র ২*, *খোয়াবনামা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩৬

২৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৫

২৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৯

২৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩২

২৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৪

২৭ প্রাগুক্ত

২৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৫

২৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৬

৩০ ধীমান দাশগুপ্ত, *সিনেমার আঙ্গিক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

৩১ ইমরান কামাল, 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়াবনামা* : সামাজিক ভূগোল ও রাজনৈতিকতা', *সাহিত্যসন্দর্ভ*, বাংলা ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, তৃতীয় সংখ্যা, ২০২১, পৃ. ৪৮

৩২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

৩৩ আলাউদ্দিন মণ্ডল, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : নির্মাণে বিনির্মাণে*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৯, পৃ. ৪০৩

৩৪ হাসান আজিজুল হক, 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিষবৃক্ষ', *আমার ইলিয়াস*, আলাপচারিতা ও সম্পাদনা : চন্দন আনোয়ার, ঢাকা : ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১৮, পৃ. ৫৪

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, তেতাল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩২/ডিসেম্বর ২০২৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43.ii.006

আকিমুন রহমানের দু'টি উপন্যাস : নারী-পুরুষ সম্পর্কের ভিন্নমাত্রিক রূপায়ণ

নাহিদা বেগম*

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের আধুনিক কথাসাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ আকিমুন রহমানের (জন্ম ১৯৬০) উল্লেখযোগ্য দুটি উপন্যাস *পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে* ও *রক্তপুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি*। লিঙ্গভেদে ব্যক্তির প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, অন্তর্দাহ, অস্থির চাঞ্চল্য ও বিকৃতির নির্মাণের সঙ্গে সমাজসংলগ্ন মানুষের মূল্যবোধের বিপরীতে প্রবৃত্তির প্রতিষ্ঠা, রোমান্টিক মনের প্রণয় নির্ভরতার ফল ও আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিন্যাস অনুযায়ী সম্পর্কের পরিণতি উপন্যাস দুটির বিশেষ প্রপঞ্চ হয়ে উঠেছে। সমকালের অন্যান্য ঔপন্যাসিকের তুলনায় আকিমুন রহমানের উপন্যাসের নর-নারীদের মানসগঠন অনেক বেশি কামনির্ভর। গতানুগতিক যৌনতত্ত্ব ও নীতির অনুশাসনে উপন্যাসের চরিত্রসমূহের সম্পর্কসূত্র ব্যাখ্যা করা কঠিন। তিনি নারীর সঙ্গে পুরুষ এবং নারীর সঙ্গে নারীর বিবিধ সম্পর্কের বিভিন্ন দিক উন্মোচনের মধ্য দিয়ে তাদের জৈব-মানবিক সত্তাকে মূল্যবোধাশ্রয়ী প্রথাগত সমাজের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। এই প্রবন্ধে *পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে* ও *রক্ত পুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি* উপন্যাসে নর-নারীর সম্পর্ক বিষয়ে লেখকের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত মূল্যায়নে সামাজিক সংস্কৃতির প্রভাব ও মনোবৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধানের প্রয়াস রয়েছে।

চাবি শব্দ : আকিমুন রহমান, উপন্যাস, নারী-পুরুষ সম্পর্ক।

স্বাধীনতাত্তোর সময়ের বাংলা কথাসাহিত্যে প্রগতিশীল ধারার লেখক আকিমুন রহমান। পুরুষকে প্রতিপক্ষ না ভেবে পরিপূরক ভেবে আসা আকিমুন রহমানের উপন্যাসে ব্যক্তির অস্তিত্বজনিত সংকট, মানবিকবোধের উচ্চকিত ধারণা ও নিঃসঙ্গতার মতো অসহ্য যন্ত্রণার প্রচলসত্য খুঁজে পাওয়া যায়। লেখালেখির শুরু থেকেই তিনি প্রজন্মান্তর ধরে চলে আসা নারী ও পুরুষের আর্থ-সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্কের মধ্যে বৈষম্যময় অস্বস্তিকর প্রসঙ্গগুলোকে চিহ্নিত করে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চেয়েছেন নারীর শরীরকেন্দ্রিক নানাবিধ ট্যাবু, সামাজিক শৃঙ্খলা নির্মাণে পুরুষের ভূমিকা, নর-নারীর সম্পর্কে নারীর অধিকার স্থাপনের প্রক্রিয়া। 'ব্যক্তির বর্হিলোক ও অন্তর্লোক নির্মাণে আকিমুন রহমান কল্পনা নয় নির্ভর করেন বাস্তবভিত্তির ওপর।'[১] সংসারে নর-নারীর সম্পর্ক যাপনের প্রথা, কর্মক্ষেত্রে নর-নারীর লিঙ্গভিত্তিক মূল্যায়ন ও পরিবার-ধারণার প্রথাগত চিন্তায় তিনি সমাজের একেবারে প্রান্তীয় অঞ্চলসমূহ হতে দেখেছেন হাজার বছর ধরে চলে আসা সামাজিক শাসনের অসংগতিময় রূপের অপ্রতিরোধ্য প্রভাব। ব্যক্তিজীবনে তিনি শিক্ষক ও গবেষক। তাঁর সম্পর্কে বেগম আকতার কামাল বলেন, 'তিনি দায়িত্ব নিয়ে লেখেন। তিনি সমাজকে ভাঙতে চান। বর্তমানে নারী সম্পর্কে নতুন করে ভাবার সময় এসেছে। এই ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছেন আকিমুন রহমান।'[২] সাহিত্যে নারী-পুরুষের সম্পর্ক রূপায়ণে সামাজিক নীতির সত্যাসত্যের সঙ্গে প্রবৃত্তির যে

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়।

নিঃসংকোচ সহাবস্থান আকিমুন রহমান নিশ্চিত করেছেন তা *পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে* (১৯৯৭) ও *রক্তপুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি* (১৯৯৯) উপন্যাসদ্বয়ে ব্যক্তির অন্তর্জাগতিক ক্রোধ-প্রতিরোধ-আবেগ-ঘৃণা-অনুরাগের স্তর অতিক্রম করে হয়ে উঠেছে সম্পর্কসূত্রের এক অনবদ্য জীবনভাষ্য।

নীতি ও প্রবৃত্তি

নীতি শব্দটি দ্বারা ন্যায়সংগত বিষয় বা সমাজের কল্যাণকর বিধানকে বোঝানো হয়। সংঘবদ্ধ হয়ে সমাজে বসবাস করার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের কিছু আচরণ ও অভ্যাস নিন্দিত ও কিছু আচরণ ও অভ্যাস প্রশংসিত হয়। কল্যাণকর ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে মানুষকে যেসমস্ত সামাজিক সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা মানতে হয়, সেই নির্দেশাবলির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সত্যই নীতি বা Ethics। নীতির তত্ত্বীয় বিশ্লেষণ, নৈতিকতা সম্পর্কিত নানা প্রসঙ্গ নীতিবিদ্যা নামে দর্শনশাস্ত্রে আলোচিত হয়। দার্শনিক William Lillie নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন :

> We may define Ethics as the normative science of the conduct of human beings living in societies a science which judges this conduct to be right or wrong, to be good or bad, or in some similar way.[৩]

ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, উচিত-অনুচিত, কর্তব্য-অকর্তব্য, ভুল-শুদ্ধ, বাস্তব-অবাস্তব, মঙ্গল-অমঙ্গল, সুন্দর-কুৎসিত, ইত্যাদি বিষয়ক সকল প্রশ্ন ও সমস্যা সমাধানের প্রয়াস রয়েছে নীতিবিজ্ঞানে। সমাজে এক ব্যক্তির প্রতি অপরের 'নৈতিক বাধ্যবাধকতা' না থাকলে সৃষ্টি হয় সামাজিক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি। মানুষের নৈতিকতাবোধের সমান্তরালে অবস্থান প্রবৃত্তির। মূলত, যে আদিম ও মৌলিক চাহিদাগুলো আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত করে, মানসিক শক্তি (Psychic energy) রূপে কাজ করে, ফ্রয়েড তারই নাম দিয়েছেন প্রবৃত্তি বা Instinct। প্রবৃত্তি দুই ধরনের : ১. কাম প্রবৃত্তি বা Eros, ২. মরণ প্রবৃত্তি বা Thanatos। Eros বা কাম প্রবৃত্তি আমাদের মনে অন্য ব্যক্তি ও বিষয়ের প্রতি মিলনের আকাঙ্ক্ষা (erotic desire) সঞ্চার করে।[৪] নৈতিক জীবনের লক্ষ্য নিরূপণের ক্ষেত্রে Instinct বা সহজাত প্রবৃত্তির রয়েছে সীমাহীন কর্তৃত্ব। দার্শনিক প্লেটোর মতে 'যখন আমরা যুক্তি এবং বুদ্ধি দিয়ে আমাদের আবেগপ্রবণ পশুবৃত্তিটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তখন আমরা এই Ethical Virtues বা নৈতিকগুণের সন্ধান পাই।'[৫] এই Ethical Virtues তৈরি করে সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি। সম্পর্কভেদে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রবৃত্তিক ও নৈতিক আচরণের প্রকাশ দেখা যায়। নারী-পুরুষ সম্পর্ক একই সঙ্গে নৈতিক এবং প্রবৃত্তিগত। বাধ্যবাধকতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য ছাড়াও নারী ও পুরুষ সম্পর্কের মধ্যে চলমান স্নেহ, শ্রদ্ধা, বন্ধুত্ব, ঈর্ষা, ক্রোধ, জিঘাংসার মতো অনুভূতি বিশ্লেষণের প্রয়াস থেকেই সাহিত্যতত্ত্বে সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক এ প্রসঙ্গগুলো আলোচনাযোগ্য হয়ে ওঠে।

নারী-পুরুষ সম্পর্ক: নানামাত্রিক দৃষ্টিকোণ

সমাজ সংগঠনে নারী-পুরুষের যৌথ ভূমিকা অনিবার্য। সৃষ্টির শুরু থেকেই নর ও নারীর সম্পর্ক রূপান্তরশীল। তাদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার অন্বয় প্রথমত নৃ-তাত্ত্বিক। সামাজিক প্রয়োজন অনুসারে সে সম্পর্ক ধর্মীয়, মনস্তাত্ত্বিক এবং সবশেষে রাজনৈতিক সম্পর্কের ভিত্তিতেও

ব্যাখ্যা করার উপযোগিতা তৈরি হয়েছে। নারী-পুরুষ সম্পর্কে নীতি ও প্রবৃত্তির চর্চা পুরুষ ও নারীভেদে দেখার দৃষ্টি ভিন্ন। দুই দেখার মধ্যে সারগত, পদ্ধতিগত, কাঠামোগত ও তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য সুস্পষ্ট। নারীর নৈতিকতা, প্রবৃত্তিগত চাওয়ার সঙ্গে পুরুষের প্রতি যত্ন, আবেগানুভূতির মূল্যায়ন ও সহানুভূতিশীল আচরণ জড়িত। অন্যদিকে নারীর প্রতি পুরুষের নৈতিকতা ন্যায্য অধিকার ও কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। নারী-পুরুষ সম্পর্ক তত্ত্বীয় সকল শাখায় 'লিঙ্গ বৈষম্য' (gender discrimination) অভিধায় আলোচিত হয়। নৃবিজ্ঞানীদের দ্বারা পুরুষ আধিপত্যের ইতিহাস আবিষ্কারে 'Sex' এবং 'Gender' শব্দ দুইটির অর্থগত পার্থক্যের মধ্য দিয়ে লিঙ্গ বৈষম্যের বিষয়টি প্রথম আলোচনায় আসে। ইংরেজি শব্দ 'Sex' অর্থ মানুষের জৈবিক পরিচয়, অন্যদিকে 'Gender' অর্থ প্রজননগত পরিচয়। মাতৃতান্ত্রিক যুগে নর-নারীর সম্পর্কের সাম্যাবস্থা থাকলেও ধনতান্ত্রিক যুগে এসে নারীর জৈবিক পরিচয় প্রজননগত পরিচয়ের কাছে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই পুরো প্রক্রিয়াটি 'পিতৃতন্ত্র' নামক রাজনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে শ্রম-বিভাজন ও ক্ষমতার কাঠামোয় নারীর দ্বিতীয় অবস্থান নিশ্চিত করে তাকে নিম্নবর্গে ঠেলে দিয়েছে। নর-নারীর বহুরূপ সম্পর্কের মধ্যে এমন কিছু সম্পর্ক রয়েছে যেখানে সকল ধর্মমতেই প্রবৃত্তিগত চিন্তা অকার্যকর। পবিত্র কোরাআনের সুরা নিসায় বলা হয়েছে:

> তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে তোমাদের মাতা, কন্যা, ভগ্নী, ফুফু, খালা, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়ী, দুগ্ধ-মাতা, দুগ্ধ-ভগিনী, শাশুড়ী ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাহার সহিত সংগত হইয়াছে তাহার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তাহার গর্ভজাত কন্যা, যাহারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে।[৬]

সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই সম্পর্কগুলো নৈতিক জীবনচর্চার ভার বহন করে। আবার নর-নারীর মধ্যে বিদ্যমান কিছু সম্পর্কের সম্পূর্ণ ভিত্তিই সামাজিক। প্রতিবেশী, সহপাঠী, সহকর্মী, সহযাত্রী, নিকটাত্মীয় বা স্বল্প পরিচিত নর-নারীর সম্পর্কের মধ্যে সৌজন্যবোধই নৈতিকতা, সেখানে অপরপক্ষের আগ্রহ বা অনুমতি ব্যতিরেকে প্রবৃত্তিগত আচরণ প্রকাশ নিপীড়নের নামান্তর। তবে এও সত্য 'পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সাধারণভাবে গৃহীত মতবাদ অনুযায়ী নারী-পুরুষের সম্পর্ক মূলত দেহভিত্তিক। নারীদেহ হলো পুরুষের কর্ষভূমি।'[৭] মনোবিজ্ঞানীগণও নর-নারীর সম্পর্কের ভিত্তিতে যৌনতাকে রেখেছেন প্রধান বিচার্যে। রাষ্ট্র ও সমাজভেদে যৌন সম্পর্কে রয়েছে বিবিধপ্রকার বৈধ-অবৈধতার বিচার্য মান। এদেশের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ, সামাজিক সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রদর্শনে বিবাহ-বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক স্বীকৃত নয় এবং বিয়েকে মনে করা হয় স্বামীর কামপূরণের স্থায়ী চুক্তি। কামনির্ভর সম্পর্কের মধ্যে দাম্পত্য ও পরকীয়ার প্রসঙ্গ সর্বাগ্রে আলোচনাযোগ্য। আবার দেহগত সম্পর্ক অনুপস্থিত রেখেও নর-নারীর মধ্যে ভাবাবেগপূর্ণ হার্দিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার স্বাভাবিক প্রবণতা সকল সময়, সকল সমাজের মধ্যেই প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু সামাজিক রীতির ভিন্নতা অনুসারে কোনো কোনো সমাজে বিবাহপূর্ব প্রণয় তথা যৌন সম্পর্ক বিগর্হিত ও নিন্দনীয়। প্রাক্-বৈবাহিক প্রেম ও যৌনতা ইউরোপীয় সমাজে সাধারণভাবে সমর্থিত হলেও প্রাচ্যদেশীয় সমাজে এটি পাপ বলে বিবেচিত। যদিও 'আধুনিক শিক্ষা এবং বিয়ে ও যৌন আচরণ বিধি পশ্চিমা প্রকল্পের অংশ। কিন্তু এ কথার অর্থ এই নয় যে, গোটা ব্যাপারটাই পশ্চিমা ষড়যন্ত্র।'[৮] বাংলাদেশের সমাজ দর্শনে পুরুষের প্রভাবশালী স্বভাবধর্ম এদেশের নর-নারী সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছে। নারীর এই অবনত রূপ

কেবল বর্তমান সময়ের নয়। *মনু সংহিতায়* বলা হয়েছে 'পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্ত রক্ষতি যৌবনে। রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্র ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'[৯] অর্থাৎ কুমারীকালে পিতা, যৌবনে স্বামী ও বার্ধক্যে পুত্ররা রক্ষা করবে নারীকে; নারী স্বাধীনতার অযোগ্য। স্নেহ, মমতা ও কর্তব্য, সম্পত্তি বণ্টন, নিরাপত্তা দানের বাঁটোয়ারায়ও নারীর এই মূল্যমানহীন অবস্থাই দৃশ্যমান। এই পরিণতি পুরুষের উপার্জন সক্ষমতা ও নারীর গৃহাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষের লৈঙ্গিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত করেছে। নর-নারীর সম্পর্কের বিবিধ প্রপঞ্চের সংঘাতময় অবস্থান চিহ্নিতকরণে অগ্রগণ্য ভূমিকায় আছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতাত্তোর কথাসাহিত্যিকগণ। সমকালের অন্যদের মতোই আকিমুন রহমানও *পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে* (১৯৯৭) ও *রক্তপুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি* (১৯৯৯) উপন্যাসে অনুসন্ধান করেছেন কামসক্ষম নারী ও সুযোগসন্ধানী পুরুষের মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্কের ব্যক্তিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতি। বাদ পড়েনি ধর্মীয়-রাজনৈতিক জটিলতা; সর্বোপরি মনোবিকলন, যৌনতাবোধ আর শেষত নারীর আত্মগত পরিচয়ে উন্নীত হবার সর্বগ্রাসী প্রবণতা।

পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে : হৃদয়হীন প্রবৃত্তির আখ্যান

'আমার ভেতরে অফুরান করে দেয় ইতর আঁধার ডিঙোবার ক্রোধ'[১০]—*পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে* উপন্যাসের উৎসর্গ পাতায় এভাবেই নিজেকে প্রতিস্থাপন করে এক নারীর জীবনে বুনো পুরুষের নির্মমতাজাত নিরুক্ত বক্তব্যের অনুচ্চার্য বহুতর বিপন্নতার সঙ্গে নিজের আত্মসত্তার অভিন্ন রূপ অনুভব করেছেন আকিমুন রহমান। তীক্ষ্ণ মনোবীক্ষণের দুঃসহ বোধে বিধ্বস্ত উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শামীমা। তার যে পৃথিবীতে বিচরণ সে পৃথিবীতে পুরুষ পরিচয়ে নিয়ত বদলে যায় ছেলেবন্ধু, ভাই, মামা, স্কুলের শিক্ষক, মায়ের স্বামী; পিতা। শামীমা জেনেছে প্রভুতুল্য স্বামীর নির্দেশ পালন ও গৃহকর্মে নিপুণা হয়ে ওঠার সঙ্গে যমজ পুত্রসন্তান জন্মদানের পরিপ্রেক্ষিতে তার মা সংসারের একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হয়ে ওঠার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। পিতার সঙ্গে তার নৈতিক সম্পর্কের অংশীদারত্বও এমন : জন্মের পর পরই 'তরুণ পিতার মুখ অপমানে ও আশাভঙ্গের যন্ত্রণায় অন্ধকারে ছেয়ে যায় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সে চাকুরিস্থলে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে।'[১১] বাঙালি সমাজে পুরুষের স্ত্রী গ্রহণের সারকথাই মূলত এই পুত্রলাভ। 'ঐতেরেয় ব্রাহ্মণ সেই নারীকেই উত্তম বলে যে নারী তার স্বামীকে সন্তুষ্ট করে, পুত্র সন্তান জন্ম দেয় এবং স্বামীর কথার ওপর কথা বলে না।'[১২] শামীমার পিতা অফিস থেকে ফিরেই তার ছোট ভাই রতন ও খোকাকে পড়তে বসায়, শামীমা বই খাতা নিয়ে কাছে দাঁড়িয়ে যখন বলে 'আব্বা আমিও পড়ব'[১৩], প্রতিউত্তরে তিনি বলেন, 'তুই আর ঝামেলা বাড়াইস না ত'[১৪]। কার্যত, পারিবারিক প্রতিবেশে পিতার নিকট থেকে অপর দুই সহোদরের মতো সমান মমতা ও আশ্রয় পাবার অধিকার তার জন্য ছিল অনভিপ্রেত। শামীমার স্বাভাবিক চলার গতিবিধিতেও মুহূর্মুহূ কড়া শাসন প্রকাশ, অযাচিত হুংকারই ছিল কেবল পিতৃত্বের কর্তব্য। তার এরূপ আচরণ যতটা ব্যক্তিতান্ত্রিক তারচেয়ে বেশি সমাজতান্ত্রিক। যদিও বাৎসল্যের টানই পিতা-পুত্রীর সম্পর্কের শেষ গন্তব্য হওয়ার কথা কিন্তু আমাদের সামাজিক ব্যবস্থায় কন্যাকে যথাসময়ে পাত্রস্থ করার সমস্যা, তার শরীর ও মনের সুরক্ষা দানের প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে তাকে প্রায়ই পিতার গলগ্রহ মনে করা হয়। এছাড়া ধর্মীয় বিধান মতে পুত্র-নির্ভর সম্পত্তি বিলি-

ব্যবস্থায় বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের সঙ্গে পিতা-মাতার অবস্থানজনিত রীতি কন্যাকে রেখেছে আরো পশ্চাৎপদ। কারণ :

> ব্যক্তিগত সম্পত্তির শুরু যে নারীকে মালিক করতে পারেনি তার কারণ সম্ভবত এই যে, নারী তার আগেই পরাজিত, শৃঙ্খলিত হয়েছে। নারীর সন্তানকে এবং সেহেতু নারীকে পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করা এবং সমাজের সম্পদ কর্তৃত্বশালী পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করাটা তাই পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।[১৫]

স্বভাবতই বৈষম্যময় এই পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া শামীমাদের ভুগতে হয় নানাবিধ শোষণ তাচ্ছিল্য ও অমর্যাদায়। *পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে* উপন্যাসেও এর অন্যথা হয় না।

শামীমার বঞ্চনা, প্রত্যাশা, নিঃসঙ্গতার সঙ্গে অনিবার্যরূপে জড়িয়ে আছে নারীপ্রসঙ্গ। শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে এলে নারী জন্মের দুঃসহ অবস্থান শামীমাকে যে জগতে ছুঁড়ে মারে সে জগতে তার গোপন অনালোকিত অধ্যায় প্রতিমুহূর্তে পরিবারে অবস্থানরত ও আগত অপরাপর পুরুষের দাঁত নখ চোখ ও ক্রূর চাহনি দ্বারা হয় বিদ্ধ। সামাজিক নির্মাণে এমনকি রক্ষণশীল গণ্ডিবদ্ধ পরিবারেও নারীর জন্য সামান্য স্থান রাখা হয়নি যেখানে নারীর গোপন বিষয়গুলো শুধু নারীর থাকে। বিকৃত পুরুষ অলিখিত প্রভুত্বের অধিকারে নারীর সংবেদনশীলতায় বপন করে ঘৃণার বীজ। শামীমার শিক্ষালাভের পথে সংগ্রামে আয়ত্ত করা যে গৃহশিক্ষক মফিজ, সেও শামীমার সঙ্গে নৈতিক সম্পর্কের ভিত্তি সুদৃঢ়করণে আগ্রহী হয়ে ওঠেনি। প্রবৃত্তি তাকে তার আদর্শিক জায়গায় স্থির হতে দেয়নি বলেই পুরুষতান্ত্রিক পেষণে শামীমার শরীর ও মনকে আহত করে মফিজ নামক নরপশু। শামীমা বীজগণিতের মুখস্থ সূত্র বলতে গেলে মফিজ তা শোনে না, বরং গণিত রেখে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান খুলে 'ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা ছুতোয় ফেনিয়ে ওঠে- ব্রেসিয়ার শব্দটি উচ্চারণ করে চলেন।'[১৬] তার ভাই, বন্ধু, প্রতিবেশী সকল পুরুষের কাছেই সে জলজ্যান্ত প্রবৃত্তির আগুন। তার মহাবন্ধু নান্টু, দুপুরে তার বাবার টিফিন নিতে আসা পিয়ন সামাদ সকলেই কোনো না কোনোভাবে শামীমার খোলা গলায় আঙুল ঘষে লালায়িত জিভের জড়ানো রসনায় চরিতার্থ করে বিকৃত যৌনতার স্বাদ। সমালোচকগণ মনে করেন :

> নারীর প্রতি আগ্রাসী হতে গিয়ে যে-প্রবণতাটি পুরুষের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে সেটি হচ্ছে নারীনির্যাতন। নারী নির্যাতনই হচ্ছে মূলত যৌনবাদ; যৌনবাদে উগ্র যৌনতারই প্রাধান্য, মানবিক সম্পর্কের নয়।[১৭]

বড় হতে হতে প্রতিনিয়ত এসমস্ত প্রবৃত্তিগত পীড়ন শামীমার মনোজগতে সৃষ্টি করে পুরুষকেন্দ্রিক ট্রমা। মানসাঘাত বা psychic trauma হচ্ছে ব্যক্তির অবচেতনে সঞ্চিত হওয়া অস্বাভাবিক ঘটনার বিরূপ প্রতিক্রিয়া।[১৮] ফলে, দরজা বন্ধ না করে ঘুমুতে না পারা শামীমা কেবলই অনুভব করে তার চারপাশে জমাটবাঁধা অজস্র পুরুষ নারীভোগের জন্যই অপেক্ষমাণ। জীবনের প্রয়োজনে তাকে যখন যেতে হয় গ্রাম থেকে শহরে, তখন বাসের মধ্যে কারো একটি কনুই খুঁজে বেড়ায় শামীমার অন্ধিসন্ধি, কেউ ঘুমের মধ্যে মাথা হেলিয়ে দেয় তার ওপর। কর্মজীবনের স্ব-উপার্জন শামীমাকে সুখী করলেও সহযোগী রূপে সহকর্মীর প্রতি সহকর্মীর যে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ, সংবেদনশীলতার প্রত্যাশা তা তার জীবনে বাস্তব হয়ে ওঠেনি। পথশিশুদের নিয়ে কাজ করা শামীমাদের সংগঠনটি দৃশ্যত মানবিক প্রতিষ্ঠান হলেও কিশোরী মেয়েদের সাময়িক অবস্থানের জন্য 'ড্রপ ইন সেন্টার'

খোলার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যানেজারের কিশোরীদের এবিউজের ঘটনা তাকে হতবাক করে। মেয়েরা তাকে জানায় : 'ম্যানেজার ভাইয়ায় খালি আমাগ বোক টিপে। আমারটা টিপে, পারুলিরটা টিপে, বেদেনারটা টিপে, যখন যারটা টিপতে মোন চায় হেরে কাছে নিয়া হগলতেরে দেহাইয়া দেহাইয়া টিপতে থাকে।'[১৯] পুরুষের এই অনৈতিক যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে একা দাঁড়ায় শামীমা, জড়িয়ে পড়ে নারী-পুরুষকেন্দ্রিক লৈঙ্গিক দ্বন্দ্বে। কো-অর্ডিনেটরের কাছে অভিযোগনামা জমা দিলে তাকেই উল্টো ষড়যন্ত্রী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরের কাছ থেকে পেতে হয় শোকজ লেটার, চাকরিচ্যুতির হুমকি। উপরমহলের তদন্তের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্তকে যখন সাময়িক বরখাস্ত করা হয় তখন তার প্রজেক্টের কো-অর্ডিনেটর তার পুরুষ সহকর্মীর প্রতিই সহমর্মী হয়ে ওঠেন। এবং বলেন 'এই হুট কইরা ম্যানেজার ভাইরে বরখাস্ত করলে ওয়াইফের কাছে তার প্রেস্টিজ কই থাকে। সে কি কজ দেখাইব ফ্যামিলিতে? স্যার এ মানবিক দিকগুলা কনসিডার করেন।'[২০] কিন্তু উর্ধ্বতন কর্মকর্তা যখন ন্যায়সংগত বিচারে ম্যানেজারকে বহিষ্কার করে শামীমাকে ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজারে পদায়ন করেন, তখন তার বিরুদ্ধে রটানো হয় কুৎসা। শামীমাকে তার কাজের বুয়া বলে :

> আফা গোফন কথা হোনেন। কোঅর্ডিনেটর বাই আফনের নামে কুকথা কইতাছে। হগলতের কাছে। হেয় দারোয়াননরে কইছে আফনে বোলে শইল দিয়া বিগ বসরে কাইত করছেন। হগলতেই কইলাম এই কথা বিশ্বাস করতাছে।[২১]

সাধারণত আমাদের সমাজে পুরুষের সঙ্গে পুরুষ যে আচরণ করে একই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নারীর সঙ্গে করে সম্পূর্ণ ভিন্ন আচরণ। এর কারণ মনস্তাত্ত্বিক। মূলত :

> মেধা ও প্রতিভার মধ্য দিয়ে কর্মক্ষেত্রে ছাড়িয়ে গেলেই পুরষের পৌরুষত্ব মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। নারী সেজেগুজে নিজেকে প্রদর্শন করলে তাতে মেধা নয়, নারীর শরীর, অর্থাৎ যৌনতা প্রধান হয়ে ওঠে; পুরুষ নারীকে এই রূপেই দেখতে চায়। কিন্তু আপন প্রতিভা ও মেধার গুণে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হবে, এতেই পুরুষের যত আপত্তি।[২২]

অন্যদিকে চাকরির সুবাদে আসা নতুন পরিবেশে শামীমা তার আবাসিক স্থানটিকে নির্ঝঞ্ঝাট রাখতে পারে না। ভুঁড়ি বের করা উদোম শরীরের হোদল কুতকুতে চেহারার বিচিত্র পুরুষ, বিচিত্র সময়ে ঠোঁটে সিগারেট গুঁজে, গলায় পাউডার মেখে, হাঁটুর উপরে লুঙ্গি তুলে, ঘেমো শরীরে লাইফবয়ের দুর্গন্ধ সমেত এসে পরিচয় দেয়— 'আমি আপনের নেইবার।'[২৩] শামীমাকে দেখে শুনে রাখা একজন রক্ষক পুরুষের অভাবে এরূপ উটকো অতিথিদের আনাগোনায় ভারী হয়ে ওঠে শামীমার চারপাশ। অবশেষে পুরুষের জগতে পুরুষের অসহযোগিতায়ই শামীমা উপলব্ধি করে তার একজন ব্যক্তিগত পুরুষ প্রয়োজন।

শামীমার জীবনে পুরুষের প্রতি নারীর যে নৈকট্যের অনুভূতি, যে প্রেম—তা মনিরুল নামক এক বিশেষ মানুষকে ঘিরে প্রথম প্রস্ফুটিত হয়। পেশায় দন্ত-চিকিৎসক মনিরুলের রসবোধ, লোকসমাজে সাবলীল থাকার ভঙ্গি ও শামীমার প্রতি আলাদা মনোযোগ শামীমার নৈঃসঙ্গ্যলোক আলোড়িত করে। পরবর্তী সময়ে 'কি সুইট একটা মুখ'[২৪] 'কি ফাইন একটা ফিগারে'[২৫]র মতো স্তুতি 'প্রেম' নামক অনুভূতিতে শামীমাকে পুরোপরি গ্রাস করে। প্রেম প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানী হ্যাভলক এলিস (১৮৫৯-

১৯৩৯) তাঁর *Studies in the Psychology of Sex* (1933) গ্রন্থের একটি মন্তব্য এখানে প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন, 'সাধারণভাবে যৌন আবেগের অভিব্যক্তি যখন প্রশংসাত্মকরূপে প্রকাশ পায় তখন তাকে প্রেম বলা হয়।'[২৬] বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) *কৃষ্ণকান্তের উইল* (১৮৭৮) উপন্যাসে যাকে 'এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে–এ ভোগ, এ সুখ নহে–এ মন্দার ঘর্ষণ পীড়িত বাসুকি নিঃশ্বাস নির্গত হলাহল, এ ধন্বন্তরি ভাণ্ড নিঃসৃত সুধা নহে।'[২৭] বলেছেন, অনুরূপ রূপের আড়ালে পাত্র-পাত্রীর কামতৃষ্ণার প্রকাশ বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল উপন্যাসেই কম-বেশি দেখা যায়। আকিমুন রহমান নারী-পুরুষের এ দিকটা এড়িয়ে গেলেও পুরুষের প্রবৃত্তিগত অনুষঙ্গে নারীর রূপকে তিনি ব্যবহার করেছেন ভিন্ন দিক থেকে। আজীবন কুরূপের জন্য ভর্ৎসনা, তাচ্ছিল্য, বিয়ে না হওয়ার দুঃখ শামীমা ভুলে যায় কামুক পুরুষের চাতুরিময় স্তুতিতে। প্রথম চুম্বনে অস্বস্তি হলেও শরীরের ডাকে ছেড়ে দেয় অপর শরীর, অতপর শামীমা ভাবে :

> তাহলে ভালোবাসা, এতোদিনে তোমার আসার সময় হলো আমার কাছে! আমার গ্রীবা গর্ব ও পুলকে ফুলে ওঠে। ঘৃণায় আমার শরীর তপ্ত হয়ে ওঠে। এইভাবে, এমনভাবে এমন টেনেহিঁচড়ে চটকে মটকে আসে নাকি প্রেম![২৮]

নারী ও পুরুষভেদে প্রেমের রূপ আলাদা। পুরুষ প্রেমকে দেখে দূরবর্তী অবস্থা থেকে, নারী তাকে ধারণ করে সমস্ত সত্তায়—একারণে *পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে* উপন্যাসে শামীমা ও মনিরুলের প্রেমে পড়ার স্থিতি, সংকট ও বিচ্ছেদ লিঙ্গভেদে আলাদা আলাদা গন্তব্যে পৌঁছে। শামীমার শরীর পছন্দ করতে শুরু করে মনিরুল। সম্পর্ক টেনে নেওয়ার নৈতিক কর্তব্য, যত্ন ও গুরুত্ব একা পালন করে শামীমা। মনিরুলের ঔদাসীন্য, তাচ্ছিল্য, শরীরের ওপর স্বৈর-আধিপত্য তাকে আহত করলেও মনিরুল নামক প্রভুকে বাঁধা দেওয়ার সাধ্য ছিল না শামীমা নামক নিগৃহীতার। ফলে প্রেমিক পুরুষের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস তাকে দীর্ঘমেয়াদি প্রতারিত হওয়া বিস্বাদময়জীবনের দিকে ঠেলে দেয়। অচিরেই শামীমা তার শরীরে টের পেতে থাকে নতুন প্রাণের, কিন্তু চতুর মনিরুল সে দায় অস্বীকার করে। বহুগামী, শঠ, প্রতারক সম্বোধনে শামীমাকে বাধ্য করে ওই সামাজিক স্বীকৃতিহীন সম্পর্কের চিহ্ন অপসারণে। শামীমা চেয়েছিল তার অনাগত সন্তান পৃথিবীর আলোয় আসুক, প্রণয়ীর সঙ্গে দাম্পত্যের সূচনা হোক এই অনাগতার মধ্য দিয়েই কিন্তু উপায়হীন শামীমাকে মনিরুল ঠেলে দেয় সমস্তরকম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে একা লড়াইয়ে। সামান্য মমতা, সহানুভূতির চিহ্ন তার প্রেমিক পুরুষের মধ্যে ছিল না। বরং এই অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণের সময়টিকে সে ব্যবহার করে তার উপচে পড়া হিংস্র লালসা চরিতার্থের সুবিধা হিসেবে। ফলে শামীমাকে প্রেমিক কর্তৃক ধর্ষিত হতে হয় গর্ভকালীন সময়েও। যৌন-বৈকল্য বা Sexual Disorder-এর একটি নিন্দনীয় রূপ এরূপ ধর্ষণ (Rape)। যৌন-ধর্ষকামী (Sexual Sadist) ব্যক্তিরা এরূপ পর্যায়ে যৌনসঙ্গীকে অপরিসীম যন্ত্রণা দিয়ে থাকে, এর নেপথ্যে থাকে ব্যক্তির অধিকারবোধের বহিঃপ্রকাশ ও প্রবৃত্তিগত সুখভোগের বিকৃত প্রকাশ।[২৯] গর্ভবতী ধর্ষিতা শামীমার নতজানু করুণ আর্তি অবশেষে যে আলেখ্যে পৌঁছায় উপন্যাস থেকে তার বর্ণনা :

> আমার শরীর, আমি তোমাকে মেনে নিতে বাধ্য করেছি কী বিপুল দুর্দশা। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমার শরীর, আমি তোমাকে সহ্য করতে বাধ্য করেছি কতো ইতরের দলন-পীড়ন। আমি তোমাকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছি। আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো। [...] এক জ্যান্ত খুদে মাংসপিণ্ডের জন্যে তোমাকে মেনে নিতে চাপ দিয়েছি

> মানুষ হয়ে উঠতে ব্যর্থ হওয়া এক বিকারগ্রস্ত জন্তুর বিকৃতি আর লালসার পীড়ন। তুমি বাঁচো এবার অগাধ সুস্থতার ভেতর। বাঁচো মানুষ বাঁচো তোমার পৃথিবীতে।[৩০]

আপাতদৃষ্টিতে *পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে* উপন্যাসে নারী ও পুরুষের সম্পর্কের পরিণতিতে পুরুষের প্রবৃত্তিসীমায় বিচরণরত নারীর জীবনব্যাপী বার বার নিজের কাছে ফেরা ছাড়া অপর কোনো আশ্রয় চিহ্নিত হয়নি এবং সামাজিক নীতিশাসিত জগতে সম্পর্ক পরিচর্যায় সর্বংসহা নারীর নিজের প্রতি দয়ার্দ্র থাকার প্রেরণা ও নরের প্রতি অন্ধত্ব পরিত্যাগের উৎসাহ এ উপন্যাসে প্রতীয়মান করে তুলেছেন আখ্যানকার আকিমুন রহমান।

রক্তপুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি : প্রবৃত্তির শৃঙ্খলে আবদ্ধ নারী-পুরুষ

নারী-পুরুষ সম্পর্কের জটিলতা এবং সেই সঙ্গে নারী প্রবৃত্তির সাহসী প্রকাশ নিয়ে রচিত আকিমুন রহমানের *রক্তপুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি*। অসংগতিপূর্ণ প্রণয়ের বোধ, অপরিমিত ভোগাকাঙ্ক্ষা, যৌনতা ও যৌন বিকৃতিসহ নারী-পুরুষ সম্পর্কের নানাদিক উন্মোচিত হয়েছে উপন্যাসটিতে। জৈবিকতা নির্ভর হলেও *রক্ত পুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি* উপন্যাসে আপাত নিম্নস্থ, অর্ধ শিক্ষিত, খুঁতসমেত নারীর নৈতিক জীবন পত্তনের নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে উদগ্র প্রবৃত্তিগত স্পৃহা ও পুরুষ-নির্ভর জীবনব্যবস্থার ওপর আস্থা। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র পারভিন। তার নৈঃসঙ্গ্যপীড়িত আত্মার অন্তর্ধ্বনিতে উপভোগ্য প্রণয় ও দাম্পত্য অপ্রাপ্তির হাহাকার উপন্যাসের শুরুতেই স্পষ্ট হয় :

> এই যে আমি, আমি এক মেয়ে। আমার বয়স চল্লিশ বছর। চল্লিশ বছর হলে মেয়েমানুষের জীবনের আর থাকে কি? আমার জীবনেও সব শেষ। আশা শেষ। চাওয়া শেষ। পুরুষকে পাবার দিন শেষ। চামড়ার টান শেষ। সব শেষ। অথচ দেখো আমার জীবন সংসারের কোনো নুনের স্বাদ পেলো না।[৩১]

একটা 'নুন' যাকে সুস্থ যৌন জীবনের প্রতিশব্দ মনে করা হয় পারভিনের তা না-হওয়ার আক্ষেপ প্রসঙ্গে হুমায়ূন আজাদের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> কিশোরীকে, তরুণীকে সমাজ একটিই স্বপ্ন দিয়েছে : পুরুষ। কিশোরও স্বপ্ন দেখে নারীর, কিশোরও কামনা করে নারী; তবে তা তার জীবনের খণ্ডাংশ। তরুণীর জীবনের সারকথা পুরুষ, যে পূর্ণ ক'রে তুলবে তার জীবন। এটা কোনো জৈব বিধান নয়; প্রকৃতি তাকে প্রতীক্ষার জন্যে প্রস্তুত করে নি, কিন্তু সমাজ তার জন্যে পুরুষের প্রতীক্ষাকে ক'রে তুলেছে অবধারিত।[৩২]

বাংলাদেশের পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষের আয়ের ওপর নির্ভরশীল পরিবারগুলোয় তাদের আর্থিক সংগতির সঙ্গে পরিবারে চর্চিত মান্য সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কৃতির ধারা নারী-পুরুষের অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের প্রকৃতি নির্ধারণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে। *রক্তপুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি* উপন্যাসে সমাজ প্রবণতা, নারী নিগ্রহের সঙ্গে পারিবারিক ক্ষুদ্রবলয়ে আবদ্ধ মানুষের প্রতিদিনের করণীয় আমাদের সমাজব্যবস্থার অনালোকিত প্রথা ও সংস্কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। পারভিনদের বাড়ি বান্ধা বাড়ি। পির-মুর্শিদ তাবিজ-কবজ, জাহেরী-বাতেনী, জ্বিন-পরি, পানি পড়ার মতো কুসংস্কারের প্রতি অন্ধ আনুগত্য দেখা যায় এ পরিবারের সকল সদস্যের। যদিও পির বা মুর্শিদ পূজার কল্যাণে বাড়ির ভিতর-বাহির সমস্ত কিছু ভালো হওয়ার কথা থাকলেও এ বাড়ির একমাত্র

মেয়ে পারভিন পয়াবন্ধ, ছেলে শাহআলম বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী, মা সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত সূতিকা রোগাক্রান্ত। সংসারবিমুখ, নারীমাংসলোভী, বেহিসাবি পারভিনের বাবা কাঁচামাল ব্যবসায়ী। বাজারের মেয়েমানুষ নিয়ে রাতকাটানো আর মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বুঁদ হয়ে থাকা ছাড়া বাদ-বাকি সবকিছুই তার গ্রাহ্য সীমানার বাইরে। মাতা, স্ত্রী, কন্যা, পুত্র কারো জন্যই তার ভেতরে নেই মমতার। গৃহাধীন নারীদের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়েই পারভিনের পিতার এরূপ নির্বিঘ্ন জীবন। মূলত 'শ্রেণীবিভক্ত সমাজের পুরুষতন্ত্র একরকম অভিভাবনের জোরেই নারীর চিন্তা ও আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে'।[৩৩] পারভিনের পিতৃগৃহেও এর অন্যথা নেই। নর-নারীর সুস্থ জৈব-মানবিক সম্পর্ক না-দেখা পারভিন বড় হয় মা ও বুজির মেয়েলি আচার শিক্ষা নামক পীড়নের মধ্য দিয়ে। বুজির মুখে থেকে শরীরের পাক-নাপাক শিখতে শিখতে হীনম্মন্য, নিঃসঙ্গ পারভিন এই সত্য জেনে যায় যে তার 'লোমে ছোমে ভরা শরীর দেখে দুনিয়ার কোনো সোয়ামিপুরুষ ঘিন্না না করে পারবে না।'[৩৪] নিজ শরীরের আকৃতি সন্ধানে পারভিন আরো আবিষ্কার করে তার একটি স্তন অন্যটির চেয়ে ছোট এবং একটি আঙুল অপেক্ষাকৃত অন্য আঙুলগুলোর চেয়ে বড়। এই অসংগতিপূর্ণ শরীর তার একান্ত অধিকারের পুরুষ প্রাপ্তির পথ বন্ধুর করে দেবে কিনা এই শঙ্কা তাকে ভীত করে। এবং প্রতিক্রিয়ায় অস্তিত্বজাত মনোবিকারবোধে পারভিন আগ্রহী হয় পুরুষহীন যৌনাচারে। ফলে ধর্মীয় মূল্যবোধ, সামাজিক অনুশাসনের আবেদন অগ্রাহ্য করে যৌনতা সম্বন্ধে কিছু না জেনেও পারভিন স্বমেহন ও সকামে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। মনোবিজ্ঞান মতে :

> আমাদের অবদমিত বিষয় আপত্তিজনক প্রবৃত্তিগত চাহিদার সঙ্গে যুক্ত থাকে। কখনও কখনও অবদমিত বিষয়ের প্রবণতা হয়, যে ঘটনার মাধ্যমে সে নিজেকে প্রকাশিত করতে পারে তার সঙ্গে যুক্ত না হতে পেরে, নতুন ঘটনাকে আশ্রয় করে তার মাধ্যমে প্রকাশিত হবার।[৩৫]

পারভিন নামক এই নারীর যৌনতার বিচিত্র অভিমুখগুলো পুরুষের সঙ্গে তার অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের মনস্তাত্ত্বিক কিছু কারণ উন্মোচন করে। পিতা-মাতার পরিচর্যা, পারিবারিক সংস্কৃতি তাকে পুরুষের সঙ্গে যে সুস্থ মানবিক সম্পর্ক দিতে পারতো সেসমস্তের অভাববোধই তাকে অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয়কাতর করে তুলেছে বলা যায়। ক্রমেই তার আগত যৌবনা শরীরে স্বাভাবিক যৌন-এষণায় বিপরীত লিঙ্গের স্পৃহা অনুভূত হয়। এ স্থলে পিতার শরীরই হয়ে ওঠে তার প্রথম উদ্দীপক। যৌনতার ক্ষেত্রে এরূপ বিকাশকে মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড 'ইডিপাস গূঢ়ৈষা' (Oeidipus complex) বলে অভিহিত করেছেন। 'যেহেতু মেয়েদের ইডিপাস-গূঢ়ৈষার সমাধান অসম্পূর্ণ থাকে, তারা একজন পিতৃকল্পকেই তাদের ভালবাসার বস্তু রূপে কামনা করে।'[৩৬] ফলে, পিতার স্পর্শসীমার কাছে গেলে কিংবা পিতার সঙ্গে মায়ের অন্তরঙ্গ দৃশ্যের নিকটবর্তী হলেই পারভিনের শরীর কামজ ক্রিয়ায় প্রণোদিত হয়। উপন্যাসে দেখা যায় :

> পানের ভেজা ঝাঁঝালো গন্ধ সিগারেটের গন্ধ, গোলাপজল আর ধুলোর গন্ধ– সব গন্ধ মিলে অই একজন– আব্বা! [...] আমার শরীর দুলে ওঠে। আহ-আমার শরীর মুচড়ে ওঠে। [...] আ আ–আমার শরীর কঁকায় দেখি-বস্তিপ্রদেশের নীচের কোন ভিতরে ঘূর্ণিপাক উঠছে দেখি! [৩৭]

আলাউদ্দিন আল আজাদের (১৯৩২-২০০৯) শীতের *শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন* (১৯৬২) উপন্যাসের বিলকিস বানুর গোপনে নিজের ছেলে খোকাকে সম্ভোগরত অবস্থায় দেখে প্রচ্ছন্নরতির

সুখ অনুভবের সঙ্গে পারভিনের এ অনুভূতিকে মেলানো যায়। কিন্তু দাম্পত্য প্রণয়ে মায়ের অপূরণীয় ব্যথার অংশটিও পারভিনের অজ্ঞাত থাকে না।–

> কালো উদ্দাম জিরজিরা আম্মায় দেখি দুই উদাম পা আছড়ায়–নিঃ মুরইদ্দা– নির্বংইশ্যা–পারস না–তুই পারস না–তর হেটামে কুলায় না–ত খায়েশ দেহাস–উদাম আব্বায় কাঁৎ হয়ে দেখি পড়ে থাকে ভোঁস ভোঁস-কথা বলে না।[৩৮]

উপন্যাসে পারভিনের পিতার পরনারী আসক্তি, বেশ্যাগমনের প্রসঙ্গ রয়েছে তাই তাকে পুরোপুরি যৌনবিমুখ বলা যায় না, বরং গৃহবিমুখ বলা যায়। তার এই গৃহবিমুখতার নেপথ্যে তাদের দাম্পত্য যাপনের পারিপার্শ্বিক আনন্দহীন অসুস্থ পরিবেশকে দায়ী করা যায়, কার্যত 'স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার প্রেমহীনতাই যৌন শীতলতা আনে বেশি।'[৩৯] পারভিন তার মাকে স্বামীর সংসার বৈরাগ্যে অসুখী হতে দেখেছে, মুখ নাড়াতে দেখেছে ক্রোধে, কিন্তু সংসার ছেড়ে যাওয়ার মতো মানসিকভাবে দৃঢ়, ব্যক্তিত্ববান হয়ে উঠতে দেখেনি। এর কারণ : 'ভারতে তথা বাংলায় স্বামী পরিত্যক্ত অসংখ্য স্ত্রীর উল্লেখ পাওয়া গেলেও স্ত্রীদের পক্ষে রুগ্‌ণ, মাতাল, অপারগ, অত্যাচারী কোন স্বামীর কাছ থেকেই স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব ছিল না।'[৪০] পারভিনের জীবনে ধর্ম ও সমাজ অস্বীকৃত প্রবৃত্তির বিকাশ ঘটে গৃহাভ্যন্তরেই। মায়ের যৌন অতৃপ্তির শব্দ তাকে প্ররোচিত করে বিচিত্রকামে। গৃহপরিচারিকার উদ্ভিন্না যৌবন দেখে পারভিন অনুভব করে নিষিদ্ধ সুখ।–

> ডুব দিয়ে গোসল সেরে ঘাটলার উপর দাঁড়ায় রাহেলা বুবু। বুকে থাকে এক প্যাঁচ ভিজা কাপড়। আঁচলের মাথা দিয়ে ভিজা চুল মোছে ঝাড়ে রাহেলা বুবু। মুছুতে মুছতে কাৎ হয়, পিছনে বাঁকা হয়, সামনে ঝোঁকে। ভিজা মোটা কাপড়ের নীচে দেখো কতো রকমের ভঙ্গী করে [....] দেখতে দেখতে আমার শরীরের মধ্যে আচানক হুড়াহুড়ি পড়ে যায়।[৪১]

এভাবেই শুরু হয় পারভিনের সমকামিতা পর্ব। রাহেলার সঙ্গে উপভোগ্য যৌনতা শেষে পারভিনের উপলব্ধি হয় নারীর জীবনে পুরুষই অনিবার্য। পুরুষকেন্দ্রিক তার যৌন অভীপ্সা প্রথম সত্যিকারের পরিণতিতে পৌঁছায় তাদের বাড়িতে আশ্রিত দাদাজানের পীরভাইয়ের ছেলে জুম্মা কাকার স্পর্শে। সংসার ধর্মে নারীকে প্রতিপালন, যত্ন ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা দান যদি যোগ্য সঙ্গীর কর্তব্য হয়ে থাকে তবে পারভিনের প্রতি সে কর্তব্য পালন করেছে জুম্মা কাকা। জুম্মা কাকার সঙ্গে পারভিনের সম্পর্ককে তাই দুই দিক থেকে ব্যাখ্যা করা চলে। প্রথমত, তার একক চেষ্টায় পারভিন 'ম্যাট্রিক' পাসের মতো দুর্গম পথ পাড়ি দিতে সক্ষম হয়েছে। দ্বিতীয়ত, তার 'ধরাধার্য' পদ্ধতির অব্যর্থ কৌশলে পর্যাপ্ত যোগ্যতা না-থাকা সত্ত্বেও পারভিন মিউনিসিপ্যালিটির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে পেরেছে। অংশত পারভিনের পরিবার প্রতিপালনের যে দায় তার পিতার ঘাড়ে ছিল তা বহুলাংশে পালন করেছে জুম্মা কাকা; ফলে পিতার প্রতি পারভিনের মোহগ্রস্ততা ধীরে ধীরে তার অবচেতন মনে শেকড় ছড়িয়ে পরিণতিতে পৌঁছায় জুম্মা কাকার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। একারণে জুম্মা কাকা যখন একলা ঘরে পারভিনকে দুই পায়ের ফাঁকে গেঁথে নেন, অস্থির চাঞ্চল্যে ছানতে থাকেন, তখন পারভিন ভাবে, 'নিজেরে নিয়া খেল, রাহেলা বুবুর সঙ্গে খেল–বড় পানসা, বড়ো ম্যাড় ম্যাড়ে।'[৪২] জুম্মা কাকার সঙ্গে শরীরের এ পরিণতিকে প্রবৃত্তিগত ক্ষুধা রূপে না দেখে পারভিন চেয়েছে সম্পর্কের নৈতিক স্বীকৃতি। মূলত, 'পারভিনের মনের গড়ন আর দশটা

বাঙালি মুসলমান মেয়ের মতোই। তাই পুরুষের সঙ্গে যৌন অভিজ্ঞতাকে বিয়ের রূপ দিতে চায়।'[৪৩] যদিও পিতার মতোই যৌন ব্যর্থতা জুম্মা কাকারও রয়েছে তবু একটা নুনের সংসার, একটু স্নেহময় পরিবেশের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠা পারভিন প্রত্যাখ্যাত হয় জুম্মা কাকার সামাজিক বিচারবোধের কাছে। পারভিন প্রতারিত হয়, একা হয়, বিচ্ছিন্ন হয় পুরুষ সঙ্গ থেকে। সবশেষে সুস্থ স্বাভাবিক বৈবাহিক জীবনের প্রতিশ্রুতিসমেত পারভিনের জীবনে সুলতান আলীর আগমন ঘটলে প্রথমে সে বিব্রত হয়, ধীরে ধীরে পুলকিত এবং সবশেষে বিপন্ন হয়ে সব হারায়। যৌনকামী পারভিনের পুরুষলিপ্সায় যে পাপবোধ তা আত্ম প্রতিষ্ঠাকামী সুলতান আলীর চাতুরিক আশ্বাসে থেমে যায়। শুষ্ক জীবনে নতুন পাতা গজানোর সম্ভাবনায় পরিচর্যাহীন পারভিন নিজেকে গোছায় আবার নতুন করে, শুধু সে একা নয়, বিকৃত, অসুস্থ সংসারে শেকলে আটকে থাকা বয়স্কা দাদি, অসুস্থ মায়ের কাছেও সুলতান আলী হয়ে ওঠে সৌভাগ্যের দেবতা। আর্থিক সামর্থ্যবান, প্রবাস ফেরত, সুদর্শন সুলতান আলী পারভিনকে সহস্রদিক থেকে মোহাবদ্ধ করে বিয়ের পূর্বেই তার ওপর প্রতিষ্ঠিত করে শারীরিক সম্ভোগের দাবি। পারভিনের কাছে এ প্রত্যাশা অযৌক্তিক নয়। কারণ তার পরিস্থিতি তাকে ভাবতে বাধ্য করেছে : 'কেউ যদি হবু বউয়ের কাছে শরীরের সুখ শান্তি চায়ই, বউ না দিয়ে পারে?'[৪৪] বিয়ের প্রলোভনে 'শরীরভোগ' নারী-পুরুষ সম্পর্কের খুব সাধারণ একটি চিত্র। বাংলাদেশের প্রচলিত আইন ও ধর্মীয় বিধান এই অনৈতিক সম্পর্ককে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিবেচনা করলেও প্রায়শই নারীদের আর্থিক-সামাজিক ও শারীরিক দুর্বলতাকে পুঁজি করে এই সুযোগ গ্রহণ করে থাকে পুরুষ। *রক্তপুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি* উপন্যাসে পারভিনের ক্ষেত্রেও এই অবস্থা দৃশ্যমান। অতঃপর পারভিন ছোট বংশের মেয়ে, পারভিন তার রক্ত চুষে খেয়ে শেষ করবে, পারভিনের স্তন একটি ছোট, আরেকটি বড়, সর্বোপরি 'যেই মাইয়ারে তু করতেই কাপড় খুইল্লা চিৎ হয় বিয়ার আগে, অরে আবার বিয়া করন লাগে নি?'[৪৫] এই অজুহাতে পারভিনের আজন্ম সংসার করার বাসনাকে ধূলিসাৎ করে অন্যত্র বিয়ের আয়োজন করে সুলতান আলী। তার এ একপেশে মনোভাবের সাযুজ্যে নারীবাদী লেখক তসলিমা নাসরিনের একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যায় :

> বাঙালি মেয়েদের জন্য 'সতীত্ব রক্ষা' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ একগামিতা শুধু নারীর জন্য অবশ্যপালনীয়, পুরুষের জন্য নয়। পরপুরুষসংগমে পাতিব্রত্য ধর্মের লোপ হলে সতীত্বনাশ হয়। সামাজিক বৈধতা অতিক্রম করলে নারীকে 'পতিতা' হতে হয়, কিন্তু পুরুষ যথেচ্ছাচারী হলে তাকে 'পতিত' হতে হয় না। একটি পুরুষ যত বহুগামী হোক না কেন, বিয়ে করবার বেলায় কুমারী ছাড়া নৈব নৈব চ।[৪৬]

সুলতান আলীর এ নির্মমতায় পারভিন হতচকিত হয়, ব্যথিত হয়, আত্মহত্যায় প্ররোচিতও হয়, কিন্তু প্রতিরোধী হয়ে উঠতে পারে না। এমনকি সুলতান আলীর শঠতা পারভিন গ্রহণ করতে না পারলেও তাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার নির্বাপিত হয় না। এ কারণে নিজের মাকে হত্যা করার পর, দাদির অন্ধ কুসংস্কারের প্রতি সমর্পিত হয়ে তুক-তাক, তাবিজ, কবজে পুনরায় সুলতান আলীকে নিজ জীবনে ফিরিয়ে আনার পথ খোঁজে। সুলতান আলীর পুনরাগমন ঘটেও। ফিরে এসেই পারভিনকে জানায় অন্যত্র বিয়েতে তার শরীরী পূর্ণতা ঘটেনি, প্রয়োজন পারভিনের অভ্যস্ত শরীর। ভরণপোষণ ও অন্যান্য সুবিধাদির বিনিময়ে সে পারভিনের কাছে প্রত্যাশা করে বিয়ে বহির্ভূত যৌন সম্পর্কের সমর্থন। বিমূঢ় এ আবেদনে মুহূর্তেই পারভিনের কাছে মিথ্যে হয়ে যায় মাজার, খাদেম, শরীর, সংসার, তাবিজ, কবজ, পির ও সুলতান আলীর অস্তিত্ব।—

> তারপর সে সুলতান আলীর মুখে জুতার বাড়ি মারতে থাকে।...
> যা-যা-যা-হাড়িচাটা কুত্তা, ছোক ছোক বিলাই, বাইর হ- দূর হ।...
> খোল, খোল তাবিজ পারভিন। আমার হাত পটাং করে তাবিজের সুতা ছিঁড়ে ফেলে। তারপর তাবিজ ছুঁড়ে দেয় আকাশের দিকে– যা মিথ্যা, আসমানের দিকে যা।[৪৭]

মূলত নারী তখনই প্রতিরোধী হয় যখন তার বিশ্বাসের শেষ আশ্রয়ভূমিটাও নিঃশেষ হয়ে যায়। আকিমুন রহমান *রক্তপুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি* উপন্যাসে বিভাগোত্তর বাংলাদেশের গ্রামীণ বাস্তবতায় যে আত্মসুখ সন্ধানী নারী-পুরুষের জীবন অঙ্কন করেছেন তা নারীবাদী পর্যবেক্ষণ থেকে সর্বাংশে নারীর অবদমনের ঊর্ধ্বে উঠে পুরুষের অসম্পূর্ণতা দেখায়। পারভিনের সংসার না-হওয়ার দীর্ঘশ্বাস দিয়ে ঔপন্যাসিক পুরুষের প্রতিপক্ষ থেকে নারীকে সরিয়ে এনে সমাজে নারী-পুরুষের স্বাভাবিক যৌথবাসের আকাঙ্ক্ষার প্রতি আস্থা দেখিয়ে মূলত নীতি ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে নৈতিক জীবনেরই জয় ঘোষণা করেছেন।

পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে ও *রক্তপুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি* উপন্যাস দুটি আকিমুন রহমানের সাহসী নির্মাণ। প্রান্তীয় অঞ্চলের মাঠপর্যায়ের গবেষকের মতো বাস্তবিক উপাত্ত বিশ্লেষণের সত্যে তিনি নারী-পুরুষ সম্পর্কের মধ্যে নারীর অন্তর্জগতের ক্ষরণ, দুঃখ নিঃসরণে বহির্জগতের পুরুষের ভূমিকা ও আচরণকে সুনির্দিষ্ট করেছেন। তিনি নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই নীতি বিরুদ্ধ প্রবৃত্তি পরিচর্যায় দেখিয়েছেন অদম্য আগ্রহ। শুধু নারীকে নয়, পুরুষকেও তিনি ব্যবহার করেছেন নারীর প্রবৃত্তি চরিতার্থের উপকরণ হিসেবে। মনস্তাত্ত্বিক শিল্পরীতির নিরীক্ষায় নারী-পুরুষ সম্পর্কে মনোজাগতিক ঘাত-প্রতিঘাত, আত্মনির্মাণ, আত্মবিসর্জন, সামাজিক সংকট ও নৈতিক অনুশাসনের মতো প্রসঙ্গ চিত্রায়ণে আকিমুন রহমান যুগ-ঘনিষ্ঠ থাকার সক্ষমতা দেখিয়েছেন বলেই সমকালের অন্য ঔপন্যাসিকের তুলনায় তাঁর এ দু'টি উপন্যাস স্বতন্ত্র প্রয়াস হয়ে উঠেছে।

তথ্যনির্দেশ

১ শফিক আফতাব, *বাংলাদেশের উপন্যাস পটভূমি ও পাঠ পর্যালোচনা*, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১৬, পৃ. ১১৮

২ বেগম আকতার কামাল, 'নারী সম্পর্কে নতুন ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছেন তিনি', *(https://ntvbd.com/arts-and- literature/232033/* (accessed : 15 January, 2023)

৩ W. Lillie, *An Introduction to Ethics*, New Delhi, R, N. Sachdev Allies Publishers Private Limited, 1980, p. 2

৪ বনানী ঘোষ, 'অবদমন-প্রসঙ্গে', *সিগমুন্ড ফ্রয়েড*, (সম্পাদক: পুষ্পা মিশ্র), কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১০৫

৫ Ernest Barker, *The Politics of Aristotle*, U.S.A., Harvard Univesity Press, 1961, p. 6

৬ *কোরানসূত্র*, (সম্পাদক: মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০৭, পৃ. ১২১-১২২

৭ বিলকিস রহমান, *উনিশ শতকে বাংলায় নারীপুরুষ সম্পর্ক*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০১৩, পৃ. ১৮

৮ মানস চৌধুরী, 'লিঙ্গ, শ্রেণী এবং অনুবাদের ক্ষমতা: বাঙ্গালী মুসলমান মধ্যবিত্ত পরিবার ও বিয়ে', *সমাজ নিরীক্ষণ*, (সম্পাদক: বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর), সংখ্যা ৬৩, ঢাকা, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৯৭, পৃ. ১০

৯ *মনু সংহিতা*, (সম্পাদক: পঞ্চানন তর্করত্ন), কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৩, পৃ. ১৪৮

১০ আকিমুন রহমান, *পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে*, ঢাকা, অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ. ৭

১১ পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

১২ তসলিমা নাসরিন, *নির্বাচিত কলাম*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ২০১২, পৃ. ১৯

১৩ আকিমুন রহমান, *পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭
১৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭
১৫ আনু মুহাম্মদ, *নারী, পুরুষ ও সমাজ*, ঢাকা, সংহতি প্রকাশন, ২০১২, পৃ. ১৬৯
১৬ আকিমুন রহমান, *পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬-৩৭
১৭ মাসুদুজ্জামান, *পুরুষতন্ত্র ও যৌনরাজনীতি*, ঢাকা, পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স, ২০১৮, পৃ. ২৮
১৮ Sigmund Freud, *Introductory Lecture on Psycho- analysis,* (Edit : Richards A, DicksonA), London, Penguin Books, 1982, p. 80
১৯ আকিমুন রহমান, *পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে*, পূর্বোক্ত, পৃ.৬০
২০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫
২১ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬
২২ মাসুদুজ্জামান, *পুরুষতন্ত্র ও যৌনরাজনীতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১
২৩ আকিমুন রহমান, *পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২
২৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১
২৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২
২৬ হ্যাভলক এলিস, *যৌন মনোবিজ্ঞান* (অনুবাদ: মুহাম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস), ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ২০১০, পৃ. ২৩৩
২৭ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'কৃষ্ণকান্তের উইল', *বঙ্কিম উপন্যাস সমগ্র*, চট্টগ্রাম, বইঘর প্রকাশনী, ১৯৮২, পৃ. ৫০৮
২৮ আকিমুন রহমান, *পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২
২৯ অরুণকুমার রায় চৌধুরী (১৯৮৪), *অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ৩০০
৩০ আকিমুন রহমান, *পুরুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১
৩১ আকিমুন রহমান, *রক্তপুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি*, ঢাকা, অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ৭
৩২ হুমায়ূন আজাদ, *দ্বিতীয় লিঙ্গ*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৮, পৃ. ১৫৪
৩৩ যতীন সরকার (২০০৮), 'বাংলার লোকসমাজে পুরুষতন্ত্র ও নারীচেতনা', *জেন্ডার আলোকে সংস্কৃতি* (সম্পাদনা: সেলিনা হোসেন, বিশ্বজিৎ ঘোষ), ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১২৪
৩৪ আকিমুন রহমান, *রক্তপুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩
৩৫ বনানী ঘোষ, 'অবদমন-প্রসঙ্গে', *সিগমুন্ড ফ্রয়েড*, (সম্পাদক: পুষ্পা মিশ্র), কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১১০
৩৬ পুষ্পা মিশ্র, 'ফ্রয়েড ও রবীন্দ্রনাথ; নারীর যৌনতা' *সিগমুন্ড ফ্রয়েড*, (সম্পাদক: পুষ্পা মিশ্র), কলকাতা, এবং মুশায়েরা, ২০১৮, পৃ. ৪৩২
৩৭ আকিমুন রহমান, *রক্তপুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯
৩৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০
৩৯ কল্পনা হেনা রুমি, 'বাংলাদেশের উপন্যাস : নারী-পুরুষ সম্পর্কের স্বরূপ', *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও মানবিকী অনুষদভুক্ত বাংলা বিভাগে পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ*, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭, পৃ. ৫৭
৪০ মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'বিবাহবিচ্ছেদ', *জেন্ডার বিশ্বকোষ*, দ্বিতীয় খণ্ড, (সম্পাদক: সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান), ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬, পৃ. ১৯১
৪১ আকিমুন রহমান, *রক্তপুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮
৪২ পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫
৪৩ সাহিত্য-গবেষণা বিষয় ও কৌশল (সম্পাদক: সফিকুন্নবী সামাদী, গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান ও মোঃ মেহেদী হাসান), ২০১৪, পৃ. ১৫১
৪৪ আকিমুন রহমান, *রক্তপুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৩
৪৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৭
৪৬ তসলিমা নাসরিন, *নির্বাচিত কলাম*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ২০১২, পৃ. ১৫
৪৭ আকিমুন রহমান, *রক্তপুঁজে গেঁথে যাওয়া মাছি*, পূর্বোক্ত, পৃ.১৭৫

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, তেতাল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩২/ডিসেম্বর ২০২৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43ii.007

অভিনেতার প্রস্তুতিতে চরণের অনুশীলন : ভরতের 'চারী বিধান' ও তাদাশি সুজুকি'র 'চরণের ব্যাকরণ'

উম্মে সুমাইয়া*

সারসংক্ষেপ

নাট্যশাস্ত্র একটি প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃত গ্রন্থ, যেখানে ভারতবর্ষের পরিবেশনাশিল্পের বিভিন্ন দিক, বিশেষ করে অভিনয় কৌশল ও নন্দনতত্ত্ব বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থে আলোচিত 'অঙ্গিক অভিনয়' (Physical Acting)-এর অন্তর্গত 'চারী' বা চরণের গতি ও ভঙ্গিমা সংক্রান্ত নিয়মাবলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, যা অভিনেতার শারীরিক অভিব্যক্তিকে অর্থবহ করে তোলে। অন্যদিকে, আধুনিক জাপানের নাট্যতাত্ত্বিক ও মঞ্চনির্দেশক তাদাশি সুজুকি তাঁর অভিনয় প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে 'Grammar of the Feet' বা 'চরণের ব্যাকরণ' নামক একটি শারীরিক কৌশল উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, একজন অভিনেতার উপস্থিতি ও আত্মপ্রকাশের গভীরতা তৈরি হয় তার শারীরিক ভিত্তির দৃঢ়তা এবং শ্বাস-নিয়ন্ত্রিত চলন থেকে। বর্তমান সময়ে, যখন অভিনয় একটি বহুসাংস্কৃতিক, আন্তঃসাংস্কৃতিক এবং আন্তর্জাতিক চর্চার অংশ হয়ে উঠেছে, তখন ভৌগোলিক সীমা ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যের ঊর্ধ্বে উঠে, এই দুটি অভিনয় প্রথার মধ্যে কি কোন বাস্তবসম্মত সংমিশ্রণের সম্ভাবনা আছে? এই সংমিশ্রণ কি সমসাময়িক অভিনেতাদের জন্য একটি কার্যকর, আন্তঃসাংস্কৃতিক ও পরিশীলিত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি গঠনে সহায়ক হতে পারে? এই প্রশ্নগুলো সম্মুখে রেখে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত 'চারীবিধান' এবং তাদাশি সুজুকির 'চরণের ব্যাকরণ'—এই দুই ভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা অভিনয় পদ্ধতির তুলনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

চাবি শব্দ: নাট্যশাস্ত্র, অঙ্গিক অভিনয়, চারী, তাদাশি সুজুকি, চরণের ব্যাকরণ, অভিনয়, আন্তঃসাংস্কৃতিকতা।

ভূমিকা

অভিনেতার শরীর অভিনয় অভিব্যক্তির প্রধানতম মাধ্যম। অভিনেতার শরীরকে ভিত্তি করে অভিনয়ের ভাষা সৃজিত হয়। পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য জুড়ে অভিনয়ের পদ্ধতিগত শিক্ষায় যে সকল অনুশীলন ও তাত্ত্বিক ঘরানা তৈরি হয়েছে সেগুলোর মধ্যে অভিনেতার শরীরকে মৌল বিবেচনা করা হয়েছে এবং সেই শরীরের পদ্ধতিগত প্রস্তুতিকে মুখ্য বলে ভাবা হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও যে পদ্ধতিগত নাট্য শিক্ষা গড়ে উঠেছে সেখানেও অভিনেতার শরীরকে মুখ্য হিসেবে গণ্য করা হয়। উদাহরণস্বরূপ প্রচীন ভারতবর্ষে বিকশিত নাট্যশাস্ত্রের পরম্পরায় অভিনয়ের যে পদ্ধতিগত নাট্য শিক্ষার বয়ান পাওয়া যায় সেখানে অভিনেতার শরীর অভিব্যক্তি প্রকাশের প্রধানতম মাধ্যম। আবার আধুনিক জাপানের নাট্যচিন্তার মধ্যে দেখা যায় অভিনেতার শরীরের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ

* সহকারী অধ্যাপক, থিয়েটার ও পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পদ্ধতি। প্রাচীন ভারতবর্ষের *নাট্যশাস্ত্র* এবং আধুনিক জাপানে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অভিনয়-তাত্ত্বিক তাদাশি সুজুকির অভিনয় প্রশিক্ষণে অভিনেতার শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির নানাবিধ পন্থা-প্রণালি লক্ষ করা যায়, যেখানে শরীরের বিশেষ প্রত্যঙ্গ হিসেবে অভিনেতার চরণের প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। ভরতের *নাট্যশাস্ত্রে* 'চারীবিধান' এবং জাপানী নাট্যনির্দেশক ও তাত্ত্বিক তাদাশি সুজুকির 'চরণের ব্যাকরণ' এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।

অভিনেতার শারীরিক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যই হলো অভিনয়ের পদ্ধতিগত চর্চায় শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গ যে সৃষ্টিশীল হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োগ হয় সেই সৃষ্টিশীল হাতিয়ারগুলোকে বিকশিত করা এবং বিশেষায়িতভাবে ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে তা প্রয়োগ করা। অর্থাৎ বিভিন্ন রূপ-রীতির নাট্যাভিনয়ে উৎকর্ষমণ্ডিত অভিনয় করতে সক্ষম হওয়া। অভিনেতার শরীরের যে জৈবতাত্ত্বিক গঠন তা পরিবর্তন করা অসম্ভব হলেও তার লক্ষ্যাভিমুখী প্রশিক্ষণ এবং অনুশীলনের মাধ্যমে অভিনেতা বৈচিত্র্যময় চরিত্রায়ন করতে সক্ষম হয়ে ওঠেন। ফলে, অভিনেতার শরীর সবসময় একটা কল্পশরীরের (Fictive body) সম্ভাবনায় প্রস্ফুটিত থাকে। অনুশীলনের মাধ্যমে অভিনেতা জৈবতাত্ত্বিক শরীরকে কল্পশরীরে পরিণত করতে সক্ষম হয়। বৈশ্বিক নাট্যসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা অবহিত করে যে, অভিনেতার শারীরিক প্রস্তুতির একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো তার চরণের যথাযথ অনুশীলন ও লক্ষ্যাভিমুখী প্রয়োগ। অভিনয় যেহেতু অভিনয়শিল্পীদের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, চিহ্নযুক্ত ও অর্থপূর্ণ এক চলনকে প্রকাশ করে সেহেতু মঞ্চের মধ্যে গল্পের মাধ্যমে যে কল্পভুবন রচিত হয় সেখানে চলাচলের ধারণা দিয়ে অভিনয়-ক্রিয়ার প্রগতি সংঘটিত হয়। এক্ষেত্রে, অভিনেতার শরীরের সচলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর শরীরের চলমানতার অন্যতম মাধ্যম হল তার পদযুগল। মঞ্চাভিনয়ে অভিনয়-ক্রিয়া তখনই শুরু হয় যখন অভিনেতার চরণ এবং মঞ্চের যুতসই সংযোগ গঠিত হয়। তাদাশি সুজুকি বলেন,

> A performance begins when the actor's feet touch the ground, a wooden floor, a surface, when he first has the sensation of putting down roots; it begins in another sense when he lifts himself lightly from that spot. The actor composes himself on the basis of his sense of contact with the ground, by the way in which his body makes contact with the floor. The performer indeed proves with his feet that his *is* an actor. Of course, there are many ways in which the human body can make contact with the floor, but most of us, excepting small children, make contact with the lower part of the body, centering on the feet.[১]

'চরণ' ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মানুষ প্রথম ভূমিতে তার শরীরকে সঞ্চালিত করে। যেমন একজন নবজাতক যখন পায়ের ওপর ভর দিয়ে প্রথম হাঁটতে শুরু করে তখন তার এক নতুন যাত্রা শুরু হয়। এর মধ্য দিয়ে শিশুর মনোজগতে গতিময় বিশ্ব সম্পর্কিত আবিষ্কারের এক বিশেষ জীবনবোধ জাগে। এই পদ সঞ্চালনের মাধ্যমে শিশু আত্মনির্ভরশীলতার প্রথম স্বাদ পায়। মানব শরীরের 'চরণ'

বা 'পা' এমন এক অঙ্গ যার মূল বৈশিষ্ট্যই হল ভার বয়ে চলা। নাট্যশিল্পে অভিনয় পরিবেশনার ক্ষেত্রে পায়ের ব্যবহারের গুরুত্ব প্রসঙ্গে বারবা এবং সেভারেজ দেখিয়েছেন যে,

> The way in which the feet are used is the basis of a stage performance. Even the movements of the arms and hands can only augment the feeling inherent in the body positions established by the feet. There are many cases in which the position of the feet determines even the strength and nuance of the actor's voice. An actor can still perform without arms and hands, but to perform without feet would be inconceivable.[২]

অতএব, নৃতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতালব্ধ অনুশীলনভিত্তিক জ্ঞান থেকে অবহিত হয়ে বলা যায় যে, অভিনেতার বিভিন্ন শরীরাংশ ও স্বরের নির্ণায়ক অঙ্গ অভিনেতার চরণ। চরণ ব্যতীত অভিনয় সৃজন প্রায় অসম্ভব। অন্যদিকে, চরণের প্রস্তুতির ভিত্তিতে কীভাবে নাট্যভাষা নির্মাণ করা যায় সে সম্পর্কিত তাৎপর্যপূর্ণ সূত্রাবলি খুঁজে পাওয়া যায় *নাট্যশাস্ত্রে* উল্লেখিত 'চারী বিধান' নামক অধ্যায়ে। প্রাচীন ভারতবর্ষে ভরত মুনি রচিত নাট্যশাস্ত্র[৩] এবং আধুনিক জাপানের অভিনয়-তাত্ত্বিক তাদাশি সুজুকির অভিনেতার শারীরিক প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতেও রয়েছে চরণের বিশেষ প্রস্তুতির রূপরেখা। অতএব, বক্ষ্যমাণ আলোচনায় ব্রতী হয়ে পর্যায়ক্রমে অনুসন্ধান করা হবে পরস্পর সম্পর্কিত তিনটি প্রসঙ্গ। প্রথমত, ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* অভিনয়ের ক্ষেত্রে পাদ-প্রয়োগ বা চারীবিধান সম্পর্কিত কী কী সূত্র তুলে ধরে। দ্বিতীয়ত, আধুনিক জাপানের বিশ্বব্যাপী প্রভাববিস্তারী নাট্যপ্রশিক্ষক, নির্দেশক ও তাত্ত্বিক তাদাশি সুজুকি 'চরণের ব্যাকরণ' বলতে কী বুঝিয়েছেন। সর্বশেষ, এই প্রবন্ধে সংযোগ সন্ধান করে বিশ্লেষণ করা হবে যে, দুটি ভিন্ন কালে ও স্থানে বিকশিত চরণ সম্পর্কিত অভিনয়সূত্রের প্রভেদ ও অভিন্নতা কী কী। এবং একইসঙ্গে এই দুইয়ের পার্থক্য ও মিল চিহ্নায়নের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হবে সমকালীন অভিনয়-অনুশীলনে নাট্যশাস্ত্রোক্ত চারীবিধান এবং তাদাশি সুজুকি প্রস্তাবিত চরণ-ব্যাকরণের সংশ্লেষাত্মক পাঠের তাৎপর্য কী।

চারী বিধান

নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখিত আঙ্গিক অভিনয় (যা মূলত শরীর দ্বারা ভাব প্রকাশকে বোঝায়) তিন প্রকার : ১. মুখজ (যা চক্ষু, শির সঞ্চালন ও প্রয়োগ) ২. চেষ্টাকৃত (হস্তাভিনয়) ৩. শারীর (উদর, কটি, বক্ষদেশ, পার্শ্ব, জঙ্ঘা, ঊরু প্রভৃতির সঞ্চালন ও প্রয়োগ)। আঙ্গিক অভিনয় যা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং উপাঙ্গের গতিভঙ্গির চলনকে নির্দেশ করে। আঙ্গিকাভিনয়ে প্রযুক্ত হয় ছয়টি প্রধান অঙ্গ : শির, বক্ষ, হস্তদ্বয়, কটি, পার্শ্বদ্বয় ও পদদ্বয়; ছয়টি প্রত্যঙ্গ : বাহুদ্বয়, স্কন্ধদ্বয়, উদর, পৃষ্ঠ, জঙ্ঘাদ্বয় ও ঊরুদ্বয় এবং ছয় উপাঙ্গ : নেত্র, ভ্রূ, কপোল, নাসা, অধর ও চিবুক। পদ, ঊরু, জঙ্ঘা ও কটির যুগপৎ চালনায় গঠিত হয় চারী। 'যেহেতু অঙ্গের সহিত যুক্ত বিধিবদ্ধ চারীসমূহ পরস্পর ব্যায়ত হয়, সেইহেতু চারী ব্যায়াম নামে অভিহিত হয়'[৪] নৃত্যকলাবিদ গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় চারী সৃজনের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে বলেন, 'চারী, করণ, খণ্ড, মণ্ডল এগুলি পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িত। হস্তকর্মের

সঙ্গে গতির অনুকরণাত্মক অভিনয়ে বিভিন্ন পাদভেদে বিভিন্ন চরণ-কর্মের রূপায়ণে এগুলির প্রয়োগ অপরিহার্য। এক পাদের প্রচারে চারী, দুই পায়ের প্রচেষ্টায় করণ, আবার করণসমূহের সংযোগে খণ্ড এবং কয়েকটি খণ্ডের সংযোগে হয় মণ্ডল'।[৫]

অন্যদিকে, ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্তী 'করণ' (পদসঞ্চালন) ক্রিয়ায় গুরুত্বারোপ করে চারী সঙ্ঘটন-প্রক্রিয়া *নাট্যশাস্ত্রে* কীভাবে বর্ণিত হয়েছে তা তাঁদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় তুলে ধরেন :

> "পাদজঙ্ঘোরুকরণং সমং কার্যং প্রযোক্তৃভিঃ ।
> পাদস্য করণে সর্বং জঙ্ঘোরুকৃত্যমিষ্যতে ।।
> প্রযোক্তাগণ যুগপৎ পদ, জংঘা ও ঊরুর করণ (সঞ্চালন) করবেন। পদকরণে জংঘা ও ঊরুর সকল সঞ্চালনই অন্তর্ভুক্ত! [যেখানে] পদদ্বয় যেমন চালিত হয়, ঊরুও তেমনভাবে চলে। এই দুইটি প্রত্যঙ্গ একত্রে সঞ্চালনহেতু পাদচারী প্রয়োগ করতে হয়"।[৬]

নাট্যশাস্ত্রে সম, উদঘট্টিত, অঞ্চিত, কুঞ্চিত ও অগ্রতলসঞ্চর– এই পাঁচ চরণের (পদ) উল্লেখ রয়েছে। ভূমিতে স্বাভাবিক স্থিত চরণকে সম, পদতলের অগ্রভাগের ওপর দাঁড়িয়ে গোড়ালি বারবার ভূমিতে আঘাত করলে হয় উদঘট্টিত, গোড়ালি ভূমিতে রেখে পদতলের অগ্রভাগ উত্থিত এবং অঙ্গুলি প্রসারিত হলে অঞ্চিত চরণ, অঙ্গুলি সংকুচিত গোড়ালি উচ্চে এবং পদতলের মধ্যভাগ সংকুচিত হলে হয় কুঞ্চিত চরণ, অগ্রতলসঞ্চর পদে গোড়ালি উচ্চে থেকে পদের বুড়ো আঙ্গুল বক্র এবং বাকি অঙ্গুলি নিম্নাভিমুখ হয়। নাট্যশাস্ত্রবর্ণিত চরণের অভিনয় প্রসঙ্গে আলোচনা করে আদ্যা রঙ্গাচার্য তাঁর সমালোচনামূলক ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন :

> After describing the *padabhinaya,* there is a kind of obiter dictum at the end of the chapter. 'The *abhinaya of the pada* (foot), *uru* (thighs) and *jungha* (shanks) must be done simultaneously. What is done with the foot must be done by thigh shanks'. Whoever wrote this last sentence must be devoid of a sense of humour. That the thighs and the shanks could not be separated from the feet seems to have dawned on the author at this last stage. Apparently, since in chapter VIII *jungha* and *uru* were not included in the anga-s, whoever is responsible for adding them is most certainly the author of this verse. Indirectly, he admits that the *jungha* and the *uru* are irrelevant, particularly in plays and many dances, where they would not, and need not, be visible to the audience.[৭]

নাট্যশাস্ত্র মতে জঙ্ঘা (হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত) পাঁচ প্রকার : নত, ক্ষিপ্ত, আবর্তিত, উদ্বাহিত ও পরিবৃত্ত। স্তম্ভন, কম্পন, উদ্বর্তন, নিবর্তন ও বলন– এই পাঁচ রকমের ঊরু ক্রিয়া রয়েছে। আবার কটি ক্রিয়াও পাঁচ প্রকার: ছিন্না, নিবৃত্তা, রেচিতা, উদ্বাহিতা ও প্রকম্পিতা। 'এভাবে পদ, জঙ্ঘা, ঊরু ও কটিদেশের যুগপৎ সঞ্চালন চারী নামে কথিত। [...] এক পদের সঞ্চালন চারী নামে অভিহিত। পদদ্বয়ের পরিক্রমায় করণ হয়। [...] করণসমূহের মিলন খণ্ড নামে অভিহিত। তিন বা

চার খণ্ডের সংযোগে মণ্ডল গঠিত হয়'।[৮] নৃত্য, যুদ্ধ, অস্ত্রক্ষেপণ, চলন নানান ক্রিয়ায় এই চারী সমূহ ব্যবহৃত হয়।

নাট্যশাস্ত্রে দুই প্রকার চারীর উল্লেখ রয়েছে : ১. ভৌমী চারী (Earthly), ২. আকাশিকী চারী (Aerial)। আবার, চারী সর্বমোট বত্রিশটি যেখানে ভৌমী চারী ষোলটি এবং আকাশিকী চারী ষোলটি। *নাট্যশাস্ত্র* অনুযায়ী ভৌমী চারী ও আকাশিকী চারী সমূহ যথাক্রমে :

সমপাদা, স্থিতাবর্তা, শকটাস্যা, অধ্যর্ধিকা, চাষগতি, বিচ্যবা, এড়কাক্রীড়িতা, বদ্ধা, ঊরূদ্বৃত্তা, অড্ডিতা, উৎস্যন্দিতা, জনিতা, স্যন্দিতা, অপস্যন্দিতা, সমোৎসারিতমতল্লি এবং মতল্লি এই ষোলটি ভৌমী চারী নামে খ্যাত। [...] অতিক্রান্তা, অপক্রান্তা, পার্শ্বক্রান্তা, ঊর্ধ্বজানু, সূচী, নূপুরপাদিকা, দোলপাদা, আক্ষিপ্তা, আবিদ্ধা, উদবৃত্তা, বিদ্যুদভ্রান্তা, অলাতা, ভুজঙ্গত্রাসিতা, হরিণপ্লুতা, দণ্ডা ও ভ্রমরী এই ষোলটি আকাশিকী নামে খ্যাত।[৯]

ভৌমী চারী লক্ষণ

ভূমি ও চরণ– এই দুইয়ের ধারণায় সৃজিত ভৌমী চারী। *নাট্যশাস্ত্রে* ভৌমী চারীর বিভিন্ন নির্ণায়ক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হয়েছে :

১ সমপাদা : পদদ্বয় নিরন্তর অর্থাৎ দুই পদের মধ্যে ফাঁক থাকবে না, নখগুলি সমান-দণ্ডায়মান অবস্থায় এই চারী সমপাদা নামে অভিহিত।

২ স্থিতাবর্তা : মাটিতে পায়ে ঘষে একটি মণ্ডল [তিন বা চার খণ্ডের সংযোগে হয় মণ্ডল, দুই পায়ের পরিক্রমায় করণ হয় আবার করণ সমূহের মিলনে হয় খণ্ড] করণীয়, পরে অন্য পদ উৎসারিত করণীয়, এটিকে বলা হয় স্থিতাবর্তা।

৩ শকটাস্যা : বিশ্রান্তদেহে অগ্র তল সংচর পদ প্রসারিত করে, বক্ষ উদ্বাহিত করে শকটাস্যা প্রয়োগ করা বিধেয়।

৪ অধ্যর্ধিকা : যখন বামপদ দক্ষিণ পদের পেছনে থাকবে তখন দক্ষিণ পদের উপসর্পণ বা অগ্রে সঞ্চালনকে পণ্ডিতগণ অধ্যর্ধিকা বলেন।

৫ চাষগতি : এতে দক্ষিণ চরণ প্রসারিত হয়, পুনরায় এটি উপসর্পিত অর্থাৎ অগ্রে সংচালিত করে, বাম চরণ দক্ষিণ চরণের প্রতি সংচালিত করতে হয়।

৬ বিচ্যবা : পায়ের তলার অগ্রভাগ দ্বারা মাটিতে আঘাত করতে করতে সমপাদার বিচ্যুতি অর্থাৎ দুই চরণের পরস্পর পৃথককরণ করে বিচ্যবার প্রয়োগ করণীয়।

৭ এড়কাক্রীড়িতা : তলসংচার পাদদ্বয়দ্বারা পর্যায়ক্রমে লম্ফ ও পতনে হয় এড়কাক্রীড়িতা।

৮ বদ্ধা : জংঘাদ্বয়ের পরস্পর সংবেধ (crossed) অবলম্বনপূর্বক স্বস্তিক করে ঊরুদ্বয় দ্বারা বলন হলে তা বদ্ধাচারী বলে কথিত হয়।

৯ ঊরুদবৃত্তা : যখন তলসঞ্চর চরণের গুলফ বহির্মুখী হয়, জংঘা হয় অঞ্চিত ও উদ্বৃত্ত তখন তা ঊরূদ্বৃত্তা নামে জ্ঞাত হয়।

১০ অড্ডিতা : যেখানে অগ্রতলসঞ্চর পদ সামনে বা পেছনে দ্বিতীয় পদ দ্বারা ঘর্ষিত হয় তা অড্ডিতা।

১১ উৎস্যন্দিতা : ধীরে ধীরে পদ রেচক অনুসারে বাইরে ও ভিতরে নিবর্তিত হয়-সেই চারীকে উৎস্যন্দিতা বলে।

১২ জনিতা : বক্ষঃস্থিত মুষ্টিহস্ত, অপর হস্ত প্রবর্তিত এবং তলসঞ্চর পাদ এই চারী জনিত নামে কথিত।

১৩ ও ১৪. স্যন্দিতা ও অপস্যন্দিতা : পাঁচতাল দূরে চরণ প্রসারিত করে স্যন্দিতা করতে হয়। একইভাবে দ্বিতীয় চরণ অপস্যন্দিতা করণীয়।

১৫ সমোৎসরিতমত্তল্লী : তলসঞ্চর পদদ্বয় দ্বারা মণ্ডলাকারে ঘূর্ণিত হতে হতে অগ্রসর হওয়াকে ব্যায়ামে সমোৎসরিতমত্তলী বলে।

১৬ মত্তল্লী : উভয় চরণ দ্বারা ঘূর্ণিত ও অগ্রসর হওয়া এবং উদ্বেষ্টিত ও অপবিদ্ধ হস্তদ্বারা মত্তল্লি করণীয়।

আকাশিকী চারী লক্ষণ

ভূমিতে স্থির চরণের উর্ধ্বমুখী সম্মুখক্রিয়ায় সৃজিত হয় আকাশিকী চারী। *নাট্যশাস্ত্রে* আকাশিকী চারীর প্রয়োগের নির্দেশনার উল্লেখ রয়েছে:

১ অতিক্রান্তা : কুঞ্চিত পদ উৎক্ষিপ্ত করে সম্মুখে প্রসারিত করতে হবে। একে উৎক্ষিপ্ত করে পাতিত করবে–সেই চারী অতিক্রান্তা নামে কথিত।

২ অপক্রান্তা : ঊরুদ্বয়ের দ্বারা বলন করে কুঞ্চিত পদ উত্তোলিত করবে ও পাশে নিক্ষিপ্ত করবে-সেই চারী অপক্রান্তা নামে কথিত।

৩ পার্শ্বক্রান্তা : কুঞ্চিত পদ উৎক্ষিপ্ত করে হাঁটু স্তনের সমসূত্রে স্থাপন করে, উদ্ঘাটিত পদের দ্বারা পার্শ্বক্রান্তা করণীয়।

৪ ঊর্ধ্বজানু : কুঞ্চিত পদ উৎক্ষিপ্ত করে হাঁটু স্তনের সমসূত্রে স্থাপন করে, দ্বিতীয় জানুও অনুরূপ করণীয় এবং পদক্ষেপ নিশ্চল থাকবে, এই চারী ঊর্ধ্বজানু বলে কথিত।

৫ সূচী : কুঞ্চিত চরণ উৎক্ষিপ্ত করে হাঁটু ওপরের দিকে প্রসারিত করতে হবে এবং অগ্রভাগের দ্বারা তাকে পাতিত করবে এই চারী সূচী নামে কথিত।

৬ নুপুরপাদিকা : পেছন দিকে অঞ্চিত করে চরণকে তলার অগ্রভাগ দ্বারা দ্রুত ভূমিতে পাতিত করবে, এই চারীকে বলা হয় নূপুরপাদিকা।

৭ দোলপাদা : কুঞ্চিতচরণ উৎক্ষিপ্ত করে এক পাশ থেকে অপর পাশে দোলাতে হবে এবং অঞ্চিত পদ পাতিত করতে হবে– এই চারী দোলপাদা নামে কথিত।

৮ আক্ষিপ্তা : কুঞ্চিত চরণ উৎক্ষিপ্ত করে তাকে টেনে অঞ্চিত (পদ) করবে; জংঘা স্বস্তিকের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে, এই চারী আক্ষিপ্তা নামে জ্ঞাত।

৯ আবিদ্ধা : স্বস্তিকের সামনে কুঞ্চিতচরণ প্রসারিত হবে এবং অঞ্চিত পদের সঙ্গে আবিদ্ধ চারী আবিদ্ধা নামে জ্ঞাত।

১০ উদ্বৃত্তা : আবিদ্ধপদকে আবেষ্টিত করে লাফিয়ে দ্বিতীয় চরণের চারদিকে ঘুরিয়ে পাতিত করতে হবে, সেই চারী উদ্বৃত্তা বলে কথিত।

১১ বিদ্যুদ্ভান্তা : পেছন দিকে বলিত চরণ মস্তকে ঘর্ষণ করে প্রসারিত করবে এটি সব দিকে হবে মণ্ডালাকারে (ঘূর্ণিত)– সেই চারী বিদ্যুদ্ভান্তা।

১২ অলাতা : এক চরণ পশ্চাদ্দিকে প্রসারিত, তারপর বলিতভাবে অভ্যন্তরে স্থাপিত ও গুলফোপরি রক্ষিত–সেই চারী অলাতা নামে কথিত।

১৩ ভুজঙ্গত্রাসিতা : একটি কুঞ্চিত চরণ উৎক্ষিপ্ত করে ত্র্যস্রাকারে ঊরু বিবর্তিত করণীয়; কটিদেশ ও জানুর বিবর্ত (ঘুরান) হেতু ভুজঙ্গত্রাসিতা হয়।

১৪ হরিণপ্লুতা : অতিক্রান্ত চারী করে লাফিয়ে পা মাটিতে রাখতে হবে, জংঘা অঞ্চিতাকারে পরিক্ষিপ্ত হলে তা হরিণপ্লুতা নামে জ্ঞেয়।

১৫ দণ্ডপাদা : চরণকে নূপুরাকৃতি করে সামনের দিকে প্রসারিত করবে এবং ক্ষিপ্র গতিতে আবিদ্ধ করণীয়–সেই চারী দণ্ডপাদা নামে অভিহিত।

১৬ ভ্রমরী : অতিক্রান্ত চারী করে ত্রিককে (মেরুদণ্ডের নিম্নাংশ) ঘোরাতে হবে এবং দ্বিতীয় চরণ তলার ওপরে চালিত হবে– এই চারী ভ্রমরী নামে কথিত।[১০]

নাট্যশাস্ত্রে শৈলীবদ্ধকরণ (stylization) কৌশল অভিনেতা কর্তৃক দীর্ঘ এবং কঠোর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। সংস্কৃত থিয়েটারে অভিনেতার শারীরিক আচরণের মধ্য দিয়ে একটা উচ্চ মাত্রার শৈলীবদ্ধকরণ সৃজিত হয়, যা কেবল একটি মুদ্রা নয় বরং অভিনেতার সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়ে তা পূর্ণতা লাভ করে। হাতের অঙ্গভঙ্গি, পায়ের অঙ্গভঙ্গি, কোমর, শির, আঙ্গুল, মুখ সমস্ত মিলেই অভিনেতার শরীরের একটা ভাষা তৈরি হয়– 'এই অঙ্গাভিনয় বা ভাষাপ্রকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা আছে। *নাট্যশাস্ত্রকে* মূলগ্রন্থ হিসেবে গণ্য করে পরবর্তীকালে বহু শাস্ত্র রচিত হয়েছে'।[১১]

ডক্টর অঞ্জলা মহাঋষি ধ্রুপদী ভারতীয় সংস্কৃত *নাট্যশাস্ত্রের* প্রধান একটি উপাদান হিসেবে মানবশরীর এবং সেই শরীরের 'চারী বিধান'-ভিত্তিক অভিনয় ভাষার তাৎপর্য অন্বেষণ করেন। চারী বিধান প্রভৃতিকেন্দ্রিক অভিনয় প্রশিক্ষণের একটি দুরূহ শাস্ত্ররূপে ভরত *নাট্যশাস্ত্রকে* চিহ্নিত করা হয়। যেমন মহাঋষি বলেন :

> Classical Indian drama takes human figure as its basic instruments of expression. Most theoreticians agree that the conventions of stage presentation (Abhinaya) are a vital part of the structure of classical Indian drama and the theory and technique of Classical dance plays an integral part in developing the conventions. Bharata chooses this most difficult discipline for the physical training of the actor.[১২]

তাদাশি সুজুকির চরণের ব্যাকরণ

অভিনেতার চরণ-প্রশিক্ষণের একজন গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ও প্রয়োগকর্তা তাদাশি সুজুকি (১৯৩৯-)। অভিনেতার চরণ বিষয়ক প্রস্তুতি ও অনুশীলনের ব্যাকরণকে বলা হয় 'সুজুকি পদ্ধতি'। নাট্য পরিবেশনার একটি তীব্রতর পরিবর্ধক হিসেবে কাজ করে এই পদ্ধতি। বিশ্বব্যাপী নাট্য বিদ্যায়তনে অভিনেতার অনুশীলনের ক্ষেত্রে সুজুকির প্রশিক্ষণ-প্রণালি এক নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। তাদাশি সুজুকি শরীরের নিম্ন অংশের প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেন। তাঁর *The Way of Acting* বইয়ের 'The Grammar of the Feet' অধ্যায়ের মূল উপজীব্য হলো প্রশিক্ষণে রত থেকে অভিনেতা ভূমির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মধ্য দিয়ে ধরিত্রী থেকে শক্তি আহরণ করতে পারে। আর এ কারণে তিনি মনে করেন, পরিবেশনার মূল কেন্দ্র হলো অভিনেতার শরীর, বিশেষ করে তার পায়ের পাতা। উপর্যুক্ত বইয়ের অধ্যায়ের শুরুতেই অভিনেতার অর্থাৎ জাপানি অভিনেতার শারীরিক গঠনের কথা উল্লেখ করে সুজুকি দেখিয়েছেন যে, আধুনিক জাপানি থিয়েটারে মস্কো আর্ট থিয়েটারের ব্যাপক প্রভাব থাকা সত্ত্বেও জাপানি অভিনেতাদের উচিত জাপানি ভাষায় লিখিত এবং জাপানি নাট্যকার দ্বারা রচিত নাটকে অভিনয় করা। এর কারণ হিসেবে তিনি যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন, 'In the first place, our appearance is wrong; our arms and legs are too short'.[১৩] এই যুক্তির অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী বলা যায় যে, এখানে সুজুকি অভিনেতার শারীরিক গঠনকে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। সংস্কৃতির পার্থক্যভেদে অভিনেতার শারীরিক গঠন সম্পর্কে নির্ণায়ক চিন্তার সূত্রে অভিনেতার নাট্যানুশীলন ও প্রস্তুতির রূপরেখা গড়ে তোলার সবিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এই প্রস্তাবকে সম্প্রসারিত করে সুজুকি বলেন :

> The fact that doubts concerning the orthodox tradition in the modern Japanese theatre of faithfully reproducing foreign dramas was at least partially attributed to a shortness of arms and legs in interesting in itself. I myself don't think that the physical appearance of a Russian is automatically superior; still, it is true that the essence of a Chekhov production involves delicate reconstruction, in physical terms, of Russian manners and morality. Modern Japanese actors have gone to tremendous pain, throwing themselves into the effort of imitation, yet they have never achieved an appropriate likeness. So the failure has been attributed, quite bluntly, to the physiological: their arms and legs are too short. Ever since the beginning of the Meiji period in 1868 there have been tremendous effort within Japanese culture to catch up with, then surpass, the West. Although the actors have put themeselves at the forefront of such activities, they have only managed to imitate the surface of things.[১৪]

সুজুকি আলোচনা করছেন যে, জাপানে যখন আধুনিক থিয়েটার চর্চিত হতে শুরু করে তখন পায়ের প্রয়োগ নিয়ে কাজ করা হয়নি। যেমন, বাস্তববাদী (Realism) এবং স্বভাববাদী (Naturalism) রীতির নাট্যানুশীলনে অনেক বেশি জোর দেওয়া হয় মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতির ওপর। এই বিষয়ে সুজুকি বলছেন যে, এই পদ্ধতি বা এই উদ্যোগ একটা ভুল সিদ্ধান্ত, কারণ বাস্তববাদী এবং স্বভাববাদী অভিনয়ে মনস্তত্ত্বের ওপর জোর দিতে গিয়ে একটা সময় মনে হয় অভিনেতাদের পা নেই। অর্থাৎ অভিনেতাদের পায়ের কোনো ব্যবহার নেই। যদিও এই অনুশীলন পদ্ধতিকে তিনি বর্জন করেননি বরং এর সঙ্গে পায়ের ব্যবহার যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন। এর ফলে, তা দর্শককে আরো বেশি যুক্ত করবে নাট্যপ্রযোজনার সঙ্গে।

জাপানের আধুনিক থিয়েটারে যে প্রচেষ্টাটি লক্ষ করা যায় তা হলো ইউরোপের নাটককে এমনভাবে তা গ্রহণ করতে থাকে যেন মনে হয় এক ধরনের সাংস্কৃতিক বিবাহবন্ধন। কারণ জীবন, ফ্যাশন থেকে শুরু করে সবকিছুই প্রায় নির্বিচারে গ্রহণ করতে থাকে। এর ফলে, সুজুকি বলছেন, এমন অবস্থা তৈরি হয় যে, জাপানে এমন কোনো কক্ষ নেই যেখানে তারা খালি পায়ে হাঁটে। ইউরোপিয়ানদের কাছে পাওয়া জুতা পরার ধারণা গ্রহণ করার ফলে এক ধরনের ক্ষতি হয়েছে বলে সুজুকি মনে করেন। কারণ এতে পায়ের সঙ্গে ভূমির সম্পর্ক বা স্পর্শযোগ্যতা কমে যায়। এই পর্যবেক্ষণলব্ধ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তাড়িত হয়ে সুজুকি নিজের উদ্ভাবিত অনুশীলন 'স্ট্যাম্পিং' (Stamping) করার সময় তিনি মনে করেন জুতা পায়ে তা করা উচিত নয়। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন, খালি পায়ে স্ট্যাম্পিং করলে পায়ের গোড়ালিতে চাপ পড়ে, আর এর ফলে পায়ের পেশি শক্ত হয়। তবে এক্ষেত্রে, তিনি Tabi (এক ধরনের সাদা মোজা) ব্যবহার করার কথা বলেন। সুজুকির মতে, আধুনিক থিয়েটার তাদের সত্যতা হারিয়েছে কারণ যেভাবেই হোক তাদের পা আর ব্যবহৃত হয় না। সুজুকির অনুমান, এই কারণেই সম্ভবত বাস্তববাদী থিয়েটার নতুনদের কাছে এখন পুরনো মনে হয় :

> Realism in the theatre should inspire a veritable treasure house of walking style. Since it is commonly accepted that realism should attempt to reproduce faithfully on the stage the surface manner of life, the art of walking has more or less been reduced to the simplest forms of naturalistic movement. Yet any movement on the stage is, by definition, a fabrication. Since there is more room within realism for a variety of movements than in the *no`* or in *kabuki,* these various ambulatory possibilities should be exhibited in an artistic fashion. One reason the modern theatre is so tedious to watch, it seems to me, is because it has no feet.[১৫]

বিশ্বের যা কিছু নান্দনিক বলে বিবেচিত, সুন্দর বলে গৃহীত– এই সব কিছুতেই পায়ের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সুজুকি জাপানের 'নো' (Noh), ব্যালে, 'কাবুকি' এই আঙ্গিকগুলো নিয়ে আলোচনা করে পায়ের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

'নো' থিয়েটারকে বিবেচনা করা হয় চলনের বা হাঁটার নন্দন বা শিল্প হিসেবে। এই সূত্রে 'নো' নাটকের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রচলিত এক গল্পের অবতারণা করা যায় :

> এ নাট্যোৎপত্তির আদিনৃত্যের সূচনা করেন দেবতারা। জাপানে দেবতাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রধান ছিলেন সূর্যদেবী। তিনি একবার দীর্ঘকালের জন্য স্বর্গের এক পর্বতগুহায় লুকিয়েছিলেন। সূর্যদেবী না থাকায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অন্ধকারে ডুবে গেল। দেবতারা কিছুতেই দেবীকে গুহার আড়াল থেকে বাইরে আনতে না পেরে তাকে ভুলিয়ে আনবার জন্য এক নাচ আবিষ্কার করলেন। তাঁদের মধ্যে একজন গুহা মুখে একটা ফাঁকা গামলাকে উলটে নিয়ে তার উপরে নৃত্য শুরু করলেন। সূর্যদেবী নৃত্যশিল্পীর পদাঘাতের ফাঁকা আওয়াজে আকৃষ্ট হয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে দেখতে এলেন কি ব্যাপার। সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ড আলোকিত হয়ে উঠল। নো নাটকের মঞ্চে এখনো টিকে রয়েছে এই নৃত্যকৌশল।[১৬]

যখনই কোনো চলন (Movement) তৈরি হয় তখনই একটা প্রকাশভঙ্গিম পরিবেশ তৈরি হয়। 'নো' থিয়েটারে হাঁটা যে একটা শিল্প এটা বলার কারণ হলো গতির অদলবদল বা গতির পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্য। গতির পরিবর্তন 'নো' অভিনয় শিল্পীদের শরীরের সঙ্গে এমনভাবে সম্পৃক্ত যে, যখন তারা গতির পরিবর্তন করে পা টেনে টেনে চলে (Dragging) তখন একটা ছন্দের বন্ধন তৈরি হয়। 'নো' থিয়েটারে অভিনেতারা যখন পা নিয়ে এর গতি পরিবর্তন (shuffle-motion) করে তখন সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়টি ঘটে তা হলো তার শরীরের ওপরের অংশ অনড় থাকে। নাচের সময় তারা এক ধরনের সাদা মোজা (Tabi) পরে। Tabi পরার কারণ হলো চলন যাতে আরো বেশি দৃশ্যমান হয়। 'নো' থিয়েটারের এই ধারণা সুজুকি মনে করেন গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যে কোনো অভিব্যক্তিকে অনেক বেশি প্রকাশভঙ্গিম করে তোলা যায় যদি মঞ্চের সঙ্গে পায়ের সম্পর্ক দৃঢ় হয়। একইভাবে জাপানিজ ব্যালে, জাপানিজ কাবুকি থিয়েটারেও পায়ের ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। কাবুকি থিয়েটার মূলত অভিনেতাদের পায়ের ব্যবহারের কারণে দর্শককে আকৃষ্ট করে। নাট্যমিলনায়তনের ভেতরে দর্শকের মাঝে একটা পথ (Way) থাকে, পরিবেশনায় কাবুকি অভিনেতৃ তা ব্যবহার করে যেন দর্শক অনেক কাছ থেকে পায়ের চলন দেখতে পায়।

চরণের অনুশীলন পদ্ধতি

যে কোনো নাট্য পরিবেশনার ক্ষেত্রে যদিও হাত-পা সবই ব্যবহৃত হয় তবুও সুজুকি বলেন, পা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাঁর অনুশীলনের মূল ধরনটাই হচ্ছে শরীরের ওপরের অংশ অনড় থকবে, হাতও খুব কম ব্যবহৃত হবে কিন্তু তাঁর অনুশীলনের মূল আগ্রহের বিষয় হলো অভিনেতার পা। সাধারণত পদাঙ্গুলিতে ভর দিয়ে এক পায়ের মাধ্যমে 'ব্যালে' শিল্পীর ঘূর্ণন-কৌশলকে 'পিরোয়েট' (Pirouette) বলা হয়। পায়ের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শরীরের প্রতিবন্ধকতাগুলো থেকে অভিনেতার মুক্তি পাওয়া সম্ভব। ডাচ পণ্ডিত গেরহার্ড যাকারাইয়াস (Gerhard Zacharias) ১৯৬৪ সালে 'ব্যালে' (Bellet) নিয়ে একটা বই লেখেন। এই বইয়ে তিনি ব্যালে নৃত্যের একটি বিশেষ চলন সম্পর্কে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন যাকে বলা হয় 'পিরোয়েট' (Pirouette)। এই চলনের বিশেষত্ব হলো ভূমিতে পায়ের চাপ দেওয়ার মধ্য দিয়ে শক্তি কীভাবে অর্জিত হয় তার এক প্রতীক

হলো পিরোয়েট (Pirouette) চলন। এই সূত্রে সম্পর্কিত করে বলা যায় যে, জাপানের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনা শিল্পগুলোতে ভারসাম্য তৈরি করা হয় বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে। যেমন : উচ্চতা-গভীরতা, আকাশ-পৃথিবী। সুজুকি এই বিষয় উল্লেখ করে বলেন, পেলভিক (Pelvic) এরিয়াতে অভিনেতা যে শক্তিটা সঞ্চয় করবে সেটাও ঠিক এইভাবেই শরীরের ওপর এবং নিচের অংশে সমানভাবে প্রসারিত হবে। 'পিরোয়েট' চলন ও ভূমির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সৃজনশক্তির যে প্রবহমান ছন্দ তৈরি হয় সে প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুজুকি বলেন :

> The pirouette is a symbol of the strength required to press down the foot. The foot that appears in a dream is that organ of the body that touches the ground, expressing the connection between the body and the surface of the earth. [...] The pirouette, in the classical dance, represents (in contrast to the usual academic explanations) the manifestation of a dynamic harmony, an equilibrium between height and depth, sky and earth, weightlessness and weight. The traditional Japanese performing arts share this balance between height and depth, sky and earth.[১৭]

সুজুকির অনুশীলনে ভূমিতে বসা, দাঁড়ানো, চরণের ছন্দময় আঘাত (Stamping) এবং এর পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে অভিনেতার শরীর দৃঢ় হয়। এই ব্যায়াম দৈনন্দিন শরীরের যে অনুভূতি প্রকাশের ভাষা তাকে বিলোপ করে এক বিশেষ শারীরিক ভাষা তৈরি করে। আর এই অনুশীলনে রয়েছে :

- অভিকর্ষ চলন (Gravity movement)
- উপবেশন ও দণ্ডায়মান মূর্তিমানতা (Sitting and standing statues)
- পায়ের পেশিতে চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে ধীর গতির হাঁটা (Slow tenteketen)
- ছন্দময় সজোর পদাঘাত (Stomping)
- ধীরগতির স্বতঃস্ফূর্ত চলন (Shaku-hachi)
- দশ প্রকার হাঁটা (Ten walks)

সুজুকি উদ্ভাবিত চলনের (Movement) তিনটি প্রধান ধরন রয়েছে : হাঁটা, দাঁড়ানো এবং বসা।

মেঝেতে বসার কিছু ধরন তিনি উল্লেখ করেন। যেমন:

- পা ভাঁজ করে বসা (Feet folded under the legs)
- পা বাইরে ভাঁজ করে বসা (Feet folded outside the legs)
- আড়াআড়ি পা (Cross-legged)
- আড়াআড়ি পা এবং পায়ের তালু উপরে নির্দেশিত (Cross-legged with the palms of the feet turned up)
- আড়াআড়ি পা এবং পা আংশিক জড়ানো (Cross-legged with feet partially intertwined)
- আড়াআড়ি পা এবং পা পুরোপুরি জড়ানো (Cross-legged with feet fully intertwined)

- পা প্রসারিত করে বসা (Sitting with feet extended)
- এক পা জড়িয়ে হাঁটু বাঁকিয়ে বসা (One leg crossed, one knee bent)
- দুই পা বাঁকিয়ে বসা (Both legs bent)
- দুই পা বাহু দিয়ে জড়িয়ে বসা (Squatting, legs hugged by the arms)
- হাঁটু গেড়ে নতজানু হয়ে বসা (Kneeling)

মেঝেতে বসার এই ধরনগুলো হাঁটু থেকে সৃষ্ট গতির মুক্ত সম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত করে। সুজুকি যেমন বলেন :

> This sitting position was adopted by noblemen in ancient times. The variant of kneeling on one foot can be seen in the *no`*. the squatting position in used when defecating, and squatting on the toes can be observed in *sumo`* wrestling. All involve an opening motion of the knees. These, plus variations-sitting with the feet under the legs such as when sitting with the legs to one side, or kneeling when the hips are lifted-represent the total of five basic sitting positions on the floor, probably about all the possibilities.[১৮]

'নো' থিয়েটার এবং সুমো রেসলিং থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা ও পায়ের সঙ্গে বসার সম্পর্কিত আলোচনার পর, সুজুকি হাঁটা সংক্রান্ত অনুশীলনের রূপরেখা তুলে ধরেন :

১ ভূমিতে সজোর পদাঘাত (Foot stamping)
২ পায়রা আঙুলে হাঁটা (Pigeon toed walk)
৩ ডান-বাম হাঁটা (Side-step walk)
৪ পিছলে চলা (Sliding walk)
৫ ছুঁড়ে চলা (Throwing the feet)
৬ আঙুলের ডগায় চলা (Tip toe)
৭ দুই পা বাইরে ছড়িয়ে হাঁটা (Out-ward walk)
৮ দুই পায়ের পাতা এক করে হাঁটু ছড়িয়ে হাঁটা (Baw legged walk)
৯ সজোরে পদাঘাত করে ডান-বাম হাঁটা (Side-step walk and foot stamp)
১০ হাঁটু ও নিতম্ব বাঁকা করে পায়ে ভর দিয়ে হাঁটা (Squat walk)

মেঝের সাথে ঘনিষ্ঠতার প্রতীকায়ন করতে গিয়ে সুজুকি টেনে টেনে হাঁটার (Dragging) চর্চার কথা বলেন। জাপানি সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণায় শিনোবু ওরিকুচি (Shinobu Orikuchi, 1887-1953) আবিষ্কার করেন যে, জাপানী ঐতিহ্যের মূলে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে পায়ের ছন্দময় আঘাত।[১৯] 'নো' থিয়েটারের সানবাসো (Sanbaso) পরিবেশনায় পায়ের ব্যবহার হয়, যা প্রশান্তির অনুভূতি এবং

ঐক্যের উপলব্ধি সঞ্চার করে। অভিনেতার শারীরিক গঠন যাই হোক না কেন অভিনেতার শরীরের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এই অনুশীলন গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্পর্কে সুজুকি বলেন :

> Yet there is absolutely no connection between these exercises and the length of an actor's legs. Nor is it a question of bodily strength. The exercises are intended as a means to discover a self-awareness of the interior body, and the actor's success in doing them confirms his ability to make that discovery.[২০]

শরীর এবং ভূমির দোলনা স্থাপন

সুজুকি পদ্ধতি, বস্তুত, পায়ের অনুশীলনের মাধ্যমে শরীরের অন্তঃস্থ অবস্থা সম্পর্কে আত্ম-সচেতনতার আবিষ্কারের উপায় খোঁজে। সুজুকি প্রস্তাব করেন যে, 'একটি পরিবেশনা তখনই শুরু হয় যখন অভিনেতার পা মঞ্চের মেঝেকে স্পর্শ করে এবং অভিনেতার পা যে মঞ্চে স্পর্শ করলো এই অনুভূতি যখন সে পায়।'[২১]এই স্পর্শের অনুভূতি পাওয়ার ফলে অভিনেতা যতই চলনের ব্যবহার করুক না কেন মঞ্চের সঙ্গে তার প্রত্যেকটি চলনের একেকটি বিশেষ যোগাযোগ তৈরি হয়। সুজুকি পদ্ধতির এক সাধারণ অনুশীলন হলো সংগীতের সঙ্গে অভিনেতাদের একটা নির্দিষ্ট ছন্দে সজোর পদাঘাত (Stamping) করা। Stamping এর মধ্য দিয়ে অভিনেতাদের পেলভিক (Pelvic) অংশটা নমনীয় হয়। এই প্রসঙ্গে সুজুকি বলেন :

> The gesture of stamping on the ground, whether performed by Europeans or Japanese, gives the actor a sense of the strength inherent in his own body. It is a gesture that can lead to the creation of a fictional space, perhaps even a ritual space, in which the actor's body can achieve a transformation from personal to the universal.[২২]

স্ট্যাম্পিং একটা ছন্দে চলতে থাকে এরপর সংগীত বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং অভিনেতারা শুয়ে পড়ে। তারপর ব্যবহৃত সংগীত আবার ধীরে বাজানো হয় এবং অভিনেতারা সেই ছন্দ-লয়ের সাথে ধীরে ধীরে উঠে পড়ে। এই অনুশীলনের মধ্য দিয়ে অভিনেতার শরীরে গতি এবং স্থিরতার পরস্পর-বিরোধী একটি বোধ তৈরি হয় এবং শরীরের নিয়ন্ত্রণ শক্তি বৃদ্ধি পায়। এর মধ্য দিয়ে ছন্দের সঙ্গে অভিনেতার শরীর প্রতিক্রিয়া করে। এই সংগীতযুক্ত অনুশীলনের একমাত্র উপাদান হলো এর ধারাবাহিকতা, এর মধ্য দিয়ে অভিনেতার মনোযোগ বৃদ্ধি পায়। সুজুকি বলেন তাঁর এই অনুশীলনের অনন্যতা হলো একজন অভিনেতা নিজের পুরো শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে পেলভিক (Pelvic) বা কটিদেশের মাধ্যমে। এই বিষয়ে আরো ব্যাখ্যা করে সুজুকি বলেন :

> In ordinary life, we have little consciousness of our feet. The body can stand of its own accord without any sense at all of the relationship of feet to earth; in stamping, we come to understand that the body establishes its relation to the

> ground through the feet, that the ground and the body are not two separate entities. We are a part of the ground. Our very begins will return to the earth when we die.[২৩]

নিত্যদিনের জীবনে আমরা ভেবে ভেবে পা ফেলি না, এমনি চলতে পারি, এমনকি কোনো সতর্কতারও দরকার হয় না। এই একই স্বতঃস্ফূর্ততা তিনি মঞ্চে নিয়ে আসতে চান। এই বিষয়ে সুজুকি মঞ্চের মেঝে আর শরীরকে আলাদা করতে চান না। শরীর আর মেঝে বা ভূমি এক মনে হবে, এই প্রায়োগিক ও দার্শনিক রূপরেখাই মূলত তাদাশি সুজুকির চরণের ব্যাকরণ নির্মাণ করেছে, এটাই তাঁর অভিলক্ষ্য। কারণ, আমরা মৃত্যুর পর ভূমিতেই ফিরে যাই।

উপসংহার

অভিনেতাকে তার শরীর এবং স্বরের যথাযথ প্রস্তুতি নিতে হয় যার কারণে অভিনেতার বিভিন্ন উপায়ে অধ্যয়ন ও অনুশীলন করা আবশ্যক। এই আবশ্যকতার প্রয়োজনীয়তা খুঁজে পাওয়া যায় সুজুকি'র বক্তব্যে যেখানে তিনি বলেছেন, 'An actor cannot simply decide for himself what skills he needs'.[২৪] আদিম যুগে মানুষ যখন অন্ধকার গুহায় বাস করতেন, শিকার করতেন, অনুকরণের মাধ্যমে তাদের ভাব প্রকাশ করতেন, জীবন যাপনের তাগিদে ভাষা হিসেবে শরীরকে ব্যবহার করেছিলেন। তখনই বেঁচে থাকার প্রয়োজনে জন্ম হয়েছিলো শিল্পের। 'মানুষ যা প্রকাশ করতে চায় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তা ক্রমশ গভীরতা ও বিস্তৃতি লাভ করে'।[২৫] ফলে মঞ্চ পরিবেশনাকে, এর শিল্প বা নান্দনিকতাকে শুধু এটা দিয়ে বিচার করা উচিত হবে না যে, অভিনেতারা কতটা অন্তরঙ্গভাবে প্রতিদিনকার জীবনের আচরণ তুলে ধরতে সক্ষম হচ্ছেন! প্রাত্যহিকতার মানদণ্ড দিয়ে শিল্প বিচার্য নয়। একজন অভিনেতা তার শব্দ বা কথা এবং অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে দর্শকের কাছে সেটাই পৌঁছে দিতে চায় যেটা দর্শককে এক প্রগাঢ় সত্যের মুখোমুখি করে, পল অ্যালেইন সুজুকির অনুশীলন পদ্ধতির দর্শন নিয়ে বলেন : 'Suzuki training also attempts to integrate physical and mental systems, to creat a 'body-mind'. The practice is demanding corporeally and is particularly hard on the feet and legs, yet requires equal concentration and strength of will'.[২৬] সুজুকি মনে করেন শরীরকে মনের সঙ্গে যুক্ত করার ইচ্ছাকেই বিচার করা উচিত। এই সূত্রে জাপানি অভিনেতা যাদের হাত-পা একটু খাটো তারা আসলে যেভাবে অন্য উপায়ে একটা কিছু পরিবেশন করে এই ব্যাপারটাই বরং গুরুত্বপূর্ণ। এর বিপরীতে, একজন অভিনেতা তার যত বড় হাত-পা থাকুক না কেন সে যদি তার দর্শকের কাছে দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদন বা সত্য যা তা পৌঁছে দিতে না পারে তাহলে সেটা খুবই কুৎসিত একটা ব্যাপার হবে। সিনেমার সাথে থিয়েটারের পার্থক্য দেখিয়ে সুজুকি বলেন যে, মঞ্চের কোনো ক্লোজআপ দৃশ্যই আলাদাভাবে কোনো মজা তৈরি করে না যদি না অভিনেতার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ

তার শরীরের অংশ মনে না হয়। এই সূত্রে ইউজিনিও বারবা ও নিকোলা সাভারেজের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> Performer's energy is a readily identifiable quality: it is the performers nervous and muscular power. The mere fact that this power exists is not particularly interesting, since it exists, by definition, in any living body. What is interesting is the way this power is moulded in a very special context: the theatre [...] Every theatrical tradition has its own way of saying whether or not the performer functions as such for the spectator. This 'functioning' has many names: in the Occident, the most common is energy, life, or more simply, the performer's presence. In Oriental theatrical traditions, other concepts are used, as we will see, and one finds expressions like *prana* or *shakti* in India; *koshi, ki-hai* and *yugen* in Japan.[২৭]

একটা পরিবেশনা যখন সত্যিই কার্যকরী হয় তখন যদি অভিনেতা ছোটখাটোও হয় তখন অভিনয়ের ধরনটা বা অভিনেতাকে মঞ্চের চেয়েও অনেক বড় মনে হয়। অভিনেতা যদি তার পুরো শরীর নিয়ে মঞ্চে উপস্থিত থাকে তাহলে অভিনেতাকে অনেক বেশি শক্তিশালী মনে হয় যা দর্শককে সত্যের মুখোমুখি করে। কারণ সুজুকির মতে, পায়ের মাধ্যমে অভিনেতার মঞ্চের সাথে এই যে সংযোগ যা মূলত সে যে অভিনেতা তা-ই প্রমাণ করে। পায়ের সঙ্গে ভূমির সম্পর্কের মধ্য দিয়ে মানুষের অস্তিত্বশীলতা নির্ণীত হয় এবং সেখানে শরীরের মৌলিক অভিব্যক্তিটা কী এই তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন সুজুকির কাজকে একটা বিশেষত্ব দিয়েছে। অন্যদিকে, ভরত *নাট্যশাস্ত্র*-এ বর্ণিত চারীবিধান অঙ্গ ও অঙ্গবিক্ষেপের সূত্রাবলির পাশাপাশি চরণের বিধান সম্পর্কে যে বিস্তারিত ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূত্রাবলি উপস্থাপন করেন তা পদসঞ্চালন সম্পর্কিত প্রাচীন ভারতীয় নান্দনিক জ্ঞান তুলে ধরে। তবে, *নাট্যশাস্ত্র* বর্ণিত চারীবিধান দুটো বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে। প্রথমত, চারীবিধান পদসঞ্চালনার বিশেষায়িত ও প্রতীকবদ্ধ প্রয়োগ নিয়ে দিক নির্দেশনা দেয়। দ্বিতীয়ত, চারীবিধান আঙ্গিকাভিনয়ের প্রস্তুতির একটি শারীরিক কৌশল তুলে ধরে যেখানে মনস্তাত্ত্বিক সংযোগ খুব ক্ষীণ। বিপরীতে, তাদাশি সুজুকি বর্ণিত চরণের ব্যাকরণ প্রতীকবদ্ধতা ছাপিয়ে শরীরের, সুনির্দিষ্টভাবে পায়ের, স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি সৃজনের দিকে মনোনিবেশ করে। পাশাপাশি, চরণের ব্যাকরণ ভূমির সঙ্গে পায়ের দোদুল্যমান সম্পর্ক যেমন খোঁজে তেমনি পা যে মনোজগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সঙ্গেও যুক্ত তার রূপরেখা তুলে ধরে।

অতএব, *নাট্যশাস্ত্র* বর্ণিত চারীবিধানের প্রতীকবদ্ধতার শৃঙ্খলা এবং তাদাশি সুজুকির চরণের ব্যাকরণ থেকে প্রাপ্ত পা ও ভূমির মধ্যকার আধ্যাত্মিক শক্তির সূত্রাবলির সংশ্লেষ ঘটিয়ে এক নতুন ধরনের আন্তঃসাংস্কৃতিক (Intercultural) অভিনয়-অনুশীলনের রূপরেখা প্রস্তুত করা সম্ভব।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ Tadashi Suzuki, *The way of acting : The theatre writings of Tadashi Suzuki*, Theatre communications group, New York, 1986, p. 08

২ Eugenio Barba and Nicola Savarese, *A Dictionary of Theatre Anthropology: The Secret Art Of The Performer*, Routledge London, 1991, p. 126

৩ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং প্রামাণ্যগ্রন্থ হলো ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*। খ্রিষ্টপূর্ব ২য় শতক থেকে খ্রিষ্টাব্দ ৩য় শতকের মধ্যে *নাট্যশাস্ত্রের* রচনাকাল বলে পণ্ডিতদের অভিমত। একে প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকোষও বলা হয়ে থাকে। নাট্যতত্ত্ব ব্যতিরেকে রসতত্ত্ব, অলংকার, ছন্দ, সংগীত প্রভৃতি বহু বিষয় এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। সমগ্র গ্রন্থটি ৩৬টি অধ্যায়ে এবং ৫০০০ শ্লোকে বিবৃত। (ড. সুপর্ণা বসু মিশ্র, ২০১৩, *সংস্কৃত সাহিত্যে ইতিহাস*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা)

৪ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্তী অনূদিত, *ভরত নাট্যশাস্ত্র (২য় খণ্ড)*, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৪৪

৫ গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়, *নৃত্য দর্পণ*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৪১

৬ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্তী অনূদিত, *ভরত নাট্যশাস্ত্র (২য় খণ্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৩

৭ Adya Rangacharya, *The Natyasastra English Translation with Critical Notes*, Munshiram Manoharlal Publisher Pvt. Ltd, New Delhi, 2010, p. 90

৮ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্তী অনুদিত, *ভরত নাট্যশাস্ত্র (২য় খণ্ড)*, প্রাগুক্ত, ১৯৮২, পৃ. ৪৪

৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

১০ গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়, *নৃত্য দর্পণ*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৪১-৪৩

১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

১২ Anjala Maharishi, *A Comparative Study Of Brechtian And Classical Indian Theatre*, National School of Drama, New Delhi, 2000, p. 99

১৩ Tadashi Suzuki, *The way of acting: The theatre writings of Tadashi Suzuki*, Ibid, p. 03

১৪ *Ibid*, pp. 3-4

১৫ *Ibid*, p. 7

১৬ গীতা সেনগুপ্ত, *বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক*, নবনী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ১৯৩

১৭ Tadashi Suzuki, *The way of acting: The theatre writings of Tadashi Suzuki*, Ibid, p. 10

১৮ *Ibid*, p. 18

১৯ *Ibid*, p. 11

২০ Tadashi Suzuki, *Culture Is The Body: The Theatre Writings Of Tadashi Suzuki*, Kameron H. Steele (trans), Theatre Communications Group, NY, 2015, p. 72

২১ Tadashi Suzuki, *The way of acting: The theatre writings of Tadashi Suzuki*, Ibid, p. 08

২২ Tadashi Suzuki, *The way of acting: The theatre writings of Tadashi Suzuki*, Ibid, p. 12

২৩ *Ibid*, p. 9

২৪ Tadashi Suzuki, *Culture Is The Body: The Theatre Writings Of Tadashi Suzuki*, Ibid, p. 76

২৫ গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়, *নৃত্য দর্পণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

২৬ Paul Allain, *The Art of Stillness: The Theatre Practice of Tadashi Suzuki*, PALGRAVE MACMILLAN, NY, 2003, p. 96

২৭ Eugenio Barba and Nicola Savarese, *A Dictionary of Theatre Anthropology: The Secret Art Of The Performer*, Routledge London, 1991, p. 74

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, তেতাল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩২/ডিসেম্বর ২০২৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43ii.008

জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা উপন্যাসে ক্ষমতা-সম্পর্কের স্বরূপ

মো. গোলাম মাহ্‌মুদ পাভেল*

সারসংক্ষেপ

শহীদুল জহিরের *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* উপন্যাসে পুরনো ঢাকার একটি মহল্লার যে সমাজ-কাঠামোর সাক্ষাৎ মেলে তার ক্ষমতা-কাঠামোর কেন্দ্রে অবস্থান করছে রাজাকার বদরুদ্দিন মওলানা; আর প্রান্তে আছে মহল্লাবাসী জনতা। তবে বদরুদ্দিনের সাথে মহল্লাবাসীর এই ক্ষমতার সম্পর্ক পূর্বাপর অপরিবর্তিত থাকেনি। মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব, যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন উক্ত মহল্লার সামাজিক ক্ষমতা-সম্পর্কে গুণগত পরিবর্তন সাধন করেছে। বর্তমান প্রবন্ধে সময়ের এই তিন পর্বে উপন্যাসটিতে বর্ণিত সমাজের সামাজিক ক্ষমতা-সম্পর্কসমূহ বিশ্লেষিত হয়েছে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী আলোকপ্রক্ষেপে এবং সেই সূত্রে মহল্লাটির ক্ষমতাকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত বদরুদ্দিনের ক্ষমতা অর্জন ও প্রয়োগের কৃৎকৌশল অনুসন্ধান করে মহল্লাবাসীর উপর চর্চিত তার ক্ষমতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত মার্কসবাদী সমাজতাত্ত্বিকগণের, প্রধানত আন্তনিও গ্রামসির, তত্ত্বের ভিত্তিতে ক্ষমতা-সম্পর্কের দুই রূপ 'প্রভুত্ব' ও 'আধিপত্য' বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে প্রবন্ধের শুরুতে। এছাড়া উপন্যাসটিতে অর্থনৈতিক শ্রেণি-সম্পর্কের অনুপস্থিতির কারণে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী প্রেক্ষণে টেক্সটটি পাঠের সীমাবদ্ধতার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

চাবি-শব্দ: শহীদুল জহির, *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা*, ক্ষমতা-সম্পর্ক, উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ, প্রভুত্ব, আধিপত্য।

প্রস্তাবনা

কথাকোবিদ শহীদুল জহির (১৯৫৩-২০০৮) বাংলাদেশ ও বাঙালির জাতীয় জীবনের প্রায় দেড় যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকে পুরনো ঢাকার লক্ষ্মীবাজারের শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী লেনের একটি মহল্লার অধিবাসীদের মুক্তিযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী পনের বছরের জীবন-বাস্তবতার প্রতীকাভাসে বয়ন করেছেন তাঁর প্রথম উপন্যাস *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা*'য় (১৯৮৭)। অর্থাৎ, তাঁর অপরাপর কথাসাহিত্যের মতো, এ-উপন্যাসে বর্ণিত মহল্লাটিও হয়ে উঠেছে সমগ্র বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি এবং মহল্লাবাসী প্রতিটি চরিত্র হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক শ্রেণির প্রতিভূ। কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক লিখেছেন :

> এই মহল্লাটি শহীদুল জহিরের এক টুকরো বহির্বাস্তব। সেই বাস্তবই তাঁর উপন্যাসের অবলম্বন। ঐটুকু সীমানা-বাঁধা, সময়-বাঁধা, ঘটনা-বাঁধা বাস্তব অক্ষরশব্দবাক্যঠাসাই হয়ে মাত্র বাহান্ন পৃষ্ঠার মধ্যেই রূপান্তরিত হয়ে যায় সারা বাংলাদেশে। পুবে থেকে পশ্চিমে ছড়ানো, উত্তর থেকে দক্ষিণে সমুদ্রশায়ী বাংলাদেশে। তার বিস্তৃত রণাঙ্গনে। ঐ মহল্লার বিশ ত্রিশ হাজার মানুষ একাত্তরের সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে।[১]

সুতরাং, উক্ত মহল্লার ক্ষমতা-কাঠামোকে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী পনের বছর সময়ে সমগ্র বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা-কাঠামোর একটি পাঠ রচনা করা

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্ভব। এই পাঠ উক্ত সময়ে-পর্বে বাংলাদেশে বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক শ্রেণিসমূহের পারস্পরিক ক্ষমতা-সম্পর্কের স্বরূপকে উন্মোচিত করবে এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা-সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা দেবে। বর্তমান প্রবন্ধটি উক্ত বিশ্লেষণকর্মের একটি প্রয়াস।

সাহিত্য-সমীক্ষা

প্রথম প্রকাশের পর দীর্ঘকাল শহীদুল জহিরের *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* উপন্যাসটি পাঠক-সমালোচকের যথাযোগ্য মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি। অথবা, বলা ভালো, বাংলা সাহিত্যের পাঠক-সমালোচকদের এ-উপন্যাসের জন্য সহৃদয়হৃদয়সংবেদী হয়ে উঠতে অনেকটা সময় লেগেছে। তাই উপন্যাসটি প্রকাশের প্রায় দেড় দশক পর সমালোচক আহমাদ মাযহার তাঁর *আধুনিকতা: পক্ষ, বিপক্ষ* (২০০১) গ্রন্থে এ-উপন্যাস নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন আক্ষেপের সুরে :

> কয়েক বছর আগে প্রকাশিত হলেও *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* সম্পর্কে কোনও উল্লেখযোগ্য আলোচনা কোনও পত্রিকায় এমনকী কোনও লিটল ম্যাগাজিনেও চোখে পড়ে নি। লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকদের পক্ষে অর্থাৎ যাঁরা সাহিত্যকে অত্যন্ত গভীর চেনতাশ্রয়ী মাধ্যম বলে মনে করেন তাঁদের দিক থেকে এটি অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার। একটি নতুন এবং আন্তরিক সাহিত্যিক প্রচেষ্টার মূল্যায়ন তার উৎকর্ষোপকর্ষ নির্বিশেষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সেই দায়িত্ববোধ থেকেই এই আলোচনার সূচনা।[২]

জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা উপন্যাসের বিষয় ও আঙ্গিক নিয়ে অতিসংক্ষিপ্ত আলোচনা করে আহমাদ মাযহার তাঁর দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। এরপর সময় যত গড়িয়েছে ততই পাঠক-সমালোচকদের কাছে যুগপৎ এ-উপন্যাস ও এর লেখক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন স্ব-গুণে। তাই আজ আর বিভিন্ন গ্রন্থ-পত্রিকায় উপন্যাসটি নিয়ে লিখিত আলোচনা, সমালোচনা বা গবেষণা-প্রবন্ধ অপ্রতুল নয়। ডক্টর মোহাম্মদ আবদুর রশীদের সম্পাদনায় প্রকাশিত *শহীদুল জহির স্মারকগ্রন্থ*, লিটল ম্যাগাজিন *লোক* ও *শালুক*-এর শহীদুল জহির সংখ্যায় এ-উপন্যাসটি আলোচিত হয়েছে গুরুত্বের সাথে। হাসান আজিজুল হক তাঁর 'সোনা-মোড়া কথাশিল্প: শহীদুল জহির' প্রবন্ধে উপন্যাসটিকে চিহ্নিত করেছেন শহীদুল জহিরের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবে :

> ... ১৯৮৯ সালে বেরুলো উপন্যাস 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা'। একেবারে প্রদীপ্ত যৌবনের রচনা। না কোনো খোকামি, না কোনো বালখিল্যতা, প্রখর পরিণত লেখকের লেখা উপন্যাস। বলতে ইচ্ছে হয়, এই লেখাটি আর তিনি কোনোদিনই অতিক্রম করতে পারেন নি, (ছোটগল্পের কথা এখানে হিসেবে ধরছি না) এমনি সুপরিণত, এমনি আবেগ আর বুদ্ধির টান টান ভারসাম্যে তা বাঁধা।[৩]

গবেষক নিপা জাহান তাঁর 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা : ইতিহাসের বিকল্প বয়ান' শীর্ষক প্রবন্ধে উপন্যাসটির ঐতিহাসিক সমালোচনার মাধ্যমে এর ভাবপরিমণ্ডল, বর্ণনাসূত্র, চরিত্রায়ণ ও ভাষাভঙ্গির বিশ্লেষণ করে শহীদুল জহির এ-উপন্যাসে ইতিহাসের যে বিকল্প বয়ান নির্মাণ করেছেন তার ওপর আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে, '*জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা*র ইতিহাস রাজনৈতিক টেবিলওয়ার্কের কাছে বাঙালি চেতনার আপাত হেরে যাবার ইতিহাস।'[৪] অপরাপর সমালোচকও উপন্যাসটিতে শহীদুল জহিরের বিষয়স্বাতন্ত্র্য ও আঙ্গিকের অভিনবত্বকে তাঁদের

আলোচনার কেন্দ্রে রেখেছেন। কিন্তু দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের আলোয় এর ক্ষমতা-কাঠামো বিশ্লেষণের সুযোগ থাকলেও কেউ-ই তা গ্রহণ করেননি।

ক্ষমতা-সম্পর্কের দুই রূপ : 'প্রভুত্ব' ও 'আধিপত্য'

মানুষ তার পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, এমনকি ধর্মীয় জীবনেও আবদ্ধ থাকে বিচিত্র ক্ষমতা-সম্পর্কের বেড়াজালে। কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) দাস, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিবাদী প্রভৃতি শ্রেণিবিভক্ত সমাজের অর্থনৈতিক ক্ষমতা-সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করেছিলেন যথাক্রমে দাসপ্রভু-দাস (slave owner-slave), ভূস্বামী-কৃষক (feudal lord-serf), পুঁজিপতি-শ্রমিক (bourgeoisie-proletariat) প্রভৃতি যুগ্ম-বৈপরীত্যের (binary-opposition) সাহায্যে।[৫] সৃজনশীল মার্কসবাদী চিন্তক আন্তোনিও গ্রামসি (১৮৯১-১৯৩৭) মার্কসীয় এই সমাজবীক্ষাকে আরও সম্প্রসারিত করেন। তিনি সকল শ্রেণিবিভক্ত সমাজস্থ প্রতিটি ক্ষমতা-সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করেছেন উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ (dominant- subaltern) যুগ্ম-বৈপরীত্যের সাহায্যে; যেখানে, বলা বাহুল্য, ক্ষমতার সম্পর্ক সূত্রে উচ্চবর্গের অধঃস্থ শ্রেণি নিম্নবর্গ।[৬]

প্রশ্ন হল, উচ্চবর্গ কী কৌশলে নিম্নবর্গের ওপর ক্ষমতা অর্জন ও প্রয়োগ করে? পূর্বে ক্ষমতাকে সর্বদা কেবল বল প্রয়োগ বা দমনের যন্ত্র হিসেবে দেখা হতো। বল প্রয়োগ ক্ষমতালাভ ও চর্চার আদিতম কৌশল হলেও গ্রামসির মতে, উচ্চবর্গ সবসময় যে কেবল বল প্রয়োগের মাধ্যমেই নিম্নবর্গকে তার কর্তৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য করে এমন নয়, বরং অনেকক্ষেত্রে নিম্নবর্গের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতির ভিত্তিতেও উচ্চবর্গ ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, যেকোনো সমাজে একটি সামাজিক গোষ্ঠীর ওপর অপর গোষ্ঠীর প্রাধান্য দু-ভাবে প্রকাশিত হতে পারে : বল প্রয়োগ ও মতাদর্শগত সম্মতি। নিম্নবর্গের ওপর উচ্চবর্গের ক্ষমতা অর্জন এবং বজায় রাখার এই দ্বিবিধ কৌশল প্রসঙ্গে গ্রামসির বক্তব্য :

> The methodological criterion on which our own study must be based in the following: that the supremacy of a social group manifests itself in two ways, as "domination" and as "intellectual and moral leadership". A social group dominates antagonistic groups, which it tends to "liquidate", or to subjugate perhaps even by armed force; it leads kindred and allied groups. A social group can, and indeed must, already exercise "leadership" before winning governmental power (this indeed is one of the principal conditions for the winning of such power); it subsequently becomes dominant when it exercises power, but even if it holds it firmly in it's grasp, it must continue to "lead" as well.[৭]

গ্রামসি-কথিত 'domination'-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'প্রভুত্ব'; আর 'intellectual and moral leadership', যাকে গ্রামসি এক কথায় 'hegemony' শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপন করেছেন, এর বাংলা প্রতিশব্দ 'আধিপত্য'। 'প্রভুত্ব' হলো ক্ষমতার সেই রূপ যা অর্জিত হয় বল প্রয়োগ বা দমন-পীড়নের সাহায্যে। অপরদিকে মতাদর্শগত সম্মতির ভিত্তিতে অর্জিত ক্ষমতার রূপভেদ হল 'আধিপত্য'[৮]।

গ্রামসির মতে ক্ষমতা অর্জন ও অর্জিত ক্ষমতা ধরে রাখতে হলে যুগপৎ প্রভুত্ব ও আধিপত্য উভয়বিধ কৌশলই জারি রাখতে হয়। মার্কস-এঙ্গেলসের লেখায়ই বিপ্লব সফল করার জন্য চিন্তার জগতে জনগণকে আকৃষ্ট করার গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গিয়েছিল। তাঁরা লিখেছিলেন :

> The weapon of criticism cannot, of course, replace criticism of the weapon, material force must be overthrown by material force; but theory also becomes a material force as soon as it has gripped the masses.[৯]

নব্য-মার্কসবাদী চিন্তক লুই আলথুসারও (১৯১৮-১৯৯০) শক্তি-প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা-চর্চার পাশাপাশি 'আদর্শবাদের হাতিয়ার' ব্যবহার করে সম্মতি আদায়ের মাধ্যমে ক্ষমতা প্রয়োগের কথা বলেছেন :

> আলথুসার রাষ্ট্রের ক্ষমতা আর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ভেদরেখা টেনেছেন। তাঁর মতে রাষ্ট্র দু'ভাবে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে: ১. দমনমূলক সংগঠনের (repressive structures) মাধ্যমে এবং ২. রাষ্ট্রীয় আদর্শবাদের হাতিয়ারের (state ideological apparatuses) মাধ্যমে। দমনমূলক সংগঠনসমূহের মধ্যে আছে পুলিশ, কোর্টকাচারি, জেলখানা, সেনাবাহিনী ইত্যাদি; আদর্শগত হাতিয়ার হল রাজনৈতিক দল, বিদ্যালয়, মিডিয়া, ধর্মীয় উপাসনালয়, পরিবারতন্ত্র এবং শিল্প-সাহিত্য।[১০]

আলথুসার-কথিত এই 'দমনমূলক সংগঠন' ও 'রাষ্ট্রীয় আদর্শবাদের হাতিয়ার' গ্রামসির রচনায় যথাক্রমে 'রাজনৈতিক সমাজ' (political society) ও 'সিভিল সমাজ' (civil society) হিসেবে অভিহিত হয়েছে।

গ্রামসির আধিপত্যের ধারণাটি মূলত মার্কসবাদীদের 'আইডিওলজি' (ideology) ধারণারই একটি 'সংশোধিত ব্যাখ্যা'। সাধারণত আইডিওলজি বলতে কোনো জনগোষ্ঠীর সচেতনভাবে ধারণকৃত যুক্তিগ্রাহ্য ধারণাপ্রপঞ্চকে বোঝালেও মার্কসবাদীদের মতে আইডিওলজি হল : 'যা জগৎকে আমাদের কাছে ভুলভাবে তুলে ধরে, যা সামগ্রিকভাবে সমাজের বাস্তবতাকে আমাদের চোখে ফুটে উঠতে দেয় না, অর্থাৎ সমাজবাস্তবতার চেতনাকে কুয়াশাচ্ছন্ন কিংবা রুদ্ধ করে।'[১১] ক্ষমতাবান শ্রেণি কতিপয় আইডিওলজির মাধ্যমেই ক্ষমতাহীনদের কাছ থেকে তাদের শাসন-শোষণ ও ক্ষমতা প্রয়োগের সম্মতি আদায় করে :

> মার্কসীয় তত্ত্বমতে সমাজের ভিত বা base-এর অংশ হল শ্রেণিসম্পর্ক, আর আইডিওলজি হল উপরিকাঠামোর অংশ। সমাজের প্রধানতম আইডিওলজিগুলোর মধ্যে আছে ধর্ম, আইন এবং রাজনৈতিক সিস্টেম। শাসকশ্রেণী যেহেতু উপরিকাঠামো নিয়ন্ত্রণ করে, তারাই এটাও ঠিক করে দেয় ঐ সমাজের রাজনৈতিক-আইনগত-ধর্মীয় আইডিওলজি কী হবে। ভেতরকাঠামোর অন্তর্গত অধঃশ্রেণীগুলোকে শেখানো হয়, এই আইডিওলজিগুলোর পালন ও পরিপোষণই তাদের জন্য আদর্শ। শাসকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য নিবেদিত হয় ঐ বিশেষ সমাজের আইডিওলজি, যা অধঃশ্রেণীকে বিভ্রান্তির জালে বেঁধে শোষণের প্রক্রিয়াকে বৈধতা দান করে, এমনকি মহিমান্বিত করে।[১২]

গ্রামসির পূর্বে মার্কসবাদে আধিপত্যের ধারণা পাওয়া যায় রুশ বিপ্লবী ভ্লাদিমির লেনিনের (১৮৭০-১৯২৪) রচনায়। অক্টোবর বিপ্লবের (১৯১৭) দ্বারা প্রবলভাবে উজ্জীবিত গ্রামসি মূলত বলশেভিকদের এই অবিসংবাদিত নেতার কাছ থেকেই আধিপত্য সম্পর্কিত ধারণার বীজ লাভ

করেছিলেন। লেনিন রাশিয়ার জারতন্ত্র-বিরোধী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে (১৯০৫) শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্ব প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে গিয়ে এই ধারণাটি প্রয়োগ করেন। প্রথম দিকে তিনি শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বকেই আধিপত্য হিসেবে দেখলেও পরবর্তীকালে তিনি শ্রেণি-সংগ্রামের বৃহত্তর পটভূমিতে বিষয়টিকে ঢেলে সাজান। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বুর্জোয়াদের ক্ষমতাকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখলের প্রয়াসে নিয়োজিত শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রামের কর্তৃত্বকে যেমন লেনিন আধিপত্য হিসেবে অভিহিত করেছেন, তেমনি শ্রমিকশ্রেণি কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করার পর ক্ষমতা চর্চার একটি ধরন হিসেবেও আধিপত্যকে চিহ্নিত করেছেন।[১৩] গ্রামসি এই লেনিনীয় আধিপত্য তত্ত্বকে আরও ব্যাপক ও গভীরতর অর্থে উপস্থাপন করেছেন। তিনি শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবকে সফল করার জন্য বুর্জোয়া আধিপত্যের বিপরীতে 'পাল্টা-আধিপত্য' (counter-hegemony) প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্যের সারাৎসার হলো :

> বুর্জোয়া রাষ্ট্র যেমন স্বেচ্ছামূলক আনুগত্য এবং বলপ্রয়োগ তথা দমন-পীড়ন মারফত স্বীয় শ্রেণীর স্বার্থানুযায়ী সমাজকে চালিত করে, এই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবকে সার্থক করতে হলে, শ্রমিকশ্রেণীকেও তেমনই দ্বিবিধ অস্ত্র প্রয়োগ করতে হবে : প্রথমত, বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতি শ্রমিকশ্রেণী তথা অন্যান্য শ্রমজীবী শ্রেণীর স্বেচ্ছামূলক আনুগত্যকে নির্মূল করতে হবে এবং তার পরিবর্তে এইসব শ্রেণীর উপরে শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শগত প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে হবে, অর্থাৎ, শ্রমিকশ্রেণীকে জনগণের অন্যান্য অংশের স্বেচ্ছামূলক আনুগত্য অর্জন করতে হবে।[১৪]

লেনিন বলেছিলেন, রাশিয়ায় যেভাবে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে পশ্চিমা পুঁজিবাদী দেশগুলোতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তত সহজে হতে পারবে না। কারণ, ঐসব পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে ইতোমধ্যেই ধনতান্ত্রিক মতাদর্শ আধিপত্য বিস্তার করেছে।[১৫] গ্রামসি লেনিনের এই বক্তব্যের সংশ্লেষে বলেন, এই সকল রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক আধিপত্যের বিপরীতে শ্রমিকশ্রেণির চিন্তা ও আদর্শগত প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই কেবল বলপ্রয়োগের দ্বারা শোষকশ্রেণির রাষ্ট্রক্ষমতা উচ্ছেদের প্রচেষ্টা সফল হতে পারে। 'একটি কেন্দ্রীয় অভ্যুত্থানের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হবে এই ধারণার পরিবর্তে গ্রামশি বলেছেন এক দীর্ঘমেয়াদী কৌশলের কথা, যেখানে রাষ্ট্রযন্ত্রের শীর্ষস্তরে নয়, বরং নাগরিক সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভেতরে শ্রমিকশ্রেণী তার বিকল্প সামাজিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে।'[১৬]

ক্ষমতা প্রসঙ্গে মার্কসবাদী তাত্ত্বিকগণের উপর্যুক্ত বক্তব্যাবলির সমন্বয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কেবল বল প্রয়োগের সাহায্যে আশু ক্ষমতালাভ সম্ভব হলেও যুগপৎ আধিপত্যবাদী হয়ে উঠতে না পারলে সেই ক্ষমতাকে কখনোই টেকসই করা যায় না; আধিপত্যহীন প্রভুত্ববাদী ক্ষমতা হলো ক্ষমতার এক খণ্ডিত, অসম্পন্ন ও ফাঁপা অধ্যাসমাত্র। এই তাত্ত্বিক কাঠামোর ভিত্তিতে প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে শহীদুল জহিরের *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* উপন্যাসে বর্ণিত সমাজের সামাজিক ক্ষমতা-সম্পর্কসমূহ বিশ্লেষিত হয়েছে এবং সেই সূত্রে মহল্লাটির ক্ষমতাকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত বদরুদ্দিনের ক্ষমতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে।

জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা উপন্যাসে ক্ষমতা-সম্পর্ক

জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা উপন্যাসে যে মহল্লার কাহিনি বিধৃত হয়েছে তার সামাজিক ক্ষমতা-কাঠামোর কেন্দ্রে আছে মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব সময়ে একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য, যুদ্ধ-চলাকালে

রাজাকার বাহিনীর সর্দার এবং যুদ্ধোত্তর কালে ঐ একই রাজনৈতিক দলের বড় নেতায় পরিণত হওয়া বদরুদ্দিন মওলানা, আর তার প্রান্তে অবস্থান করছে মহল্লাবাসী সাধারণ জনতা। বৃত্তের ব্যাসার্ধের ন্যায় যে ক্ষমতা-সম্পর্কগুলো ক্ষমতা-কাঠামোর বৃত্তটিকে গঠন করেছে তার কেন্দ্রস্থ প্রান্তে ধ্রুবকের মতো অবস্থান করছে বদরুদ্দিন, আর পরিধিস্থ প্রান্তসমূহে আছে আবদুল মজিদ ও তার পরিবার, কিশোর আলাউদ্দিন ও তার মা, খাজা পরিবার, আবু করিমের বড় ছেলে, জমির ব্যাপারী, বদরুদ্দিনের স্ত্রী লতিফা, ইসমাইল হাজাম প্রমুখ মহল্লাবাসী চরিত্র।

যে ক্ষমতার সম্পর্কে বদরুদ্দিন ও মহল্লাবাসী জনতা পরস্পর সম্পর্কিত তাতে বদরুদ্দিন 'উচ্চবর্গ' হিসেবে চিহ্নিত এবং তার সাপেক্ষে অন্যান্য মহল্লাবাসী জনতাকে চিহ্নিত করা যায় 'নিম্নবর্গ' হিসেবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষশক্তি-বিপক্ষশক্তি, এই মৌল যুগ্ম-বৈপরীত্যেই উপন্যাসটির ক্ষমতাকেন্দ্রিক দ্বান্দ্বিকতার বিস্তরণ ঘটেছে। তবে প্রগতিশীল-প্রতিক্রিয়াশীল, অর্বাচীন-প্রাচীন, হিন্দু-মুসলমান, নারী-পুরুষ প্রভৃতি যুগ্ম-বৈপরীত্যও যুগপৎ ক্রিয়াশীল থেকেছে ক্ষমতা-সম্পর্কগুলো বিনির্মাণে। বলা বাহুল্য, প্রতিটি যুগ্ম-বৈপরীত্যের প্রথম ভুক্তির প্রতিনিধি মহল্লাবাসী জনতা আর দ্বিতীয় ভুক্তির প্রতিনিধি বদরুদ্দিন। অবশ্য উপন্যাসের কাহিনি-সূত্রের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বদরুদ্দিনের ক্ষমতাকেন্দ্র অনড় থাকেনি; অপর প্রান্তের আলোড়ন-আন্দোলনে বারবার টলে উঠেছে। আর মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর পরাজয়ে চূড়ান্তভাবে বদরুদ্দিন মহল্লার ক্ষমতা-কাঠামোর বৃত্ত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেছে। তবে যুদ্ধ-পরবর্তী পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে স্বল্পকালের মধ্যেই সে কৌশলে পুনরায় ক্ষমতাবৃত্তে প্রবেশ করে তার হারানো ক্ষমতাকেন্দ্রটি পুনরুদ্ধার করেছে।

উল্লেখ্য, যুদ্ধকালে বদরুদ্দিনের ক্ষমতার মূল উৎস পাকিস্তানি মিলিটারি উক্ত মহল্লার সামাজিক ক্ষমতা-সম্পর্কে অংশগ্রহণ করেছে খুব সামান্যই। সমগ্র উপন্যাসে মহল্লায় মিলিটারি এসেছে দুইবার; প্রথমবার যেন বদরুদ্দিনকে খুঁজে বের করার জন্যই তারা মহল্লায় এসেছিল, আর দ্বিতীয়বার এসেছিল বদরুদ্দিনের আহ্বানে মহল্লায় তার ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করতে। মহল্লার অপর ব্যক্তি, যে অন্তত যুদ্ধের পর বদরুদ্দিনের ক্ষমতাকেন্দ্রের বিকল্প হয়ে উঠতে পারত, সেই আজিজ পাঠান চরিত্রটিকেও ঔপন্যাসিক বিকশিত করেননি। যুদ্ধোত্তর কালে মহল্লার ক্ষমতা-সম্পর্কে বদরুদ্দিনের পুনঃপ্রবেশের ছাড়পত্র প্রদানের মধ্যেই উপন্যাসে তার ভূমিকা সীমাবদ্ধ থেকেছে। মহল্লার মুক্তিযোদ্ধারাও সে অর্থে এর সামাজিক ক্ষমতা-সম্পর্কে অংশগ্রহণ করেনি। মহল্লার তিনজন মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে বাবুল ও আলমগীরের কেবল নাম উল্লেখিত হয়েছে। অপর শহিদ মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সেলিমের আখ্যান কিছুটা বিস্তৃত হলেও তা থেকে মুখ্যত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি মহল্লাবাসীর দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের সিংহভাগ জুড়ে ঔপন্যাসিক বদরুদ্দিনের ওপরই আলোকসম্পাত করেছেন এবং তার বিপরীত যুগ্মতায় উপস্থিত করেছেন মহল্লাবাসী সাধারণ জনতাকে। তাই, মূলত, বদরুদ্দিন ও মহল্লাবাসী জনতাকে নিয়েই মহল্লার সামাজিক ক্ষমতা-সম্পর্কটি গড়ে উঠেছে।

ক্ষমতা-সম্পর্কের রূপ-রূপান্তর

১

উপন্যাসটির কাহিনির সিংহভাগ জুড়ে আছে যুদ্ধকালীন ঘটনাবলি। তবে উপন্যাসভুক্ত যুদ্ধ-পূর্ববর্তী দু'টি ঘটনা থেকে যুদ্ধ শুরুর পূর্বে মহল্লাবাসীর সাথে বদরুদ্দিনের সম্পর্ক তথা মহল্লার ক্ষমতা-সম্পর্কের স্বরূপ কী ছিল তা বুঝে নেয়া সম্ভব। প্রথম ঘটনাটি যুদ্ধের বেশ কয়েক বছর পূর্বের।[১৭] একদিন স্কুলের অনুষ্ঠানে গান গেয়ে ফেরার সময় আবদুল মজিদের বড় বোন মোমেনাকে বদরুদ্দিন 'মাগি, ডিম পারবার যাও' বলে গাল দেয়। বদরুদ্দিনের এই প্রতিক্রিয়াশীল আচরণের কার্যকারণ ছিল মোমেনার সংগীতচর্চা ও অসাম্প্রদায়িক জীবনচর্যা। ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন :

> তখন এই লক্ষ্মীবাজার এলাকায় মোমেনা ছিল একমাত্র মুসলমান মেয়ে যে গান গাইত। বাসন্তী গোমেজের সঙ্গে তার ভাব ছিল। আর বাসন্তী গোমেজ তাকে সেন্ট গ্রেগরিজ স্কুলের চার্চে প্রার্থনা-সঙ্গীতে অংশগ্রহণের জন্য নিয়ে যেত।[১৮]

রাস্তায় বদরুদ্দিন মোমেনাকে গাল দিলে ঘরে ফিরে মোমেনা 'কয় কি, ডিম পারবার যাও। হারামির পোলা আমারে কয় কি, মাগি, ডিম পারবার যাও' বলে বিলাপ করেছিল। আবদুল মজিদ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল 'কান্দিচ না আপা, মান্দারপোর থোতা ফাটায়া দিয়া আমুনে।'[১৯] যুদ্ধ-পূর্ববর্তী সময়ে বদরুদ্দিন যে মহল্লার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিল না, তা মোমেনা ও আবদুল মজিদের এইসব সংলাপ থেকে আঁচ করা যায়।

যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে সংঘটিত উপন্যাসভুক্ত দ্বিতীয় ঘটনাটি উক্ত ধারণার পক্ষে আরও জোরালো যুক্তি দাঁড় করায়। মহল্লায় মিলিটারি আসার তিনমাস নয় দিন পূর্বে তেরো বছরের কিশোর আলাউদ্দিন দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করায় বদরুদ্দিন তাকে 'হারামযাদা, খাঁড়ায়া খাঁড়ায়া মোতচ, খাঁড়ায়া মোতে কুত্তা' বলে শাসায়। প্রতিউত্তরে আলাউদ্দিন 'গালের ভেতর জিভ নেড়ে তাকে ভেঙায়, তারপর বলে, কুত্তা তো মুখ দিয়া খায়বি, আপনে অখনথন হোগা দিয়া খায়েন।'[২০] মহল্লায় মিলিটারি আগমনের পূর্বে আলাউদ্দিনের এই ঔদ্ধত্যের শাস্তিস্বরূপ তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া বদরুদ্দিনের পক্ষে সম্ভব হয়নি; যেমনটা সম্ভব হয়নি অশ্লীল কটূক্তি করা ছাড়া মোমেনার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়াও। বদরুদ্দিনের 'মাগি', 'হারামযাদা' সম্বোধনের প্রতিউত্তরে মোমেনা-মজিদ-আলাউদ্দিনরা তাকে 'হারামির পোলা', 'মান্দার পো' বলেই সম্বোধন করেছে। এ-থেকে বোঝা যাচ্ছে, যুদ্ধ-পূর্বকালে বদরুদ্দিন মহল্লার ক্ষমতা-কাঠামোর কেন্দ্রে সমাসীন ছিল না। তবে মহল্লার ক্ষমতাকেন্দ্রে আসীন হওয়ার অভিলাষ ও প্রয়াস তখন থেকেই তার কর্মকাণ্ডে প্রকট হয়েছিল।

২

যুদ্ধ শুরুর পর পাকিস্তানি মিলিটারির সাহায্যকারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বদরুদ্দিন মহল্লার ক্ষমতা-কাঠামোর কেন্দ্রে আসীন হয় : 'মহল্লার লোকেরা বলে যে, মহল্লায় প্রথমবার মিলিটারি আসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বদু মওলানাকে খুঁজে বের করা; বদু মওলানা প্রথমেই 'হাজির হুজুর' বলে উঠে দাঁড়িয়েছিল এবং তারপর মহল্লার লোকেরা তাকে চিনেছিল মহল্লার দণ্ডমুণ্ডের মালিকরূপে।'[২১] এভাবে ক্ষমতাকামী একজন সাধারণ ব্যক্তি, যে কিনা কিছুদিন পূর্বেও মহল্লার

রাস্তায় দাঁড়িয়ে কিশোর-কিশোরীদের সাথে কুরুচিপূর্ণ বাক্য-বিনিময় করেছে, মিলিটারির সাথে যোগসাজশে রাতারাতি মহল্লার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। যুদ্ধের নয় মাস বদরুদ্দিন মহল্লাবাসীর ওপর যে ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে তা সম্পূর্ণত বল প্রয়োগ ও দমন-পীড়নের মাধ্যমে অর্জিত প্রভুত্ববাদী ক্ষমতা। যে-ই তার একচ্ছত্র ক্ষমতার প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠেছে তাকেই সে বল প্রয়োগের মাধ্যমে অবদমিত করেছে।

বদরুদ্দিনের যুদ্ধকালীন প্রভু-শক্তির প্রথম বলি হয়েছে পূর্বোক্ত কিশোর আলাউদ্দিন। যুদ্ধ-পূর্ববর্তী ক্ষমতাহীনতার কারণে যার স্পর্ধার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হয়নি বদরুদ্দিন, যুদ্ধ শুরুর পরপরই নবলব্ধ প্রভুত্ববাদী ক্ষমতাবলে তাকে ধরাশায়ী করতে সক্ষম হয় সে। যুদ্ধ শুরুর পর মহল্লায় প্রথম নিহত হয় আলাউদ্দিন, '...যেদিন প্রথম বদু মওলানা এবং ক্যাপ্টেন ইমরান পরস্পরকে আবিষ্কার করে, আলাউদ্দিনের প্রাণ-বিযুক্ত দেহ মহল্লায় তাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় চিৎ হয়ে আছড়ে পড়ে'।[২২]

একই দিনে বদরুদ্দিনের প্রত্যক্ষ মদদে মিলিটারি আলাউদ্দিনসহ মহল্লার যে সাতজনকে হত্যা করে তাদের মধ্যে খাজা আহমেদ আলী ও তাঁর ছেলে খাজা শফিকও বদরুদ্দিনের ক্ষমতালিপ্সার বলি। পঁচিশে মার্চের গণহত্যার পর একদিনের জন্য সন্ত্রস্ত মহল্লাবাসী সকলেই মহল্লা ত্যাগ করলেও বদরুদ্দিন ছাড়া দ্বিতীয় যে ব্যক্তি মহল্লায় থাকার সাহস দেখিয়েছিলেন তিনি আহমেদ আলী। সেদিন সন্ধ্যায় লক্ষ্মীবাজারে একমাত্র তিনিই বাতি জ্বালিয়েছিলেন। এছাড়া বদরুদ্দিনের কাকের উদ্দেশে ছুড়ে দেওয়া নরমাংসের টুকরো পেয়ে পুত্রের সহায়তায় সেটি নিজের বাড়ির আঙিনায় দাফন করেছিলেন আহমেদ আলী এবং তাঁর কাছ থেকে মহল্লাবাসী বিষয়টি অবগত হয়েছিল। মহল্লার সবচেয়ে প্রাচীন মুসলমান পরিবারের প্রধান এই বৃদ্ধ মহল্লাবাসীর বিশেষ সম্মানেরও পাত্র ছিলেন। মিলিটারির গুলিতে পুত্রের মৃত্যু হলে তিনি বাড়ির ছাদে গিয়ে যে আজান দিয়েছিলেন তার বর্ণনাতে মহল্লাবাসীর কাছে তাঁর বিশেষ মর্যাদার স্থানটি সম্পর্কে জানা যায় :

> এবং তারা যখন জানতে পারে যে খাজা আহমেদ আলী ছিল সেই ঝঞ্ঝাকালের মুয়াজ্জিন, তারা সকলেই বলে যে, তারা যখন আজান শুনেছিল তারা তার কণ্ঠ চিনতে পেরেছিল। তারা সকলেই বলে যে, এমন মধুর স্বরে আজান দেয়া তারা ইতিপূর্বে কখনো শোনে নাই এবং তারা মনে করেছিল, বেলালের কণ্ঠই কেবল এমন হতে পারে।[২৩]

খাজা আহমেদ আলীর মহল্লায় অবস্থিতির সাহস, বদরুদ্দিনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগতি ও তাঁর প্রতি মহল্লাবাসীর সম্মানবোধকে বদরুদ্দিন তার ক্ষমতাকেন্দ্রের জন্য হুমকি হিসেবেই বিবেচনা করেছে। তাই বদরুদ্দিনের রোষের শিকার হয়েছেন আহমেদ আলী ও তাঁর পুত্র ।

কাকের উদ্দেশে ছুড়ে দেয়া নরমাংসের অন্য দুটি টুকরো পেয়েছিল জনৈক পথিক ও জমির ব্যাপারীর কিশোরী কন্যা। পথিকের প্রাপ্ত হিজড়ার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলের টুকরোটি আবু করিমের বড় ছেলে দেখেছিল এবং তার মারফত মহল্লাবাসী বিষয়টি জেনেছিল। পরবর্তীকালে আবু করিমের বড় ছেলেটি নিখোঁজ হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাজাকার আবদুল গণির কাছ থেকে জানা যায়, ছেলেটিকে তারা বদরুদ্দিনের নির্দেশে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়ে জবাই করেছিল। নরমাংসের অপর টুকরো, যেটি পেয়েছিল জমির ব্যাপারীর কন্যা, সেটি ছিল একটি কাটা পুরুষাঙ্গ। জমির ন্যাকড়ায়

জড়িয়ে কাটা পুরুষাঙ্গটি বদরুদ্দিনের বাসায় দিয়ে এসে তার ক্ষমতাকেন্দ্রে যে আঘাত হানে, তা প্রতিহত করতে পরদিন সকালে বদরুদ্দিন সমবেত মহল্লাবাসীর সামনে তাকে চপেটাঘাত করে। বিপদ বুঝতে পেরে জমির সেদিনই সপরিবার মহল্লা ত্যাগ করে প্রাণ বাঁচায় এবং যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বে মহল্লায় ফিরতে পারে না।

জমির ব্যাপারীর দিয়ে যাওয়া পুরুষাঙ্গটিকে কেন্দ্র করে বদরুদ্দিনের ক্ষমতাকেন্দ্রটি আরও একবার সূক্ষ্ম আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল তারই অন্তঃপুরের এক সদস্যের কর্মকাণ্ডে। জমির-প্রদত্ত ন্যাকড়ায় জড়ানো বস্তুটির মোড়ক উন্মোচন করেছিল বদরুদ্দিনের স্ত্রী লতিফা। প্রথমে ভয় পেলেও পরবর্তীতে লতিফা সেটিকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে আগ্রহী হয় এবং শেষ পর্যন্ত বস্তুটি যে একজন মুসলমানের পুরুষাঙ্গ তা শনাক্ত করতে সক্ষম হয়। এই ঘটনা বদরুদ্দিনকে হতবাক করে এবং রাতেই ঘুম থেকে তুলে সে লতিফাকে তালাক দেয় :

> সে বুঝতে পারে, লতিফা, অপরিচিত একজন পুরুষের যৌনাঙ্গ অবলোকন শুধু করে নাই, এ ব্যাপারে সে অনেক আগ্রহ দেখিয়েছে; সে সেটাকে পুরুষের যৌনাঙ্গ হিসেবে শনাক্ত করেছে। তার পরেও সে ছাড়ে নাই, সে শনাক্ত করেছে যে, সেটা মুসলমানের।[২৪]

লক্ষণীয়, লতিফা বদরুদ্দিনের দ্বিতীয় স্ত্রী এবং সে যে বদরুদ্দিনের তুলনায় 'তরুণী' ঔপন্যাসিক তা বিশেষভাবে স্পষ্ট করেছেন। অন্য পুরুষের যৌনাঙ্গ সম্পর্কে লতিফার আগ্রহের একটি সম্ভাব্য কারণ হয়ত তার তরুণীসুলভ কৌতূহল; কিন্তু বদরুদ্দিন নিশ্চয়ই সে কারণে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার মতো অতটা বিচলিত হয়নি। বরং এই ঘটনা বদরুদ্দিনের পুরুষতান্ত্রিক মানসজগতে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে তা, সম্ভবত, তার এই 'তরুণী' স্ত্রীর সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপনের অক্ষমতাজাত। নারীবাদী তত্ত্বমতে, পুরুষের ধর্ষকামীতার বিপরীতে নারীর মর্ষকামীতা মনস্তাত্ত্বিকভাবে নারীকে পুরুষের কর্তৃত্বপরায়ণতা মেনে নিতে প্রভাবিত করে।[২৫] তাই ক্ষমতাবান বদরুদ্দিনের নিজ ধর্ষকাম-অক্ষমতাকে তার ক্ষমতার বিরুদ্ধে হুমকিস্বরূপ মনে করাটা অস্বাভাবিক নয়। তালাক প্রদানের মাধ্যমে লতিফাকে মহল্লা থেকে বিতাড়িত করে এই হুমকি প্রতিরোধে সচেষ্ট হয়েছে সে।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুংজননেন্দ্রিয় ক্ষমতার টোটেম হিসেবে পরিগণিত হয়। অধুনা দেবতা শিবের বিগ্রহ হিসেবে পূজিত শিবলিঙ্গকেও অনেক গবেষক পুরুষাঙ্গের অনুষঙ্গবাহী বলে মত দিয়েছেন।[২৬] পুরুষদেহে শিশ্নের উপস্থিতির বিপরীতে নারীদেহে তার অনুপস্থিতিকে নারীর হীনমন্যতার অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন মনস্তত্ত্ববিদ সিগমুন্ড ফ্রয়েড। শিশ্ন-কেন্দ্রিক এই অসমতা শৈশবেই নারী-পুরুষ উভয়ের কাছে ধরা পড়ে। ফ্রয়েড লিখেছেন :

> In the course of these researches the child arrives at the discovery that the penis is not a possession which is common to all creatures that are like himself. An accidental sight of the genitals of a little sister or playmate provides the occasion for this discovery... . The lack of a penis is regarded as a result of castration, and so now the child is faced with the task of coming to terms with castration in relation to himself. ...We know, too, to what a degree depreciation of women,

> horror of women, and a disposition to homosexuality are derived from the final conviction that women have no penis.[২৭]

ছেলেশিশু ও মেয়েশিশু উভয়েই ভাবে পূর্বে দুজনেরই পুরুষাঙ্গ ছিল, নপুংসীকরণের (castration) ফলে মেয়েশিশুটি তার পুরুষাঙ্গটি হারিয়েছে। এজন্য মেয়েশিশুটি ছেলেশিশুটির লিঙ্গ দেখে ঈর্ষান্বিত হয় এবং হীনমন্যতায় ভুগতে শুরু করে। অর্থাৎ, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষাঙ্গহীনতা এক প্রকার অক্ষমতা হিসেবে চিহ্নিত হয়।

উপর্যুক্ত কারণেই নিজ সন্তানের পুরুষাঙ্গহীনতার ব্যাপারে নিশ্ছিদ্র গোপনীয়তা রক্ষার চেষ্টা করতে দেখা যায় বদরুদ্দিনকে। নপুংসক সন্তান আবুল বাশারের এই পঙ্গুত্ব গোপনের জন্য জন্মের পর ছয় বছর সে শিশুটিকে শ্বশুরবাড়িতে রেখে দেয় এবং সেখান থেকে নিয়ে আসার পর তাকে সবসময় কাপড় পরিয়ে রাখে। তাতে মহল্লাবাসীর সন্দেহ আরও প্রগাঢ় হলে সে যুদ্ধের মধ্যেই ইসমাইল হাজামকে ডেকে মহল্লাবাসীর সামনে বাশারের খতনার নাটক মঞ্চায়ন করে এবং পুত্রের পুরুষাঙ্গহীনতার বিষয়ে মুখ বন্ধ রাখার জন্য ইসমাইলকে কঠোর নির্দেশ দেয়। ইসমাইল মহল্লাবাসীর সামনে নীরবতা পালন করলেও নিজের ভাবমোক্ষণের জন্য নিম্নস্বরে 'হালার হিজড়ার আবার মুসলমানি!' স্বগতোক্তি করে বসে। তার এই স্বগতোক্তি রাজাকার আবদুল গণির কর্ণগোচর হলে এবং গণি বিষয়টি বদরুদ্দিনকে জানালে বদরুদ্দিনের নির্দেশে সে-রাতেই তাকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়ে জবাই করা হয়।

বদরুদ্দিনের ক্ষমতাকেন্দ্রের জন্য সবচেয়ে প্রবল হুমকি হয়ে উঠেছিল আবদুল মজিদের পরিবার। যুদ্ধের পূর্বেই মজিদের বোন মোমেনার কর্মকাণ্ডকে নিজের ক্ষমতালিপ্সার বিরুদ্ধে এক চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখার কারণে বদরুদ্দিন তাকে কটুকাটব্য করেছিল। এরপর যুদ্ধ শুরু হলে সে মজিদের বিধবা মাকে 'এই মহল্লায় এখনো তাদেরই কেবল সাহস রয়ে গেছে' বলে শাসিয়েছে। বস্তুত বদরুদ্দিনের প্রতি জন্মানো ঘৃণা ও সেই ঘৃণাজাত ক্রোধের সাহসকেও বদরুদ্দিন তার ক্ষমতার জন্য হুমকিস্বরূপ মনে করেছে। এছাড়া আরও একটি সাহসিকতা দেখিয়েছিল মজিদ। জমির ব্যাপারীর দিয়ে যাওয়া খণ্ডিত পুরুষাঙ্গের জের ধরে যে রাতে বদরুদ্দিন লতিফাকে তালাক দেয়, সে রাতে লতিফার করুণ কান্নার শব্দে সারারাত মহল্লাবাসী 'বাতি না জ্বেলে' অন্ধকারে জেগে থাকলেও 'একবার অসহ্য লাগলে কিশোর আবদুল মজিদ বাতি জ্বালে'। মহল্লাবাসীকে যে ভয়ের অন্ধকারে নিমজ্জিত করে বদরুদ্দিন তার প্রভুত্ববাদী ক্ষমতাকে টিকিয়ে রেখেছিল, তার মধ্যে এই আলোক-প্রজ্বালন নিশ্চয়ই তাকে বিচলিত করেছিল; এর সাথে খাজা আহমেদ আলীর জনমানবশূন্য মহল্লায় সান্ধ্যপ্রদীপ জ্বালানোর প্রতীকী তাৎপর্য অভিন্ন।

যুদ্ধ-চলাকালে বদরুদ্দিনের রাজাকার বাহিনী মহল্লাকে তুলসীগাছ-শূন্য করার অভিযান চালানোর সময় একজন রাজাকার আবদুল মজিদদের আঙিনার জবা ফুলগাছকেও 'হিন্দু গাছ' হিসেবে চিহ্নিত করে তা বিনষ্ট করতে উদ্যত হলে মোমেনা বাধা দেয়। রাজাকারটি তার কথায় কর্ণপাত না করলে

মোমেনা রান্নাঘর থেকে কাটারি নিয়ে এসে তাকে তাড়া করে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। তার এই প্রতিবাদ মহল্লাবাসীকে রাজাকারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করে এবং প্রথমবারের মতো জনৈক মহল্লাবাসী একজন রাজাকারকে চড় মারে। তার রাজাকার বাহিনীর বিরুদ্ধে মহল্লাবাসীর এই সম্মিলিত প্রতিরোধ বদরুদ্দিনের কাছে তার ক্ষমতাকেন্দ্রে আঘাত বলেই প্রতীয়মান হয় এবং তা প্রতিহত করতে সে দ্বিতীয়বার মহল্লায় মিলিটারি নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেয় :

> এই বিষয়টি পরে জানা গিয়েছিল যে, বদু মওলানা রাজাকারদের কাছ থেকে সব শুনে বিচলিত হয়ে পড়ে এই কারণে যে, সে পুরো জিনিসটার ভেতর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া সাহসের এক পুনরুত্থানের ইঙ্গিত যেন দেখতে পায়। তার মনে হয়, মহল্লার লোকদের আর একবার মিলিটারি দেখানো প্রয়োজন।[২৮]

মহল্লাবাসীকে দ্বিতীয়বার মিলিটারি দেখিয়ে নিজের প্রভুত্ববাদী ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করে নেয় বদরুদ্দিন। কিন্তু মোমেনাকে সে ছাড় দেয়না। সেদিন ও পরবর্তী কয়েকমাস চাতুর্যের আশ্রয়ে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হলেও শেষ রক্ষা হয় না মোমেনার। বদরুদ্দিনের রাজাকার বাহিনী দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে তাকে তাদের ঘরের চৌকির তলা থেকে বের করে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। এভাবে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস বদরুদ্দিন দমন-পীড়নের মাধ্যমে মহল্লায় প্রভুত্ববাদী ক্ষমতার চর্চা করেছে।

৩

যুদ্ধে পরাজয়ের পর বদরুদ্দিন দুই বছর আত্মগোপনে থেকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর ১৯৭৩ সালে মহল্লায় প্রত্যাবর্তন করে। মিলিটারির সাথে যোগসাজশে লব্ধ তার ভূতপূর্ব প্রভুত্ববাদী ক্ষমতা তখন সম্পূর্ণ হৃত। তাই এবার সে মহল্লায় তার ক্ষমতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠ করতে নতুন কৌশলের আশ্রয় নেয়। তার আচরণে এখন আর যুদ্ধকালীন সেই প্রভু-শক্তির দোর্দণ্ড প্রতাপ লক্ষ করা যায় না। মহল্লার ক্ষমতাকেন্দ্রে পুনরায় সমাসীন হওয়ার জন্য এখন সে বল প্রয়োগের পরিবর্তে মহল্লাবাসীর সম্মতি আদায় করে আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় অধিক সচেষ্ট হয়। এক বিনীত, সৌম্য বদরুদ্দিন ধরা দেয় মহল্লাবাসীর কাছে : 'এবার বদু মওলানা যেন পুনরায় শূন্য থেকে শুরু করে, মহল্লার লোকেরা তাকে পুনরায় মাটির দিকে তাকিয়ে হেঁটে যেতে দেখে। ফিরে আসার পর প্রথম দিন সে মহল্লার সকলের সঙ্গে বিনীতভাবে কুশল বিনিময় করে'।[২৯]

বদরুদ্দিনের হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের প্রথম হাতিয়ার তার লেবাস। তাই 'বদু মওলানা যখন লক্ষ্মীবাজারে ফিরে আসে মহল্লার লোকেরা তার গায়ে পুনরায় পপলিনের ধূসর সেই আলখাল্লা দেখতে পায়'।[৩০] এই আলখাল্লা সে পূর্বেও পরিধান করত। তবে পঁচিশে মার্চের পর সে হঠাৎ কাঁধে একটি কালো খোপ খোপ চেকের স্কার্ফ ঝুলিয়েছিল। স্কার্ফটি ছিল রাজাকার বাহিনীর প্রধান হিসেবে পাকিস্তানি মিলিটারির সহায়তায় মহল্লাবাসীর ওপর অর্জিত তার প্রভুত্ববাদী ক্ষমতার স্মারক। ফলে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে প্রভুত্ব হারানোর সঙ্গে সঙ্গে এই স্মারকটিও তার কাঁধ থেকে অন্তর্হিত হয়। তবে, থেকে যায় আলখাল্লাটি; যার মাধ্যমে সে নিজের প্রতি মহল্লাবাসীর সম্মানবোধ জাগ্রত করে সম্মতিমূলক আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়েছে।

সমুদ্রযাত্রার মাধ্যমে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যরাজিই ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের এসব অঞ্চলে ঔপনিবেশিক আধিপত্য বিস্তারের প্রধান হাতিয়ার হয়েছিল। সামরিক শক্তির পরিবর্তে তথ্য-শক্তির বলে বিশ্বকে করায়ত্ত করার এই সাম্রাজ্যবাদী কৌশল বদরুদ্দিন প্রয়োগ করেছে মহল্লাবাসীর ওপর। যুদ্ধ চলাকালে দেখা গিয়েছিল বদরুদ্দিনের রাজাকার বাহিনীর সদস্য আবদুল গণি 'একজন সতর্ক রাজাকার হিসেবে এমনকি হাওয়ার গতিপ্রবাহ সম্পর্কেও' তাকে সব সময় অবহিত রাখত। মহল্লায় প্রত্যাবর্তনের পর বদরুদ্দিন প্রথমেই যুদ্ধের সময় তার প্রত্যক্ষ মদদে নিহতদের পরিবারের সাথে কুশল বিনিময় করতে যায়। সে বুঝতে পেরেছিল, মহল্লায় তার আধিপত্যবাদী হয়ে ওঠার পথে প্রধান অন্তরায় হবে এই যুদ্ধে স্বজনহারা পরিবারগুলোই। তাই তাদের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যই বদরুদ্দিন তাদের প্রাঙ্গণে গিয়ে হাজির হয়। পরবর্তীকালে এই পরিবরিগুলোর ওপর কঠোর নজরদারি করতেও দেখা যায় তাকে। যেমন, আবদুল মজিদের শিশুকন্যার নাম মোমেনা রাখার ব্যাপারটি মহল্লাবাসী আদৌ জানে কি না তা জানা না- গেলেও বদরুদ্দিন একদিন আবদুল মজিদকে 'রাস্তায় থামিয়ে তার বাচ্চা মেয়ের কুশল জিজ্ঞাসা করে এবং তারপর বলে, বইনের নামে নাম রাকছো, বইনেরে ভুলো নাইকা?'[৩১]

বদরুদ্দিন যারপরনাই বিনয় প্রদর্শনের পরও মহল্লার ক্ষমতাকেন্দ্রে নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠ করার ব্যাপারে যুদ্ধে স্বজনহারা পরিবারগুলোর কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পায় না। তাই মহল্লায় প্রত্যাবর্তনের দ্বিতীয় দিন ভোরে সে গিয়েছিল আজিজ পাঠানের কাছে। আজিজ পাঠানের সামনেও সে বিনীত ভঙ্গিতেই নিজেকে উপস্থাপন করে :

> লুঙ্গি এবং স্যান্ডো গেঞ্জির ওপর চাদর জড়িয়ে আজিজ পাঠান যখন দাঁত ব্রাশ করতে করতে বাইরের ঘরে আসে তখন বদু মওলানা অপরাধীর মতো দাঁড়িয়েছিল; তার পরস্পরকে আঁকড়ে থাকা হাত দুটো ছিল সামনের দিকে তলপেটের নিচে ঝোলানো, আর দৃষ্টি ছিল পাঠানের ঘরের চামড়া ওঠা, চল্টানো পাকা মেঝের ওপর। মহল্লার লোকেরা পরে শুনেছিল যে, বদু মওলানা একটি কথাও আজিজ পাঠানের সামনে উচ্চারণ করে নাই, সে শুধু দাঁড়িয়েছিল নিশ্চুপ এবং বাঁকা হয়ে।[৩২]

বস্তুত, মহল্লার ক্ষমতা-কাঠামোতে পুনঃপ্রবেশ ও ক্ষমতাকেন্দ্রে সমাসীন হওয়ার জন্য যে বৈধতার (legitimacy) প্রয়োজন ছিল বদরুদ্দিনের, সেটি সংগ্রহ করতেই সে আজিজ পাঠানের কাছে গিয়েছিল। তার এই বিনম্র ভাব ও চোখের পানি এক কৌশলমাত্র। দলীয় রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কারণে আজিজ পাঠান তাকে ক্ষমাসূচক উক্তি করলে সেটিকেই মূলধন করে বদরুদ্দিন তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার নতুন কর্মপ্রক্রিয়ায় অগ্রসর হয়। আজিজ পাঠানের স্বীকৃতিকে সে ব্যবহার করে আত্মরক্ষার শিখণ্ডী হিসেবে; সদর্পে আজিজ পাঠানের এই সম্মতির ব্যাপারটি ঘোষণা করে মহল্লাবাসীর কাছে :

> মহল্লার লোকেরা জানতে পারে যে, বদু মওলানা এই কথা বলে যে, একমাত্র মানী লোক-ই মানীর সম্মান রাখতে জানে। বালক-বালিকাদের স্কুলের গল্পের বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সে বলে যে, বীর রাজা পুরুর মতো সে বিজয়ী আলেকজান্ডারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং সে দেখেছিল যে, আলেকজান্ডারেরা সব সময় পুরুদের সঙ্গে একই ব্যবহার করে; কারণ একমাত্র বীরই চিনতে পারে বীরের লক্ষণ সকল।[৩৩]

ঐতিহাসিক তথ্যানুসারে পুরুর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে আলেকজান্ডার তাকে কেবল ক্ষমা করে দিয়েছিল তা নয়, বরং নিজের অধিকৃত কিছু অঞ্চলসহ পুরুকে তার শাসন-ক্ষমতাও ফিরিয়ে দিয়েছিল। আজিজ পাঠানকে আলেকজান্ডার ও নিজেকে পুরুর সাথে তুলনা করে বদরুদ্দিন মহল্লায় তার ক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্তির ঘোষণা দিয়েছে।

যে বদরুদ্দিন ১৯৭৩ সালে মহল্লায় প্রত্যাবর্তন করে রাস্তা দিয়ে ছায়ার মতো হেঁটে এসেছিল, ১৯৮০ সালের মধ্যে সে একজন বড় রাজনৈতিক নেতায় পরিণত হয়। মহল্লাবাসী তাকে তার দলের প্রধানকে সংবর্ধনা দিতে দেখে, নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে তার বক্তৃতা শোনে। এ-বক্তৃতায় সে যুদ্ধে তার নিজের ভূমিকাকে এক মহৎ-কীর্তি হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা করে। ভিক্টোরিয়া পার্কের জনসভায় সে তার সহচর রাজাকার আবদুল গণিকে 'শহিদ' বলে ঘোষণা করে : 'বদু মওলানা অঙ্গুলিনির্দেশ করে শ্রোতাদের সেই বেঞ্চটি দেখিয়ে দেয় এবং বলে যে, যারা তখন ওই বেঞ্চের ওপর বসেছিল তারা জানে না, ওই বেঞ্চের ওপর আবদুল গণি শহীদ হয়েছিল'।[৩৪] পলাতক থাকাকালে পুত্র আবুল বাশারের পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঘটনাকেও বদরুদ্দিন একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। নিজেকে এই জনগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে পুত্রের মৃত্যুর ঘটনাকে ইসলাম ধর্মের এক কিংবদন্তির সাথে তুলনা করে সে :

> এখন মহল্লার লোকদের মনে পড়ে সেদিন বক্তৃতার সময় বদু মওলানা আকাশের দিকে দুহাত উঁচু করে ধরে বলেছিল যে, সেটা ছিল এক পরীক্ষা। আল্লাহ যেমন হযরত ইব্রাহীমকে প্রিয় পুত্র কোরবানি করতে বলে পরীক্ষা করেছিলেন, তেমনি তারও জীবনে পরীক্ষা আসে এবং সে তখন তার প্রিয়তম পুত্রকে হারায়।[৩৫]

বদরুদ্দিন এখন মহল্লাবাসীকে 'হারামযাদা', 'মাগি', 'মুনাফেক' বা 'মূর্তিপূজক কাফের' বলার পরিবর্তে 'ভাইসব' বলে সম্বোধন করে। অন্য সকল রাজনৈতিক দলের সাথে সম্মিলিতভাবে সরকার-বিরোধী হরতাল পালন করে এবং হরতালে অংশগ্রহণের জন্য তার ছেলে আবুল খায়ের জনগণকে ধন্যবাদ জানায় । এভাবে একাত্তরের যুদ্ধে পরাজিত বদরুদ্দিন এক দশক যেতে না যেতেই পুনরায় মহল্লার ক্ষমতা-কাঠামোতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে; তবে এ-সময়ে প্রভুত্বের পরিবর্তে মহল্লাবাসীর সম্মতির ভিত্তিতে আধিপত্যবাদী হয়ে উঠতেই সে অধিক সচেষ্ট হয়েছে।

বদরুদ্দিনের ক্ষমতার স্বরূপ

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধকালীন প্রভুত্ববাদী ক্ষমতার পরিবর্তে স্বাধীন বাংলাদেশে বদরুদ্দিন জনসমর্থন লাভের মাধ্যমে আধিপত্যবাদী হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছে। শুরু থেকেই মহল্লাবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর নিজের মতাদর্শকে চাপিয়ে দেওয়ার অভিসন্ধি তার কর্মকাণ্ডে লক্ষ করা যায়। কিন্তু যুদ্ধপূর্ব, যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে কখনোই সে তার ক্ষমতার পক্ষে মহল্লাবাসী জনতার মতাদর্শগত সম্মতি আদায় করতে সক্ষম হয়নি। আধিপত্য অর্জনের জন্য যে স্বেচ্ছামূলক আত্মসমর্পণ প্রয়োজন, গ্রামসি যাকে বলেছেন: 'spontaneous consent given by that great masses of the population to the general; direction imposed on social life by the dominant fundamental group'.[৩৬] মহল্লাবাসীর কাছ থেকে তা বদরুদ্দিন কখনোই আদায় করতে পারেনি। তার প্রভুত্ববাদী ক্ষমতার প্রতাপে মহল্লাবাসী বাধ্য হয়েছে তার ক্ষমতা-চর্চাকে

মেনে নিতে; কিন্তু বদরুদ্দিনের মতাদর্শের সাথে মানসিক একাত্মতা তারা কখনোই বোধ করেনি। কেউ প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ করেছে, কেউ নীরব থেকে মনে মনে ঘৃণা ও ক্রোধ পোষণ করেছে, আবার কেউ মহল্লা থেকে অন্তর্ধান করে মুক্তির সন্ধান করেছে।

চেতনাগত দিক থেকে যে রাজনৈতিক মতাদর্শ বদরুদ্দিন লালন করে মহল্লাবাসী কখনোই তা গ্রহণ করেনি। সাম্প্রদায়িক ভেদজ্ঞান ছিল তার মতাদর্শের মূল চালিকাশক্তি। কিন্তু মহল্লাবাসী আবহমান কাল ধরে তাদের আচরিত অসাম্প্রদায়িক জীবনচর্যায়ই স্থিত থেকেছে পূর্বাপর। মোমেনার বাসন্তী গোমেজের সাথে সদ্ভাবের কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। আবদুল মজিদের কৈশোরিক স্মৃতির একটি খণ্ডাংশ নিম্নরূপ :

> সে সময়, সে [আবদুল মজিদ] যখন হাফপ্যান্ট পড়ত, তখন শনিবার সন্ধ্যেয় সে দু'বাড়ির মাঝখানের দেয়ালের ওপর চড়ে বসে থাকত। তখন মায়ারাণীর মা আসত মাথায় ঘোমটা টেনে, কপালে থাকত পূর্ণিমার চাঁদের মতো বড় এবং গোল সিঁদুরের টিপ। মায়ারাণীর মা কাঁসার থালার ওপর সরষের তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে ফটকের কাছে তুলসী গাছের কাছে এসে বসত এবং একইভাবে শনিকে ডাকত। তুলসী গাছের গোড়ায় বাঁধানো নিচু বেদির ওপর রাখা প্রদীপ জ্বলত, আবদুল মজিদ শুনত মায়ারাণীর মার শনি-আবাহন– আসেন শনি বসেন খাটে, পস্‌সাদ দেব হাতে হাতে। এভাবে পুজো হয়ে গেলে, মায়ারাণী হাতে করে একটি বড় বাটি নিয়ে আসত এবং প্রাঙ্গণে অপেক্ষমান বালক-বালিকা ও দেয়ালের ওপর বসে থাকা আবদুল মজিদের প্রসারিত করতলের ওপর কলা ও দুধ মাখানো ভিজে চিড়ার একটি করে মণ্ড অর্পণ করত।[৩৭]

মজিদের মানসপটে মায়ারাণী মালাকারের মা, তার শনি-পূজা ও মায়ারাণীর হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষ শিশুদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণের যে চিত্র অঙ্কিত, তা মহল্লার হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দিকটিকে প্রকাশ করে। এ-সম্প্রীতি পনের বছর পরও অটুট ছিল। তাই ১৯৮৫ সালে যেদিন আবদুল মজিদের স্ত্রী ইয়াসমিন একটি কন্যাসন্তান প্রসব করে, সেদিন বিকেলেই মায়ারাণী নবজাতক শিশুকন্যাটিকে দেখতে আসে এবং ইয়াসমিনের শয্যাপাশেই তার বসার আসন হয়।

'অপর'কে নিকৃষ্ট প্রমাণ করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন, আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এক সাম্রাজ্যবাদী কৌশল। নৃবিজ্ঞানের মতো প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান-শাখা সৃষ্টি করে জাতি, বর্ণ, চুলের প্রকৃতি, কপালের আকৃতি, নাকের গড়ন, এমনকি লিঙ্গের আকৃতির ভিত্তিতে মানুষকে বিভাজিত করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেছিল পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো। প্রতিপক্ষকে হীন প্রতিপন্ন করার এই সাম্রাজ্যবাদী কৌশল বদরুদ্দিন প্রয়োগ করেছে খাজা আহমেদ আলীর ওপর। মৃত্যুর পরেও আহমেদ আলীর প্রতি মহল্লাবাসীর শ্রদ্ধাবোধ অটুট থাকলে বদরুদ্দিন প্রচার করার চেষ্টা করে যে, আজান অসমাপ্ত রেখেই আহমেদ আলী নিহত হয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও আহমেদ আলীর সুমধুর কণ্ঠস্বর ও আজান শেষে চার বার 'আল্লাহু আকবর' বলতে শোনা সম্পর্কিত মহল্লাবাসীর বিশ্বাস অনড় থাকলে, বদরুদ্দিন তাকে 'মুনাফেক' বলে ঘোষণা করে এবং মহল্লাবাসীকে 'মূর্তিপূজক কাফের' বলে গাল দেয়। তবুও মহল্লাবাসী তার কথা গ্রহণ না করলে আহমেদ আলীর প্রতি তাদের সম্মানবোধকে নস্যাৎ করতে বদরুদ্দিন তার গৃহপালিত কুকুর ভুলুর মৃতদেহ এনে আহমেদ আলী ও তার পুত্রের কবরের পাশে কবর দেয় : 'বদু মওলানার লোকেরা ধপাধপ করে মাটি খুঁড়ে খাজা

আহমেদ আলীর বাড়ির উঠানে, তার আর তার ছেলের কবরের পাশে কুকুরের মৃতদেহটি কবর দেয় এবং তারপর মহল্লার আতঙ্কিত লোকদের দিকে তাকিয়ে সে বলে, এই কবরে কোনো পীর নাই, কুত্তা আছে।'[৩৮]

আহমেদ আলীর প্রতি মহল্লাবাসীর সম্মানবোধের ওপর ঘৃণিত এক কুকুরের লাশ চাপিয়ে দিয়ে মহল্লায় নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার উক্ত চেষ্টাও ব্যর্থ হয় বদরুদ্দিনের। যুদ্ধ-শেষে বিক্ষুব্ধ জনতা বদরুদ্দিনের রাজাকার বাহিনীর সদস্য আবদুল গণিকে হত্যা করলে, লক্ষ্মীবাজারের লোকেরা আহমেদ আলী ও তার পুত্রের কবরের পাশ থেকে কুকুরের হাড়গুলো তুলে আবদুল গণির দ্বিখণ্ডিত দেহের সাথে একত্র করে বুড়িগঙ্গার পানিতে ফেলে দেয়। খাজা পরিবারের শহিদদ্বয়ের প্রতি এ-জনগোষ্ঠীর সম্মানবোধ তখনো কতটা প্রবল ছিল তা তাদের কবর খোঁড়ার সময়ের সশ্রদ্ধ সতর্কতা দৃষ্টে স্পষ্ট হয় :

> তারা মহল্লায় খাজা আহমেদ আলী আর খাজা শফিকের কবরের কাছে ছুটে যায়, অতি সন্তর্পণে কুকুরের প্রোথিত কঙ্কালের সঠিক স্থান নির্ধারণ করে এবং খুব আস্তে ও যত্নের সঙ্গে বদু মওলানার পরিবারের মৃত কুকুরের চাপা দেওয়া দেহাবশেষের ওপর থেকে মাটি সরায়। তারা কুকুরের হাড়গুলো এমনভাবে মাটি থেকে আলাদা করে, যেন মাটি এবং সেই মাটিতে শায়িত খাজা আহমেদ আলী এবং খাজা শফিক টের না পায়, তারা কি করে।[৩৯]

যুদ্ধ-চলাকালেও বদরুদ্দিন মহল্লাবাসীকে সালাম দিয়েছে, নরম করে হেসেছে। কিন্তু তার সেই শান্তির বাণী আর নম্রহাস্যের অন্তরালবর্তী আধিপত্যবাদী চরিত্র, মহল্লাবাসীর সম্মানের পাত্র হয়ে ওঠেনি কখনোই। অবশ্য প্রভুত্বের দাপটে বদরুদ্দিনও তাতে খুব বেশি শঙ্কিত হয়নি। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে তার প্রভু-শক্তির মূল উৎসের অন্তর্ধানে বদরুদ্দিন মহল্লাবাসীর সমর্থন আদায়ে পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ সচেষ্ট হয়েছে। কিন্তু তাতেও খুব বেশি সুবিধা করতে পারেনি সে। মহল্লায় প্রত্যাবর্তন করে যুদ্ধে স্বজনহারা পরিবারগুলোর খোঁজ নিতে গেলে তারা সকলেই তার এই কৃত্রিম সমবেদনা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে ও তাকে স্ব স্ব বাড়ি থেকে বিতাড়িত করেছে। তার 'কেমন আছেন আপনেরা?' কুশল প্রশ্নের উত্তরে আবদুল মজিদের মা বলেছে 'থুক দেই, থুক দেই, থুক দেই মুখে'; আহমেদ আলীর স্ত্রী জয়নব বেগম 'খবরদার, খবরদার!' হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে তাদের প্রাঙ্গণে বদরুদ্দিনের প্রবেশ আটকেছে; আবু করিমের স্ত্রী মূর্ছিত হয়ে পড়েছে। আলাউদ্দিনের মা রীতিমতো রণচণ্ডী-বেশ ধারণ করেছে। প্রথমে সে বদরুদ্দিনের মুখের ওপর বাসনকোসন ছুড়ে মেরেছে, তারপর চুলার ফুঁকনি নিয়ে তাকে তাড়া করেছে এবং বদরুদ্দিন আছাড় খেলে তাকে লক্ষ করে ফুঁকনি ছুড়ে মেরেছে। কেবল নিহতদের পরিবারই নয়, বদরুদ্দিনের প্রত্যাবর্তনে মহল্লাবাসী প্রত্যেকেই এক প্রবল অস্বস্তি অনুভব করেছিল সেদিন :

> সে রাতে লক্ষ্মীবাজারের লোকদের ঘুম আসে নাই বলে পরদিন সকালে তারা একে অন্যকে বলেছিল। তারা বলেছিল যে, সে দিন রাতে তাদের স্ত্রীরা স্খলিত শয্যায় শোকার্ত রমণীর মতো পড়ে ছিল এবং তারা অস্থিরতার এক প্রবল প্রবাহে উড্ডীন হয়েছিল।[৪০]

পনের বছর পর, বদরুদ্দিন যখন বড় রাজনৈতিক নেতা, তখনও তার প্রতি এই জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি অপরিবর্তিতই থেকে যায়। তাই বদরুদ্দিনের ছেলে আবুল খায়ের মহল্লাবাসীকে 'ভাইসব'

সম্বোধন করলে আবদুল মজিদের হৃদয়ের তন্তু ছিন্ন হয় : 'আবদুল মজিদের মনে হয়, তার হৃদয়টি বহুদিন থেকেই বিদীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু এই দিন, উইপোকার হত্যাযজ্ঞের বিষণ্ন বিকেলে আবুল খায়েরের কথা শুনে তার হৃদয়ের তন্তু তার স্যান্ডেলের ফিতার মতো পুনরায় ছিন্ন হয়।'[৪১] একাত্তর সালে বদরুদ্দিনের প্রতি যে প্রবল অবিশ্বাস ও ঘৃণা জন্ম নিয়েছিল মহল্লাবাসীর মনে তা আর কখনোই খণ্ডানো সম্ভব হয়নি তার পক্ষে। মহল্লাবাসীর হৃদয়গত এই বোধের কথা বদরুদ্দিন যেমন ভোলেনি, তেমনি তার ভূতপূর্ব প্রভুত্ববাদী ক্ষমতার প্রলয়ংকর রূপও মহল্লাবাসী বিস্মৃত হয়নি :

> একাত্তর সনের স্মৃতি সবচাইতে বেশি মনে রয়ে গেছে বদু মওলানার। বদু মওলানা এই বিষয়টি ভোলে নাই যে, মোমেনাকে রাজাকাররা ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছিল এবং সম্ভবত দেশ মুক্ত হওয়ার পর মহল্লায় ফিরে আলাউদ্দিনের মায়ের তাড়া খাওয়ার পর বুঝতে পারে যে, এই জনগোষ্ঠীও কোনো কিছুই ভুলে যায় নাই।[৪২]

অর্থাৎ, যুদ্ধের নয় মাস ও যুদ্ধোত্তরকালে বদরুদ্দিন ক্ষমতাবান হয়ে উঠলেও তার সেই ক্ষমতা কেবল প্রভুত্বের ভিত্তির ওপরেই টিকে ছিল। মহল্লাবাসীর চিন্তাজগতের নেতৃত্ব বা বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রের আধিপত্য সে কখনোই লাভ করতে সক্ষম হয়নি। তাই এ-সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, বদরুদ্দিনের ক্ষমতার স্বরূপ হলো আধিপত্যহীন প্রভুত্ব।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী প্রেক্ষণে উপন্যাসটি পাঠের সীমাবদ্ধতা

প্রবন্ধের উপর্যুক্ত অংশে *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা* উপন্যাসে বর্ণিত মহল্লাটির সামাজিক ক্ষমতা-কাঠামোতে বিদ্যমান ক্ষমতা-সম্পর্কসমূহ বিশ্লেষণ করে এর ক্ষমতাকেন্দ্রে সমাসীন বদরুদ্দিনের ক্ষমতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী আলোকপ্রক্ষেপে। কিন্তু উপন্যাসটিতে অর্থনৈতিক শ্রেণি-সম্পর্কের অনুপস্থিতির সীমাবদ্ধতাজনিত কারণে সব বিচার-বিশ্লেষণ ও তার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের একটি সীমাবদ্ধতা রয়েই যায়। তাই এ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের আলোয় আলোচ্য উপন্যাসে বর্ণিত সমাজের ক্ষমতা-কাঠামোটির আগাপাশতলা দেখতে গেলে, এর 'আগা' ও 'পাশ' যতটা স্পষ্টভাবে পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়, এর 'তলা' যেন ততটাই অনালোকিত অবস্থায় অগোচরে থেকে যায়। মার্কসীয় তত্ত্বমতে, একটি সমাজের 'তলা' বা ভিত্তিকাঠামো হলো তার উৎপাদনব্যবস্থা : 'উৎপাদনব্যবস্থা হচ্ছে সকল কিছুর নিয়ামক – এটাই সমাজের ভিত্তি বা ভেতরকাঠামো, যার উপর দাঁড়িয়ে থাকে সমাজের শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা, ধর্ম, দর্শন, রাষ্ট্র, আইন ইত্যাদি সম্বলিত উপরিকাঠামোটি।'[৪৩] রক্ষণশীল ধ্রুপদী মার্কসবাদীদের ভিত্তি ও উপরিকাঠামোর মধ্যকার এক-বনাম-এক যান্ত্রিক সম্পর্ক নয়া মার্কসবাদীগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হলেও, কোনো মার্কসবাদীই সমাজ বিশ্লেষণে এর অর্থনৈতিক ভিত্তিকে অস্বীকার করতে পারেননি। অর্থাৎ, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী প্রেক্ষণে কোনো সমাজকে অবলোকন করতে গেলে ঐ সমাজের উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের সমবায়ে সৃষ্ট উৎপাদনব্যবস্থাকে আমলে আনতেই হয়। কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসটিতে মহল্লার সমাজের উপরিকাঠামোর নানা উপাদান, সংস্কৃতি-শিক্ষা-ধর্ম-রাজনীতি, সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেলেও এর উৎপাদনব্যবস্থা সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না; যা উক্ত মহল্লাটির ক্ষমতা-কাঠামোর পূর্ণাবয়ব অবলোকনের পথে একটি প্রধান অন্তরায়।

মহল্লাটির সামাজিক ক্ষমতা-কাঠামোর কেন্দ্রে সমাসীন বদরুদ্দিনের বা তার বিপরীত যুগ্যতায় উপস্থিত মহল্লাবাসীর কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের হদিস উপন্যাসে নেই। ফলে অর্থনৈতিক ক্ষমতা-সম্পর্কের নিরিখে বদরুদ্দিন ও মহল্লাবাসী অপরাপর চরিত্রসমূহের কার অবস্থান কোথায় সে সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা উপন্যাস পাঠে পাওয়া যায় না। এমনকি, মোটর গ্যারেজকর্মী আলাউদ্দিন ও হাজাম ইসমাইল ব্যতীত মহল্লার ক্ষমতা-সম্পর্কে যারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে – বদরুদ্দিন, আবদুল মজিদ, খাজা আহমেদ আলী, খাজা শফিক, আবু করিমের বড় ছেলে, জমির ব্যাপারী – তাদের কারো পেশাগত পরিচয়টুকুও ঔপন্যাসিক উল্লেখ করেননি। মহল্লার অর্থনৈতিক ভিত্তিকাঠামোটি উপেক্ষিতই রয়ে গেছে উপন্যাসটিতে।

সমগ্র উপন্যাস জুড়ে বদরুদ্দিনকে দেখা যায় ধর্ম ও রাজনীতি এই দুয়ের ওপর ভর করে ক্ষমতা অর্জন ও চর্চায় রত। কিন্তু ধর্ম ও রাজনীতি উভয়ই সমাজের উপরিকাঠামোর উপাদান। ভিত্তিকাঠামো তথা উৎপাদনব্যবস্থায় কর্তৃত্ব অর্জনের পর উপরিকাঠামোর উপাদানসমূহে প্রভাব বিস্তার করে সেই ক্ষমতাকে আরও সুদৃঢ় করা সম্ভব। কিন্তু ভিত্তিকাঠামোকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে কেবল উপরিকাঠামোয় প্রভাব বিস্তার করে সমাজে ক্ষমতাবান হয়ে ওঠা মার্কসীয় তত্ত্বসম্মত নয়।

যুদ্ধ-চলাকালে মিলিটারির সাথে যোগসাজশে বদরুদ্দিন প্রভুত্ববাদী ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল, তা উপন্যাসে স্পষ্ট। কিন্তু যুদ্ধোত্তর সময়ে তার ক্ষমতার উৎস ও স্বরূপ অনুধাবনের জন্য পর্যাপ্ত সমাজতাত্ত্বিক উপাদান উপন্যাসটিতে অনুপস্থিত। এ-কালপর্বে তার প্রভুত্ববাদী ক্ষমতার মূল উৎস অন্তর্হিত এবং সম্মতিমূলক আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়েও সে ব্যর্থ। তাহলে কোন শক্তিবলে সে পুনরায় মহল্লায় ক্ষমতাসীন হয়ে উঠল? এ-প্রশ্নের কোনো বাস্তবসম্মত উত্তর উপন্যাসে নেই। ভিত্তিকাঠামোতে কর্তৃত্ব অর্জন ব্যতীত, কেবল ধর্ম বা রাজনীতির মতো সমাজের উপরিকাঠামোর এক বা একাধিক উপাদান কি তার সামাজিক ক্ষমতাকেন্দ্রে সমাসীন হওয়ার জন্য যথেষ্ট? মার্কসীয় তত্ত্বমতে, না। হয়ত সে মহল্লার অর্থনৈতিক ভিত্তিকাঠামোতেও কর্তৃত্ববান হয়ে উঠেছিল; কিন্তু উপন্যাসের টেক্সটে সে-বিষয়ক কোনো তথ্যের সন্ধান মেলে না। এই সীমাবদ্ধতার ফলে মহল্লার সামাজিক ক্ষমতা-কাঠামোতে বদরুদ্দিনের অবস্থান ও তার ক্ষমতার স্বরূপ নির্ণয়, সর্বোপরি উক্ত মহল্লা-বিষয়ক যেকোনো ধরনের বস্তুবাদী সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত একদেশদর্শী হতে বাধ্য।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ হাসান আজিজুল হক, 'সোনা-মোড়া কথাশিল্প: শহীদুল জহির', *শালুক*, বর্ষ নয়, সংখ্যা ১০, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃ. ১২

২ আহমাদ মাযহার, 'শহীদুল জহিরের *জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা*: মুক্তিযুদ্ধ-ভিত্তিক ব্যত্যয়ী সৃষ্টি', *আধুনিকতা: পক্ষ, বিপক্ষ*, ঢাকা, অনন্যা, ২০০১, পৃ. ৬২

৩ হাসান আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৪ নিপা জাহান, '*জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা*: ইতিহাসের বিকল্প বয়ান', *প্রাচ্যবিদ্যা পত্রিকা*, নবম সংখ্যা, জুন ২০১৯, পৃ. ১৮৩

৫ Karl Marx and Frederick Engels, *Menifesto of the Communist Party*, Charles H. Kerr & Company, Chicago, 1906

৬ Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks* (edited and translated by Quintin Hoare & Geoffrey Nowell Smith), New York, International Publishers, 1992

৭ Ibid, pp. 57-58

৮ 'আধিপত্য' শব্দটি 'কর্তৃত্ব', 'প্রভুত্ব', 'রাজত্ব' প্রভৃতি শব্দের সমার্থক হিসেবেও বহুল প্রচলিত। তবে বর্তমান প্রবন্ধে, তুলনামূলক অধিক উপযোগী শব্দের অভাবে, 'আধিপত্য' শব্দটি কেবল 'সম্মতিমূলক কর্তৃত্ব' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৯ Karl Marx & Friedrich Engels, *On Religion*, Moscow, Progress Publishers, 1981, p. 46

১০ খোন্দকার আশরাফ হেসেন, 'মার্কসীয় নন্দন ও সাহিত্যতত্ত্ব', *বিশ শতকের প্রতীচ্য সাহিত্য ও সমালোচনাতত্ত্ব* (সম্পা. বেগম আকতার কামাল), ঢাকা, অবসর, ২০১৪, পৃ. ৮৮

১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

১২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

১৩ ফাহিমুল কাদির, 'হেজিমনি : গ্রামসীয় ব্যাখ্যা', *আন্তোনিও গ্রামসি: জীবনসংগ্রাম ও তত্ত্ব* (সম্পা. খন্দকার সাখাওয়াত আলী), ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ২০১১, পৃ. ২৯২

১৪. অজিত রায়, *আন্তোনিও গ্রামসি : জীবন ও তত্ত্ব* (সম্পা. সৌরীন ভট্টাচার্য, শোভনলাল দত্তগুপ্ত), কলকাতা, সেরিবান, ২০২৩, পৃ. ৭৮

১৫ দ্রষ্টব্য, অজিত রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

১৬ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, 'ক্ষমতা প্রসঙ্গে দুই প্রেক্ষিত : গ্রামশি ও মিশেল ফুকো', *মিশেল ফুকো : পাঠ ও বিবেচনা* (সম্পা. পারভেজ হোসেন), ঢাকা, সংবেদ, ২০০৭, পৃ. ১৭৩

১৭ মুক্তিযুদ্ধ-চলাকালে মোমেনার বয়স ছিল কুড়ি। এই ঘটনার সংঘটনকালে মোমেনা কলেজিয়েট স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী ছিল।

১৮ শহীদুল জহির, 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা', *শহীদুল জহির উপন্যাসসমগ্র* (সম্পা. মোহাম্মদ আবদুর রশীদ), ঢাকা, পাঠক সমাবেশ, ২০১৯, পৃ. ১৮

১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-১৯

২০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

১৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

২২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

২৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

২৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

২৫ 'Male and female are created through the erotization of dominance and submission. The man/woman difference and the dominance/submission dynamic define each other. This is the social meaning of sex and the distinctively feminist account of gender inequality'. (Catharine MacKinnon, *Toward a Feminist Theory of the State*, Harvard University Press, 1989, p. 128.)

২৬ এ-বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে শিবলিঙ্গের ধারণাটি বৈদিক যূপস্তম্ভ থেকে এসেছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। কোনো কোনো শাস্ত্রগ্রন্থে শিবলিঙ্গকে ঈশ্বরের বিমূর্ত প্রতীক বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যার সাথে পুরুষাঙ্গের কোনো যোগসূত্র নেই।

২৭ Sigmund Freud, 'The Infantile Genital Organization of the Libido : A Supplement to the Theory of Sexuality', *Int. J. Psycho-Analaisis*-5 [Tr. Joan Riviere], 1924, p. 128

২৮ শহীদুল জহির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
২৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
৩০ প্রাগুক্ত
৩১ শহীদুল জহির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
৩২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
৩৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
৩৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
৩৬ Antonio Gramsci, 'Hegemony', *Literary Theory : An Anthology* (eds. Julie Rivkin & Michael Yyan), Malden, MA and Oxford: Blackwell, 1998, p. 277
৩৭ শহীদুল জহির, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪
৩৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪
৩৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৪৬
৪০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
৪১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
৪২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
৪৩ খোন্দকার আশরাফ হেসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪-৭৫

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, তেতাল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩২/ডিসেম্বর ২০২৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43ii.009

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা

নাজনীন সুলতানা*

সারসংক্ষেপ

১৯৮২ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্য সৃষ্টিতে নেতৃত্ব দেয়। সামরিক শাসন উচ্ছেদের জন্য এ সময় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দল ও জাতীয়তাবাদী দলের উদ্যোগে ৮ দলীয় জোট গড়ে উঠেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি ১৫ দলীয় জোটের শরীক একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সামরিক শাসক হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের বিরুদ্ধে ছাত্র, শ্রমিক এবং কৃষকদের সমন্বয়ে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিল। এ সময় কমিউনিস্ট পার্টির গৃহীত কৌশল বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তাদের জোটবদ্ধ ধারাবাহিক আন্দোলনে সাফল্য এসেছিল, অবসান ঘটেছিল জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের স্বৈরশাসনের। বর্তমান প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

চাবি শব্দ : কমিউনিস্ট পার্টি, এরশাদ শাসনামল, বাংলাদেশের রাজনীতি (১৯৮২-১৯৮৯)।

ভূমিকা

১৯৮০-এর দশক বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সংকট ও পরিবর্তনের একটি যুগ। সামরিক শাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শাসনে দেশ স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হয়, যেখানে মৌলিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বারবার লঙ্ঘিত হয়। এরশাদবিরোধী গণআন্দোলন ছিল সমাজের নানা স্তরের মানুষের ক্ষোভ ও প্রতিবাদের প্রতিফলন। এ আন্দোলনে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি গুরুত্বপূর্ণ এক ভূমিকা পালন করে। এ দল শুধু স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেনি; বরং জনগণকে সংগঠিত করে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নেতৃত্ব দিয়েছিল।

কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মধ্যস্থতা ও ঐক্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে যেন ছাত্র, শ্রমিক এবং কৃষকদের সমন্বয়ে এক বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে ওঠে। এ দল স্বৈরাচার বিরোধিতার পাশাপাশি নতুন সমাজ নির্মাণের আদর্শ এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে সাধারণ মানুষের মধ্যে শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চার করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। এ প্রবন্ধে এরশাদ

* সহকারী শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ, প্যারামাউন্ট স্কুল এন্ড কলেজ, রাজশাহী।

সরকারের শাসন ব্যবস্থার প্রতিবাদ এবং গণতান্ত্রিক চেতনার পুনর্জাগরণে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ও অবদানের বিশদ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রকৃতি, ১৯৪৮-১৯৮২

১৯৪৮ সালে কলকাতায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিআই) দ্বিতীয় কংগ্রেসে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিপি) গঠিত হয়।[১] এটি ছিল বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ভিত্তি। সিপিআই-এর তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক বি.টি. রণদীভের নেতৃত্বে, সিপিপি ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত লেনিনবাদী কৌশলের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে, যা তেলেঙ্গানা বিদ্রোহের মতো ঘটনার প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। তবে, এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরপর, তারা পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ শুরু করে, শ্রমিক ও ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে।[২]

১৯৫২ সালে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করেন যে উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে। এর প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়, এবং সিপিপি এই ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে যুক্ত হয় এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে জোরালো অবস্থান নেয়।[৩] তোয়াহা, ওলি আহাদ, দেওয়ান মাহবুব আলী এবং সমাদের মতো কমিউনিস্ট নেতারা এই আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন, যা বাংলা ভাষার স্বীকৃতির জন্য একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়।

১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক নির্বাচনে সিপিপি আওয়ামী লীগ, কৃষক প্রজা পার্টি এবং নিজাম-ই-ইসলাম পার্টির সমন্বয়ে গঠিত ইউনাইটেড ফ্রন্টকে সমর্থন করে।[৪] এই নির্বাচনে সিপিপি'র দশ জন প্রার্থীর মধ্যে চার জন হিন্দু আসনে জয়ী হন, এবং আরও ২৩ জন অন্যান্য দলের টিকিটে নির্বাচিত হন।[৫] তবে, ১৯৫৪ সালে সরকার সিপিপি এবং এর সহযোগী সংগঠনগুলো, যেমন ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন, প্রগ্রেসিভ রাইটার্স মুভমেন্ট এবং রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নকে নিষিদ্ধ করে। এর ফলে সিপিপি গোপনে কার্যক্রম চালিয়ে যায়।

১৯৫০-এর দশকে সিপিপি'র সাফল্য সীমিত থাকলেও, ১৯৬০-এর দশকের প্রথম থেকে তারা আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাদের ছাত্র সংগঠন, ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন এবং ১৯৬৮-৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে সক্রিয় ছিল।[৬] সিপিপি আওয়ামী লীগের ৬ দফা আন্দোলনকে সমর্থন করে, যা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরে।[৭] ১৯৬৮ সালে, রাশেদ খান মেনন এবং মতিয়া চৌধুরীর নেতৃত্বে ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্টস ইউনিয়নের দুটি শাখা এবং ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্টস লীগ সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে এবং ১১ দফা প্রোগ্রাম ঘোষণা করে, যা শিক্ষা সংস্কার, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরে।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে, সিপিপি নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও, তাদের অনেক নেতা ও কর্মী আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।[৮]

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর, কমিউনিস্ট পার্টি শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারকে সমর্থন করে। তাদের প্রভাবে ১৯৭২ সালের সংবিধানে সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠিত হলে, কমিউনিস্ট পার্টি তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলীন করে বাকশালে যোগ দেয়।[৯] মুজিবের হত্যার পর, জিয়াউর রহমানের শাসনামলে কমিউনিস্ট পার্টি প্রথমে তাঁর খাল খনন কর্মসূচিকে সমর্থন করে, কিন্তু পরে জিয়া তাদের নিষিদ্ধ করেন।[১০] তবে, আদালতের মাধ্যমে তারা আবার বৈধতা ফিরে পায়। ১৯৮২ সালে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতায় এলে, কমিউনিস্ট পার্টি তার স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ নেয়।

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের ক্ষমতা দখলের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর অধিকাংশ বিরোধী দল সংসদীয় সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করে এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পরিবর্তে 'সার্বভৌম সংসদ' নির্বাচনের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু এসকল দাবি উপেক্ষা করে শাসক বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আয়োজন করে। এই নির্বাচনে মোট ৩১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী বিচারপতি সাত্তার ৬৫.৫২% ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মাত্র ১২৮ দিন পর ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ রাষ্ট্রপতি সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করেন সেনাপ্রধান লে. জেনারেল এইচ.এম.এরশাদ। তিনি সারা দেশে সংবিধান স্থগিত করে সামরিক আইন জারি করেন। সামরিক আইন জারি হওয়ার ফলে রাজনৈতিক তৎপরতাও বন্ধ হয়ে যায়।[১১] সামরিক শাসন শুরুর দুই দিন পর সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের মিলানায়তনে সামরিক কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বক্তৃতায় জেনারেল এইচ.এম. এরশাদ সামরিক আইন জারির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন,

> We will stay in power for about two years and then hand over power to a political party but obviously not to Awami League as Awami League will destroy the Armed Forces.[১২]

এ সময় তিনি প্রতিটি সেনানিবাস সফর করেন এবং সেনা সদস্যদের উদ্দেশে রাজনৈতিক বক্তৃতা দেন। নিজের ক্ষমতা গ্রহণের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে নিজের রাজনৈতিক ভিত্তি দৃঢ় করেন।

আওয়ামী লীগের সাথে ঐক্য

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি দেশের সংকটজনক অবস্থা থেকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করে। এ সময় কমিউনিস্ট পার্টি বামদলীয় মোর্চা

গঠন করতে উদ্যোগী হয়। কিন্তু বামদলগুলো বিভিন্ন ইস্যুতে নিজেদের মধ্যে প্রবল মতভেদ থাকায় এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। শেষে কমিউনিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। কমিউনিস্ট পার্টি উদ্যোগী হয় ১৫ দলীয় ঐক্য জোট গঠন করতে। আর ১৯৮৩ সালে গড়ে ওঠা ১৫ দলীয় জোটে আওয়ামী লীগের পরেই শক্তিশালী অবস্থানে ছিল বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি। ১৫ দলীয় জোটে বিএনপি যোগদান করেনি তাদের আদর্শিক ভিন্নতার জন্য। বিএনপির নেতৃত্বে পৃথক ৭ দলীয় জোট গঠিত হয়। এই জোটে ছিল বিএনপি (সাত্তার-খালেদা জিয়া), ইউনাইটেড পিপলস পার্টি (কাজী জাফর), গণতান্ত্রিক পার্টি (নুরুল হুদা মির্জা-সিরাজুল হোসেন খান), বাংলাদেশ জাতীয় লীগ (আতাউর রহমান), কৃষক শ্রমিক পার্টি (নান্না মিয়া), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (নুরুর রহমান) এবং বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ (টিপু বিশ্বাস)।[১৩]

উল্লেখ্য, এ সময় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি দুই জোটকে (১৫ দলীয় ও ৭ দলীয়) ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। যদিও কমিউনিস্ট পার্টি ১৫ দলীয় জোটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পার্টির এই লিঁয়াজো প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল, এরশাদ শাসন বিরোধীদের শক্তিশালী করা। পার্টি এই লিঁয়াজো প্রক্রিয়ার দ্বারাই সরকার বিরোধী শক্তিসমূহকে সমবেত করে।[১৪] ১৫ দলীয় জোট গঠনকে কেন্দ্র করে ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি একটি রাজনৈতিক প্রস্তাব গ্রহণ করে। তাতে বলা হয়,

> বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছে যে, দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ক্রমে সংকট আরো গভীর হচ্ছে। দেশের বাস্তব আর্থ-সামাজিক অবস্থা যা সৃষ্টি হয়েছে দুই শতাব্দীর অধিককাল ধরে ঔপনিবেশিক শক্তির শোষণ এবং যুগ যুগ ধরে সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসন প্রভৃতি ক্ষেত্রে মৌলিক সংস্কারের অভাব থেকে দাবি করছে সমাজতন্ত্র অভিমুখী সামাজিক বিপ্লব। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব গড়ে তোলা আজ ঐতিহাসিকভাবে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।[১৫]

এভাবে জোট গঠিত হবার পর সরকার বিরোধী আন্দোলন শক্তিশালী করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৬০ দশকের মতো প্রথমে ছাত্রকেন্দ্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়।[১৬]

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্য জোটের রাজনীতি

১৯৮২ সালে এরশাদ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী মজিদ খান একটি প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষানীতি ঘোষণা করেছিলেন। এ শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন এরশাদ শাসন বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। ১৯৮২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষাদিবস পালন করা হয়, সামরিক শাসন বিরোধী দিবস হিসেবে। এটি ছিল জেনারেল এরশাদ বিরোধী প্রথম স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ। এরপর ১৯৮৩ সালের ১ জানুয়ারি ছাত্রদের পক্ষ থেকে ব্যাপক বিক্ষোভের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।[১৭] ১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা সচিবালয় অভিমুখে মিছিল বের করে এবং মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। এতে

কয়েকজন ছাত্র নিহত হয়।[১৮] পুলিশ ও বিডিআর বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘিরে রাখে। এর প্রতিবাদে ১৯৮৩ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি, মৌন মিছিল এবং ২০ ফেব্রুয়ারি সারাদেশে অর্ধদিবস হরতাল পালনের ডাক দেওয়া হয়।

এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এরশাদ শাসন বিরোধী আন্দোলনের পটভূমি হিসেবে কাজে লাগায়। এ সময় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সরকার বিরোধী আন্দোলন পরিচালনার জন্য কতকগুলো নীতি গ্রহণ করে। এগুলি ছিল নিম্নরূপ :

ক) পার্টি 'জাতীয় উন্নয়ন ও বিকাশ সাধন এবং জনগণের প্রকৃত কল্যাণ ও মুক্তির জন্য সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমাজতন্ত্র অভিমুখীন জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব প্রতিষ্ঠা করার নীতি অনুসরণ অব্যাহত রাখবে।

খ) স্থায়ীভাবে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হলে আন্দোলন সংগ্রামের ধারায় এগিয়ে যাওয়ার নীতি অব্যাহত রাখা হবে।

গ) বিপ্লব সম্পাদনের জন্য বিপ্লবের পক্ষের প্রধান শক্তিসমূহকে (শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, কৃষক, ছাত্র, যুবক, বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন পেশাজীবী) নিয়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করা হবে।[১৯]

উপর্যুক্ত নীতিসমূহ আন্দোলনের ধারায় প্রয়োগ করার জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ দলীয় জোট প্রতিবাদ সভা করতে থাকে।

এ সময় কমিউনিস্ট পার্টি আন্দোলনকে সফলভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষা আন্দোলন ছাড়াও আরো দুইভাবে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রথমত, জোটবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা; দ্বিতীয়ত, রাজপথে থেকে লড়াই করা।[২০] বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির একক প্রচেষ্টায় শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর, ছাত্র, যুবক, নারী, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবীদেরকে আন্দোলনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণি তাদের শ্রেণি আন্দোলনের সাথে সাথে জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখার জন্য 'ঐক্য পরিষদ' গঠন করে। একমাত্র সরকারি ফেডারেশন ছাড়া প্রায় সকল ফেডারেশন 'ঐক্য পরিষদে' যোগ দেয়। এমনকি বিএনপি সমর্থক শ্রমিক সংগঠনও ঐক্য পরিষদে যোগ দেয়। উল্লেখ্য, যে সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধ হয় তাদের অনেকেরই তেমন কোনো গণভিত্তি না থাকলেও ব্যাপক ঐক্যের ভিত্তিতে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই 'ঐক্য পরিষদ' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এভাবে দেখা যায়,বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতায় শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শ্রমিক আন্দোলন ছাড়াও ছাত্র আন্দোলন, গ্রামাঞ্চলে ক্ষেতমজুরদের নানা সংগ্রাম, সমাজের অন্যান্য স্তরের জনগণের আন্দোলনও এ সময় ক্রমেই বেগবান হয়ে উঠতে থাকে।[২১] ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ ৫ দফা দাবিতে ১৯৮৪ সালের ২২ মে থেকে ৪৮ ঘন্টাব্যাপী হরতাল পালন করে। জনজীবন বিপর্যস্ত ও সরকারের জনসমর্থন হারানোর ভয়ে জেনারেল এরশাদ এ সময় শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবিসমূহ পরীক্ষা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খানকে নির্দেশ দেন। শ্রমিক কর্মচারী ঐক্যপরিষদ ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে আলোচনা শুরু হয়। ক্রমাগত দুই দিন

আলোচনা শেষে সরকার শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের প্রায় সব দাবিই মেনে নিয়ে চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।[২২] এভাবে কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলন আংশিকভাবে হলেও সফল হয়।

এ সময় কমিউনিস্ট পার্টিসহ বিরোধী দলের আন্দোলনে সফলতা আসে উপজেলা নির্বাচন বন্ধ করতে পারার মধ্য দিয়ে। উপজেলা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরকার পুনরায় রাজনৈতিক বিধিনিষেধ জারি করে। এর পর পরই ১৯৮৪ সালের ১ মার্চ হরতাল আহ্বান করলে তার আগের দিন ছাত্র সমাজ মিছিল বের করলে ছাত্রনেতা সেলিম এবং দেলোয়ার পুলিশের ট্রাকের তলায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। হরতাল চলাকালে আদমজীতে নিহত হন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী তাজুল ইসলাম। এতে করে ১৫ দলীয় জোটসহ সকল জোট অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন গড়ে তোলে। ফলে সরকার উপজেলা নির্বাচন স্থগিত করতে বাধ্য হয়।[২৩]

এ পর্যায়ে কৌশল হিসেবে স্থির করা হয় তীব্র আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৮৪ সালের মধ্যেই সংসদ নির্বাচন ঘোষণা করতে বাধ্য করা। এ উদ্দেশ্যে ১৫ দলীয় জোট একটির পর একটি হরতাল এবং ১৪ অক্টোবর গণসমাবেশের ডাক দেয়। এই গণসমাবেশ কেবল দেশে নয়, বিদেশেও আলোড়ন সৃষ্টি করে।[২৪] এ অবস্থায় জেনারেল এরশাদ তাঁর ক্ষমতাকে বৈধ করার জন্য গণভোটের ব্যবস্থা করেন। গণভোট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে সমস্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর রাতের বেলা সান্ধ্যআইন জারি করা হয়।[২৫] এ সময় বিরোধী দলের ৫১৭ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।[২৬]

গণভোট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন ১৫ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে বলা হয়,

> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরের সংঘর্ষ ও ছাত্র হত্যার উত্তেজনা সত্ত্বেও আমরা ধৈর্য্য ধরে নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম কিন্তু জঙ্গী সরকার নির্বাচন বাতিল করেছে। এ থেকে তাদের অসৎ উদ্দেশ্যের প্রমাণ মেলে এবং তারা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সমগ্র দেশকে বৃহত্তর হাঙ্গামার পথে ঠেলে দিয়েছে... সমস্ত রকম জুলুম বজায় রেখে এরশাদ গণভোটের প্রহসন করছেন। এ পথেই তিনি তাঁর বেআইনী শাসনকে আইনী করতে চান। জনগণ তাঁর এই অপচেষ্টাকে রুখবে। কিছুতেই তারা এই গণভোটে অংশ নিবে না।[২৭]

১৫ দল শেষ পর্যন্ত ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চের গণভোটকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য মতে, গণভোটে ৭১ শতাংশ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। এতে প্রায় ৯৫ শতাংশ ভোট জেনারেল এইচ. এম. এরশাদের পক্ষে পড়ে।[২৮]

১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ গণভোটে জয়লাভের পর জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ স্থগিত থাকা উপজেলা নির্বাচনের নতুন তারিখ ১৯৮৫ সালের ১৬ ও ২০ মে নির্ধারণ করেন।[২৯] ১৯৮৫ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ১৫ দলের সঙ্গে যৌথভাবে উপজেলা নির্বাচন প্রতিহত করার ডাক দেয়। উপজেলা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এতে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতাকর্মীসহ প্রায় ৪০০ কর্মী আহত এবং ১৪ জন নিহত

হন। উপজেলা নির্বাচনের সহিংসতা অনেক বেড়ে যায় এবং ১৯৮৫ সালের ১৬ ও ২০ মে সংঘর্ষে ১৪৮টি ভোটকেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিত রাখা হয়।[৩০] এভাবে গোলযোগময় অবস্থার মধ্যদিয়ে উপজেলা নির্বাচন সম্পন্ন হয়। শেষপর্যন্ত নির্বাচন বন্ধ করতে ব্যর্থ হলেও কমিউনস্ট পার্টি নির্বাচন প্রতিরোধের জন্য মাঠে সক্রিয়ভাবে তৎপর ছিল।

১৯৮৬ সালের নির্বাচন

জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ ১৯৮৫ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে আরো এক বছরের জন্য তাঁর কার্যকালের মেয়াদ বৃদ্ধি করেন। ইতঃপূর্বে আরো দুই বার জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে চাকরির মেয়াদ বাড়িয়ে ছিলেন।[৩১] নিজের চাকুরীর মেয়াদ বাড়িয়ে দশে গণতান্ত্রকি ব্যবস্থা প্রতষ্ঠার জন্য স্বচষ্টে হন জনোরলে এরশাদ, যার লক্ষ্য ছলি নজিরে রাজনতৈকি দল জাতীয় পার্টকিে ক্ষমতায় আনা। সকল বিরোধী রাজনৈতিক দল তাঁর এই নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হবার অপতৎপরতা রুখে দেবার জন্য সক্রিয় হয়।

উপজেলা নির্বাচনের পর ১৫ দলীয় জোটের মধ্যে উদ্যমী মনোভাব কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। এ সময় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি নিজস্ব উদ্যোগে সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আয়োজিত মে দিবসে শ্রমিকদের মিছিল করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু খুব দ্রুত কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করার ইস্যু পেয়ে যায়।

১৯৮৫ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে চটকল শ্রমিকদের ৩৬ দিনব্যাপী ধর্মঘট এবং আদমজীর শ্রমিকদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণের কারণে পরিস্থিতি নতুন মোড় নেয়। ১৫ দল আদমজীর শ্রমিক আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করলে আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। এ সময় বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনের স্তব্ধতা কাটাতে সহায়ক হয়। ১৯৮৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি মানিক মিয়া এভিনিউতে গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অবিলম্বে সংসদ নির্বাচন আয়োজনরে দাবি করা হয়। সমাবেশে আরো দাবি করা হয়, দুই নেত্রীকে ১৫০:১৫০ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দান করার। উল্লেখ্য, নির্বাচন নিয়ে জোটের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয় এবং সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব ঘটে। এ সুযোগে জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ দ্রুততার সাথে সংবিধান সংশোধন করে একজন প্রার্থীকে পাঁচটির বেশি আসনে প্রতিদ্বন্দিতা করতে না-পারার বিধান সংযোজন করেন। ফলে দুই নেত্রীর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে স্বৈরশাসককে মোকাবিলা করার সুযোগ আর থাকে না। তারপরও ১৫ দল নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৩২]

সংসদ নির্বাচনে আসন বণ্টনকে কেন্দ্র করে ১৫ দলীয় জোটের বিরোধ অব্যাহত থাকে এবং তা ভাঙ্গনে রূপান্তরিত হয়। ৫ বামদল ১৫ দলীয় জোট থেকে বেরিয়ে যায়। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, আওয়ামী লীগ, উভয় ন্যাপ, বাকশাল, সাম্যবাদী দল, জাসদের একাংশ (শাজাহান সিরাজ), ওয়ার্কার্স পার্টি (নজরুল) ও গণ আজাদী লীগ নির্বাচনের পক্ষে থাকে। তবে বাকশাল ও

জাসদ (শাজাহান-সিরাজ) শেষ মুহূর্তে নির্বাচন বর্জন করে। এভাবে ১৫ দলীয় জোট ১৯৮৬ সালে সংসদ নির্বাচনের সময় ৮ দলীয় জোটে পরিণত হয় এবং ১৯৮৬ সালের ১১ এপ্রিল নির্বাচনী মোর্চা গঠন করে।[৩৩]

১৯৮৬ সালের ১২ এপ্রিল শনিবার সকালে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কার্যালয়ে ৮ দলীয় নির্বাচনী মোর্চার নির্বাচন কমিটি গঠন করা হয়। রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারনায় জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাই নির্বাচনের পূর্বমুহূর্তে ব্যাপক গ্রেফতার শুরু করেন।[৩৪] বায়তুল মোকাররম এলাকা থেকে ৪১ জনকে গ্রেফতার করা হয়।[৩৫] সারাদেশে সন্ত্রাস, হাঙ্গামা ও বোমাবাজির মধ্য দিয়ে ১৯৮৬ সালের ৭ মে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[৩৬] নির্বাচনে ৩০০টি আসনের মধ্যে জাতীয় পার্টি ১৫৩; আওয়ামী লীগ ৭৬, জামায়াতে ইসলামী ১০, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ৫টি আসন লাভ করে।[৩৭] এ নির্বাচনে যোগ দিয়ে দল ১৯৫৪ সালের পর সবচাইতে বড় সাফল্য অর্জন করে। নির্বাচনে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ৫ জন প্রার্থী বিজয়ী হন। পরে স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচিত সংসদ সদস্য ওহিদুর রহমান বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করায় দলের নির্বাচিত সংসদ সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৬। এছাড়া সহযোগী দল ন্যাপের ৭ এবং ওয়ার্কার্স পার্টির ৩ জন সদস্য নির্বাচিত হন। এ নির্বাচন সম্পর্কে পরবর্তীতে দলীয়ভাবে মূল্যায়ন করে বলা হয় :

> এ নির্বাচন এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে আমাদের পার্টির সামগ্রিক ভূমিকা, তৎপরতা ও আন্দোলনের বাস্তব অবদান। এ নির্বাচন পার্টির দলীয় মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে পার্টি রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে উপনীত হয়েছে।[৩৮]

এভাবে দেখা যায় আশির দশকের শুরুতে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি যে আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করে অগ্রসর হয়, তাতে সাফল্য আসে। ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে দলের সাফল্য দলীয় সদস্যদের মনোবল বৃদ্ধি করে।

১৯৮৬ সালের নির্বাচন সম্পর্কে পার্টির পর্যালোচনা হলো, 'বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সামরিক শাসন বিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রথম থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ... এ নির্বাচনে অত্যন্ত সতর্কভাবে অংশগ্রহণ করেছে। এবারও পরিস্থিতি বেশ জটিল ছিল। তা সত্ত্বেও ভোটের প্রকৃত ফলাফলে দেখা যায় বেশির ভাগ মানুষ সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণরায় প্রদান করেছে।'[৩৯]

১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনের মূল্যায়ন করতে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি আরো মন্তব্য করে, ১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচন দ্বারা সরকার পক্ষকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ভোটের প্রকৃত ফলাফল ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। সরকার সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করে ভোট ডাকাতি এবং মিডিয়া ক্যুয়ের মাধ্যমে সংসদে সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।[৪০]

১৯৮৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

উপজেলা নির্বাচন ও সংসদ নির্বাচনের পর জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ বৈধভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। তিনি রাজনৈতিক বিরোধী দলগুলির কর্মীদের উদ্দেশে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন যে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কেউ বিরোধিতা করলে তার সাত বছর কারাদন্ড হতে পারে। নির্বাচনের মাত্র দুই দিন আগে অর্থাৎ ১৯৮৬ সালের ১৩ অক্টোবর এরশাদ সরকার প্রায় ২০০০ নির্বাচন-বিরোধী কর্মীকে গ্রেফতার করেন এবং পুলশিকে বিরোধী দলের প্রথম সারির নেতাদের ওপর কড়া নজর রাখার নির্দেশ দেন।[৪১]

বাংলাদেশের বৃহৎ দুটি রাজনৈতিক মোর্চা প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বয়কট করলেও এ নির্বাচনের প্রার্থী ছিলেন মোট ১৬ জন। এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশে ব্যাপক সংঘর্ষ শুরু হয়। নির্বাচনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ৫ জন কর্মী নিহত এবং তিনশতাধিক কর্মী আহত হন।[৪২]

নির্বাচনে ভোটারের উপস্থিতি ছিল একেবারে নগণ্য। বিদেশী সাংবাদিকদের দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, নির্বাচন কেন্দ্রে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য মাত্র ১০-১৫ শতাংশ ভোটদাতা হাজির হয়। জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ নির্বাচনের বৈধতা সম্পর্কে বলেন, 'বিরোধী দলগুলি নির্বাচন বানচাল করে দিবে বলে দাবি করেছিল। কিন্তু আমরা সফলভাবে নির্বাচন করতে পেরেছি। এটাই এই নির্বাচনের বিশ্বাস যোগ্যতা প্রমাণ করে। যদি ভোটদাতার সংখ্যা শতকরা ৩ জনও হয় এবং তাদের বেশির ভাগই আমার পক্ষে ভোট দিয়ে থাকেন তা হলে ঐ অধিকাংশের ভোটে আমি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছি।'[৪৩]

নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর ১৯৮৬ সালের ২৩ অক্টোবর জেনারেল এরশাদ পাঁচ বছরের জন্য বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর জাতীয় সংসদ দুই তৃতীয়াংশের ভোটে ইনডেমনিটি বিল পাস হয়। ফলে বিগত চার বছরেরও বেশি সময় সামরিক শাসনামলে যে সকল সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল সেগুলো বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়। জাতীয় সংসদে ইনডেমনিটি বিল গৃহীত হওয়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে প্রেসিডেন্ট এরশাদ সামরিক আইন প্রত্যাহার করনে।[৪৪]

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ১৯৮০ সালের তৃতীয় কংগ্রেসের পর থেকে চতুর্থ কংগ্রেস পর্যন্ত অর্থাৎ গোটা আশির দশকই রাজনৈতিক দিক থেকে অস্থিতিশীল ছিল। সে সময় সামরিক শাসক জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলন করার পাশাপাশি বাংলাদেশের

কমিউনিস্ট পার্টি চতুর্থ কংগ্রেসের আয়োজন করে। ১৯৮৭ সালের ৭ এপ্রিল থেকে ১১ এপ্রিল মোট পাঁচ দিনব্যাপী চতুর্থ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে। এ কংগ্রেসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের আব্দুস সামাদ আজাদ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সৈয়দ আলতাফ হোসেন, বাকশালের আব্দুর রাজ্জাক, সাম্যবাদী দলের মোহাম্মদ তোয়াহা ও গণআজাদী লীগের আব্দুস সামাদ। এ কংগ্রেসে ভারত, হাঙ্গেরী, ভিয়েতনাম, সাইপ্রাস, প্যালেস্টাইন, মঙ্গোলিয়া, চেকোশ্লোকাভিয়া, জার্মানি প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধি যোগদান করেন। এছাড়া কংগ্রেস উপলক্ষ্যে সারা বিশ্বের প্রায় সকল দেশের কমিউনিস্ট পার্টি বাণী পাঠায়। কেন্দ্রীয় কমিটির ৩২ জন সদস্যসহ কংগ্রেসে যোগদানকারী প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ৮৮৯ জন। কংগ্রেসে ঐক্য জোটের প্রায় সকল নেতাই উপস্থিত ছিলেন। আওয়ামী লীগের আব্দুস সামাদ আজাদ থেকে শুরু করে এ সময়কার কমিউনিস্ট পার্টির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য সাম্যবাদী দলের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ তোয়াহাও এ কংগ্রেসে উপস্থিতি থাকনে।[৪৫] এ কংগ্রেসে পার্টির সাংগঠনিক রিপোর্টও পেশ করা হয়। এটি পেশ করেন নূরুল ইসলাম নাহিদ। সাংগঠনিক শক্তি সম্পর্কে এই রিপোর্টে বলা হয় :

> চতুর্থ কংগ্রেস সামনে রেখে অনুষ্ঠিত জেলা সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বর্তমানে ৬০টি জেলা সংগঠন গঠিত হয়েছে। তৃতীয় কংগ্রেসের সময় এই সংখ্যা ছিল ২৮টি। ১৯৮৫ সালে ৫টি জেলা সংগঠনকে আলাদা করা হয়। পার্টি সদস্যের সংখ্যা, সাংগঠনিক অবস্থা, নেতৃত্বের সবলতা-দুর্বলতা প্রভৃতি বিবেচনায় এনে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঢাকা ও চট্টগ্রাম নগরসহ ৩৮টি জেলা কমিটি, ৫টি জেলা সাংগঠনিক কমিটি ও ১৭টি জেলা শাখা কমিটি গঠিত হয়েছে। প্রশাসনিক জেলাগুলোর মধ্যে ৭টিতে এখনও আলাদা জেলা সংগঠন গঠন করা সম্ভব হয়নি।[৪৬]

এই কংগ্রেসে জাতীয় পরিস্থিতি ও বিশ্লেষণ করে বলা হয় :

> ...বহু সংগ্রামের ফলে অর্জিত স্বাধীনতার সুফলগুলো আজ নস্যাৎ হয়ে গেছে। দেশের ভেতরে সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর ধনবাদী সমাজধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমগ্র জাতির উপর নয়া উপনিবেশিক শোষণের শৃঙ্খল দৃঢ়মূল হয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী আমলা মুৎসুদ্দী লুটেরা ধনিকের স্বার্থের অনুকূলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাসমূহ আরো গভীর করা হচ্ছে।[৪৭]

১৯৮৭ সালে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস রিপোর্টে পার্টির নেতা কর্মীদের উদ্দেশে বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের শ্রেণিচরিত্র সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। ক্ষমতাসীন সরকার এদেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল শাসক গোষ্ঠী। এ কারণে দেশের অর্থনীতি-রাজনীতি এবং সমাজ জীবনে সর্বত্র গভীর সংকট দেখা দিয়েছে। তাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতীয় স্বাধীনতাকে সংহত করে স্বাধীনতার অপূর্ণ কাজকে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে বলে ঘোষণা করা হয়। কমিউনিস্ট পার্টির মতে, দল ১৯৮২ সাল থেকে হরতাল, মিছিল, সমাবেশ করে দেশবাসী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণরায় প্রদান করেছে। কিন্তু সামরিক শাসকের শাসনের পতন ঘটেনি। এই অবস্থায় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি পূর্বের রণনীতি ছাড়াও একটি সঠিক রাজনৈতিক রণকৌশল

গ্রহণ করে সংগঠিত শক্তি ও জনসমর্থন নিয়ে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করে তোলা উচিত বলে কমিউনিস্ট পার্টির এই দলিলে ঘ◌োষণা করা হয়।[৪৮]

চতুর্থ কংগ্রেসের রিপোর্ট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় রাষ্ট্রপতি জেনারেল এইচ. এম. এরশাদের শাসনামল সম্পর্কে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন পরিবর্তন আসেনি। আওয়ামী লীগ সম্পর্কেও তাদের পূর্ব ধারণা অব্যাহত রয়েছে। ১৯৮৭ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেসে পূর্বরে সমাজতান্ত্রকি বিপ্লবের ধারা অক্ষুণ্ন রাখা হয়। আর এ ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাবার পক্ষে থাকে।[৪৯]

১৯৮৭-৮৮ গণ আন্দোলন ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচন ও ১৯৮৭ সালের চতুর্থ কংগ্রেসের পর বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সকল সময়ের জন্য প্রযোজ্য কিছু সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে। মূলত, গঠনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ লেনিনবাদী সাংগঠনিক নীতিমালা সুনির্দিষ্ট করার জন্যই কেন্দ্রীয় কমিটি এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল।

এ সময় সামরিক আইন প্রত্যাহার করায় দেশের রাজনৈতিক দলগুলো প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার সুযোগ লাভ করে। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিও রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করে এবং এ ব্যাপারে আরো বেশি সংঘবদ্ধ হয়।[৫০] ১৯৮৭ সালের জুন মাসে এরশাদ সরকার নতুন বাজেট ঘোষণা করলে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এই বাজেটকে 'গরীব মারার বাজেট' বলে আখ্যায়িত করে এবং বাজেটের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। তারা ৮ দলীয় জোটের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ২৪ ঘণ্টার হরতাল পালন করে।[৫১] ১৯৮৭ সালের ১২ জুলাই জাতীয় সংসদে স্থানীয় সরকার বিল পাস হয়। এই বিলে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের বেসামরিক প্রশাসনে ঢালাও ভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ প্রকাশ্যে না হলেও পর্দার অন্তরালে সামরিক আইন ধরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যান। এ বিলের বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো তীব্র বিরোধিতা করে। তারা ১৯৮৭ সালের ১২ ও ১৩ জুলাই দুই দিনের সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। ফলে শুরু হয় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ। এতে নিহত হয় ১০ জন এবং ২০০ জন আহত হয় এবং ১০০ জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করা হয়।[৫২] এর প্রতিবাদে জোটবদ্ধভাবে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৮৭ সালের ২৫ জুলাই একটানা ৫৪ ঘণ্টার হরতাল শুরু করে। এই হরতালেও পুলিশ গুলি চালায় এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিসহ বিভিন্ন দলের ১০ জন নিহত হন।[৫৩] উল্লেখ্য যে, ১৯৮৭ সালের প্রলয়ংকরী বন্যার জন্য এরশাদ শাসন বিরোধী আন্দোলনে কিছুটা ছেদ পড়ে।[৫৪] এ সময় হঠাৎ করেই বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সংকট দেখা দেয়। ১৯৮৭ সালের ৯ অক্টোবর পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ

ফরহাদ সোভিয়েত ইউনিয়নের মস্কোর একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। আবার পার্টির প্রবীন নেতা মণি সিংহও অসুস্থ হয়ে পড়েন। এভাবে পার্টি সাময়িকভাবে নেতৃত্বহীন অবস্থা অতিবাহিত করে।[৫৫]

এরপরও পার্টি ১৯৮৭-৮৮ সালে এরশাদ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য এক দফা দাবিতে তীব্র ও ব্যাপক গণতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলন গড়ে তোলে। আন্দোলনের প্রথম দিকে শ্রমিক কর্মচারীসহ শহরাঞ্চলের জনগণের বিভিন্ন অংশের ব্যাপক অংশগ্রহণ, খাস জমি ও অন্যান্য দাবিতে ক্ষেতমজুর কৃষকসহ গ্রামাঞ্চলে আন্দোলন সম্প্রসারিত হয়। আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান তীব্রতার মুখে সরকার পিছু হঠতে বাধ্য হয়। জেলা পরিষদ বিল, জাতীয় তদন্ত ও সমন্বয় সংস্থা অধ্যাদেশ বাতিল, বাজেট সংশোধন এবং শ্রমিক কর্মচারীদের কিছু দাবি মেনে নেয়ার ফলে জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। সরকার-বিরোধী মনোভাব প্রবল হয় এবং জেনারেল এইচ. এম. এরশাদের পদত্যাগের দাবিটি আন্দোলনের জনপ্রিয় দাবিতে রূপান্তরিত হয়।[৫৬] এরশাদ সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবি আন্দোলনের প্রধান দাবি হলেও আন্দোলনকে কেবল এই এক দফায় সীমাবদ্ধ না রেখে পার্টি এই আন্দোলনকে ১৯৮৭ সালের চতুর্থ কংগ্রেসে গৃহীত কৌশল অনুযায়ী বিকল্প ধারা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[৫৭]

১৯৮৭ সালের ১৬ আগস্ট ৮ দলীয় জোট ও ৭ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি জেনারেল এইচ. এম. এরশাদের পদত্যাগের জোর দাবি জানানো হয়। আর চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর ঢাকা অবরোধকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের ধারাবাহিক কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ঢাকা অবরোধ কর্মসূচির পূর্বে দুই নেত্রী শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়া পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং একটি যুক্ত ঘোষণা প্রদান করেন। ঘোষণায় বলা হয়, এরশাদ শাসনের পতন অত্যাসন্ন। এতে জনমনে উৎসাহ সৃষ্টি হয় এবং প্রত্যাশা বৃদ্ধি পায়।[৫৮]

এ অবস্থায় সরকার দমননীতির আশ্রয় নেয় এবং সহিংস উপায়ে আন্দোলন মোকাবিলা শুরু করে। ১৯৮৭ সালের ২৫ অক্টোবর থেকে দেশব্যাপী হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেফতার ও তল্লাশি শুরু করা হয়। এর প্রতিবাদে পরের দিন অর্থাৎ ২৬ অক্টোবর তিন জোট উপজেলা ঘেরাও করে। ২৮ অক্টোবর কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ১৭টি কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠন রাজপথ-রেলপথ অবরোধ করে।[৫৯]

রাষ্ট্রপতি জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ ১০ নভেম্বর ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি বানচাল করার জন্য কর্মসূচির দিনে বাইরে থেকে ঢাকায় বিক্ষোভকারী আনার পথ বন্ধ করে দেন। এ দিন পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে ৩ জন নিহত হন, এর মধ্য দুই জন ছিলেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য।[৬০] ১০ নভেম্বরের পর থেকে ১৯৮৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত একের পর এক লাগাতার হরতালের কর্মসূচি দেয় রাজনৈতিক দলগুলো।[৬১] জেনারেল এইচ. এম. এরশাদের

সরকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে। জরুরি অবস্থা ঘোষণার সপ্তাহখানেক পরেই এরশাদ বিরোধী ১০ জন জামায়াতি ইসলামী সংসদ সদস্য এক যোগে পদত্যাগ করেন। অবস্থা বেগতিক দেখে রাষ্ট্রপতি এইচ. এম. এরশাদ ১৯৮৭ সালের ৬ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ ভেঙে দেন। ঐ সময় দেশে সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়।[৬২]

১৯৮৭ সালের ১১ ডিসেম্বর ঘরোয়াভাবে রাজনীতির অনুমোদন দেওয়া হলে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ঘরোয়াভাবে তাদের রাজনৈতিক কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৮৮ সালের ১ জানুয়ারি ঘোষণা করা হয় ১৯৮৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিসহ সকল বিরোধীদল সংসদ নির্বাচন বয়কট করে। কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক সাইফুউদ্দিন আহমেদ মানিক এক ঘোষণায় উল্লেখ করেন,

> আমরা (কমিউনিস্ট পার্টি ও ৮ দলীয় জোট) এই নির্বাচনকে বয়কট করবো এবং সকল রাজনৈতিক দলকে এ নির্বাচন বয়কটের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। দেশের এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে এরশাদ সরকারকে প্রথমেই একজন নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। এরশাদ সরকারের পদত্যাগের পর উক্ত নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে দেশের চতুর্থ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং তাতে আমরা (কমিউনিস্ট পার্টি ও ৮ দলীয় জোট) অবশ্যই অংশগ্রহণ করবো।[৬৩]

১৯৮৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে অন্তবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিসহ সকল বিরোধীদল প্রত্যাখ্যান করে। রাষ্ট্রপতি এইচ. এম. এরশাদ বিরোধী দলগুলোকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করানোর জন্য নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। বিরোধী দলগুলো শুধু নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেনি বরং এরশাদের অপসারণের 'এক দফা' দাবিতে অনড় থাকে।[৬৪]

মনোনয়ন পত্র দাখিলের দিন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিসহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো হরতালসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। এর মধ্যেই ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ দেশের চতুর্থ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৮ সালের ২২ থেকে ২৪ মে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রস্তাব করা হয়, সরকার সংবিধান সংশোধনের যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে। খুব শীঘ্রই ৮ দলীয় জোট ও বিরোধী দলীয় জোট ও অন্যান্য দলগুলোকে সাথে নিয়ে সরকার পতনের এক দফা আন্দোলন শুরু করতে হবে।[৬৫]

জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ দেশে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকে যুগোপযোগী করার জন্য কর নীতি ও আমদানি-রপ্তানি নীতি প্রণয়ন করেন। এরশাদ সরকার কর্তৃক এসব নীতি গ্রহণের ফলে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কারণ এসব নীতির ফলে দেশের সাধারণ জনগণের

জীবনযাপনের মানোন্নয়নে কোনো কাজে আসে না বরং দেশে নতুন ধরনের এক ধনিক শ্রেণির উদ্ভব হতে থাকে। ফলে সাধারণ জনগণ এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অব্যাহত রাখে।[৬৬]

১৯৮৮ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে দেশে ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি তখন আন্দোলনের কৌশল পরিবর্তন করে বন্যার্তদের পাশে গিয়ে সহযোগিতা করে। কিন্তু সে সহযোগিতা পর্যাপ্ত হয় না। ফলে ত্রাণসামগ্রীর অভাবে ও ত্রাণ সমাগ্রী বিতরণে ব্যাপক অনিয়মের কারণে জনগণ সরকারের প্রতি উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ১৯৮৮ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সরকারের ব্যর্থতার তীব্র সমালোচনা করে।[৬৭]

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৮৮ সালে কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় আন্দোলন স্তিমিত হবার কারণ বশি্লষেণ করে এবং আন্দোলনকে পুনর্গঠনের জন্য কতকগুলো রণকৌশল নির্ধারণ করে। রণকৌশলসমূহ হলো :

১ স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলা;
২ ১৫ দলকে সংহত ও অগ্রসর করা;
৩ বাম সমঝোতাকে একটি সুনির্দিষ্ট রূপ দেওয়া;
৪ পার্টির নিজস্ব উদ্যোগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা এবং পার্টির উদ্যোগে জাতীয়, আংশিক ও স্থানীয় ভিত্তিতে প্রচার ও ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলা;
৫ একই সাথে গণসংগঠনগুলোর উদ্যোগে জাতীয় ও স্থানীয় ভিত্তিতে আংশিক ও ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন সংগ্রাম যথাসম্ভব বেগবান করার কর্তব্য স্থির করা।[৬৮]

উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহ দ্বারা এ সময়ে আন্দোলন পুনর্গঠিত হয়নি। বরং রাজনৈতিক জোটগুলোর সমঝোতা ভেঙে পড়ে এবং সে সঙ্গে এসব দাবিও কার্যকারিতা হারায়। ১৯৮৭-৮৮ সালের এ অবস্থার জন্য কমিউনস্ট পার্টি আওয়ামী লীগ ও বিএনপি-র মধ্যকার সম্পর্কের অবনতিকে দায়ী করে। উল্লখে্য, স্বৈরাচারের আন্দোলনের শক্তিকে পরাভূত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বিকল্প পন্থা নেই বলে মনে করা হয়। কিন্তু যে পটভূমিতে ১৯৮৭-৮৮ সালের আন্দোলন গড়ে ওঠে ১৯৮৮ সালের অবৈধ পার্লামেন্ট নির্বাচনের পর তা শক্তিভারসাম্যের পরিবর্তন, বড় দলগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি, জনমনে সৃষ্ট হতাশা ও আস্থার সংকট এবং সরকারের আপেক্ষিক সংহত অবস্থান প্রভৃতি কারণে পরিবর্তিত হয়।[৬৯]

১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরের শেষার্ধ থেকে ১৯৮৯ সালের ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির শাখা সম্মেলনসমূহ অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সম্মেলনে পার্টি ও গণসংগঠনসমূহের উদ্যোগে রাষ্ট্রপতি জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে সংগঠনের মান উন্নত ও বিকশিত করাসহ বহুবিধ বিষয় আলোচনা করা হয়। মূলত, চলমান আন্দোলনকে পুনর্গঠিত করাই

ছিল এ সম্মেলনের লক্ষ্য। এছাড়া, আন্দোলন সংগ্রাম ও সংগঠনগত কাজের পর্যালোচনা, অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা, নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টিসহ জেলা পর্যায়ে নির্বাচনমূলক কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।[৭০]

১৯৯০ সালের গণ আন্দোলন ও এরশাদ সরকাররে পতন

১৯৮৯ সালের বাজেটকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে গণআন্দোলন মারমুখী গণআন্দোলনে রূপান্তরিত হতে থাকে। বাজেট বিরোধী আন্দোলন শেষ হতে না হতেই সরকারের মধ্যপ্রাচ্য নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ ১৯৯০ সালের ৩ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী অর্ধদিবস হরতাল ঘ◌োষণা করা হয় এবং ১০ অক্টোবর সচিবালয় অবরোধের কর্মসূচি দেওয়া হয়।[৭১]

উল্লখিতি পটভূমিতে ১৯৯০ সালের ১০ অক্টোবর সবিচালয় অবরোধ কর্মসূচির মাধ্যমে স্বৈরাচারী এরশাদ শাসনের বিরূদ্ধে সংগ্রামের নতুন পর্বের সূচনা হয়। সেদিন থেকেই আন্দোলন ক্রমাগত বেগবান হয়ে উঠতে থাকে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো কয়েকটি হরতালসহ রাজপথ, রেলপথ অবরোধের কর্মসূচি সফলতার সাথে পালন করে। কিন্তু এসময় ভারতের অযোধ্যায় বাবরি মসজদি হামলাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ঢাকার সব এলাকায় অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারি করা হয়। এছাড়া রাষ্ট্রপতি জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ বিভিন্ন জায়গায় সভা সমাবেশে গোলযোগ সৃষ্টিকারী সমাজবিরোধীদের কঠোর হস্তে দমন করা হবে ঘোষণা দেন।[৭২] ৭ দল, ৮ দল, জামায়াতে ইসলামী, ৬ দল ও ৫ দলসহ সকল রাজনৈতিক জোট মনে করে রাষ্ট্রপতির কারফিউ জারি এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের বিরূদ্ধে ষড়যন্ত্র।[৭৩]

১৯৯০ সালে ২০ ও ২১ নভেম্বর বরি◌োধী দলসমূহ ৪৮ ঘণ্টার লাগাতার হরতালের প্রস্তুতি নেয়।[৭৪] ১০, ১১ ও ১২ ডিসেম্বর সারা দেশে সর্বাত্মক অবরোধের কর্মসূচিসহ ধারাবাহিক সংগ্রামের কর্মসূচি সামনে রেখে গণসংগ্রাম অব্যাহত ভাবে অগ্রসর হতে থাকে।[৭৫]

ক্রমবর্ধমান গণসংগ্রামের কারণে রাষ্টপ্রতি এইচ. এম. এরশাদ সরকার মরিয়া হয়ে দমনপীড়ন তীব্রতর করে তোলে। ছাত্র সমাজকে পর্যুদস্ত ও ছত্রভঙ্গ করার জন্য ১৯৯০ সালের ১৭ নভেম্বর জেনারেল এইচ. এম. এরশাদের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে কিছু বেআইনি অস্ত্রধারী মাঠে নামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একের পর এক সশস্ত্র হামলা এবং সবশেষে ২৭ নভেম্বর ডা. মিলনের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে দেশের জনগণ একত্র হয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে কাজ করে। অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য রাষ্ট্রপতি জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ সরকার ২৭ নভেম্বর দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে। ঢাকাসহ বড় বড় শহরে কারফিউ জারি করা হয়।[৭৬] জোটসমূহ জরুরি আইন ও কারিফউ অমান্য করে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য দ্রুত সাংবাদিক সম্মেলন করে জনগণের প্রতি আহ্বান জানায় এবং লাগাতার হরতালসহ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে।[৭৭] ১৯৯০ সালের ৩০ নভেম্বর সকাল থেকেই শুরু হয় ব্যাপক উত্তেজনা। এই দিন প্রেসক্লাবের সামনে নারী সমাজের

মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। তাদের মৌন মিছিলটির ওপর পুলিশ মৃদু লাঠিচার্জ করে। এই খবর ঢাকা শহরে ছড়িয়ে পড়ামাত্র দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। গভীর রাত পর্যন্ত এই মিছিল অব্যাহত থাকে। ১৯৯০ সালের ১ ডিসেম্বর তা চূড়ান্ত বিস্ফোরণে রূপ নেয়। ১৯৯০ সালের ১ ডিসেম্বর হরতালের সমর্থনে বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। ১৯৯০ সালের ২৭ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত এক সপ্তাহের ব্যবধানে প্রায় ৭৫ জন নিহত হয় এবং ৬০০০ জনের মতো আহত হয় এবং গ্রেফতার করা হয় ৫২,০০০-এর বেশি লোককে।[৭৮] রাষ্ট্রপতি এইচ. এম. এরশাদ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সেনাবাহিনীর দ্বারা প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা চালান। এছাড়া বিদেশী সাহায্যেরও চেষ্টা তিনি করেন। কিন্তু তাঁর সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ ১৯৯০ সালের ৪ ডিসেম্বর পদত্যাগের ঘোষণা দেন। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর তিন জোট মনোনীত নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তি হিসাবে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের নিকট রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর করেন এবং সংসদ ভেঙে দেওয়া হয়। এভাবে অবসান হয় এরশাদ শাসনামলের।[৭৯]

উপসংহার

১৯৮০-এর দশকের বাংলাদেশের গণআন্দোলন ছিল স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের এক ঐতিহাসিক জাগরণ, যার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল স্বাধীনতা, সাম্য এবং গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এই জাগরণের অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি ছিল বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি। তারা শুধু রাজনৈতিক মঞ্চে নয়, বরং তৃণমূল পর্যায়েও সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দিয়ে আন্দোলনকে একটি বৃহত্তর গণজাগরণে রূপান্তরিত করে।[৮০]

এরশাদবিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টি দেখিয়েছে যে সাহসিকতা, আদর্শবাদ এবং সংগঠিত নেতৃত্ব কীভাবে একটি দমন-পীড়নের শাসনের অবসান ঘটাতে পারে। জেনারেল এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি তাদের অসামান্য ত্যাগ ও সংগ্রামের জন্য ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।[৮১] তাদের সংগ্রামী নেতৃত্ব ও সাহসিকতা শুধু স্বৈরাচারের পতনই ঘটায়নি, বরং গণতান্ত্রিক চেতনার পুনর্জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। জনগণের মুক্তি ও সাম্যের যে লড়াই তারা চালিয়েছিল, তা শুধু ইতিহাসের এক অধ্যায় নয়, এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি প্রেরণামূলক উদাহরণ। কমিউনিস্ট পার্টির এই ভূমিকা একটি মুক্ত ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের স্বপ্নকে শক্তিশালী করেছে এবং এই ভূমিকা ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে এবং ভবিষ্যতেও বাঙালি জাতির জন্য প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করবে।

তথ্যনির্দেশ

১ M. B. Rao (ed.), *Document of the History of the Communist Party of India*, Vol. VII, 1948-1950 (New Delhi: People's Publishing House, 1976), pp. 1-118
২ মর্তুজা খালেদ, *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন ও বাম আন্দোলনের বিকাশধারা এবং রাজশাহী জেলা* (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০২২), পৃ. ৭২-৭৩
৩ বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ২য় খন্ড* (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯২), পৃ. ৪৩০-৩৫
৪ খোকা রায়, *সংগ্রামের তিন দশক* (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ৯৯৬), পৃ. ১১
৫ মণি সিংহ, *জীবন সংগ্রাম* অখণ্ড, (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ২য় সংস্কারণ, ১৯৯২), পৃ. ১৯০
৬ পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক প্রথম কংগ্রেসে গৃহীত, 'কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট : ১৯৫৬ সালের জুলাই হইতে ১৯৬৮ সালের জুন পর্যন্ত', ১৯৬৭, পৃ. ১০
৭ আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের রূপরেখা* (ঢাকা : পড়ুয়া, ১৯৯৭), পৃ. ৫৯-৬০
৮ বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ২য় কংগ্রেস রিপোর্ট, ১৯৭২। মর্তুজা খালেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৮
৯ মর্তুজা খালেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৯
১০ মো: আব্দুল আলীম, *বাংলাদেশের বাম রাজনীতি বিভ্রান্তি ও বিভক্তি* (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ ২০১৮), পৃ. ১০৪
১১ আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি*, (রংপুর : টাউন ষ্টোর্স, ২০০৩), পৃ. ২২০
১২ মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, *স্বৈরশাসনের নয় বছর (১৯৮২-৯০)*, (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯২), পৃ. ৫১
১৩ *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২১ নভেম্বর ১৯৮৬
১৪ গবেষক কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার: মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক, তারিখ: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১, স্থান : পুরানা পল্টন, মুক্তিভবন, ঢাকা
১৫ *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক প্রস্তাব*, ১৯৮৩, পৃ. ৮-৯
১৬ সাক্ষাৎকার: মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক, *পূর্বোক্ত*
১৭ মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম পিএসসি, *একাশির রক্তাক্ত অধ্যায়*, (ঢাকা : আফসার ব্রাদার্স, ২০০২), পৃ. ৬৯
১৮ *দৈনিক সংবাদ*, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩
১৯ পূর্বোক্ত
২০ সাক্ষাৎকার : মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক, *পূর্বোক্ত*
২১ *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস রিপোর্ট*, ১৯৮৭
২২ মেজর রফিকুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৫
২৩ *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেসে রিপোর্ট*, ১৯৮৭
২৪ পূর্বোক্ত
২৫ *দৈনিক সংবাদ*, ২৩ মার্চ ১৯৮৫
২৬ *সাপ্তাহিক একতা*, ৮ মার্চ ১৯৮৫
২৭ পরেশ সাহা, *বাংলাদেশ : ষড়যন্ত্রের রাজনীতি, এরশাদ পর্ব*, (ঢাকা : জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ১৯৯৭), পৃ. ৫৫-৫৬
২৮ *দৈনিক সংবাদ*, ২৪ মার্চ, ১৯৮৫
২৯ পরেশ সাহা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৮
৩০ পূর্বোক্ত
৩১ *সাপ্তাহিক একতা*, ৩ মে ১৯৮৫
৩২ *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস রিপোর্ট*, ১৯৮৭
৩৩ *দৈনিক সংবাদ*, ১২ এপ্রিল, ১৯৮৬
৩৪ *দৈনিক সংবাদ*, ৩ মে, ১৯৮৬
৩৫ *দৈনিক সংবাদ*, ৬ মে ১৯৮৬
৩৬ *দৈনিক সংবাদ*, ৮ মে ১৯৮৬

৩৭ *দৈনিক সংবাদ*, ৯ মে ১৯৮৬
৩৮ *'জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৮৬, সাধারণ সম্পাদকের পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদন (গোপনীয়)।'* বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, আগস্ট ১৯৮৬
৩৯ *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভায় গৃহীত সাধারণ সম্পাদকের পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদন*, ১৯৮৬
৪০ পূর্বোক্ত
৪১ *The Guardian*, 14 October 1986
৪২ পরেশ সাহা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৭
৪৩ *The Guardian*, 17 October 1986
৪৪ পরেশ সাহা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৯
৪৫ *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস রিপোর্ট*, ১৯৮৭, পৃ. ১২
৪৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩
৪৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩
৪৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭
৪৯ *দৈনিক সংবাদ* ২৮ জুন, ১৯৮৭
৫০ পরেশ সাহা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭০
৫১ *দৈনিক সংবাদ*, ২৮ জুন, ১৯৮৭
৫২ পরেশ সাহা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭০-৭১
৫৩ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮ জুলাই, ১৯৮৭
৫৪ *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চম কংগ্রেস রিপোর্ট*, ১৯৯১
৫৫ পূর্বোক্ত
৫৬ পূর্বোক্ত
৫৭ পূর্বোক্ত
৫৮ পরেশ সাহা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭২
৫৯ *দৈনিক সংবাদ*, ২৭, ২৯ অক্টোবর, ১৯৮৭
৬০ *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি পঞ্চম কংগ্রেস রিপোর্ট*, ১৯৯১
৬১ পরেশ সাহা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৫
৬২ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৮৭
৬৩ *দৈনিক সংবাদ*, ৬ জানুয়ারি ১৯৮৮
৬৪ পরেশ সাহা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৫, ৭৬
৬৫ *দৈনিক সংবাদ*, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮
৬৬ পূর্বোক্ত
৬৭ *দৈনিক সংবাদ*, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮
৬৮ পূর্বোক্ত
৬৯ পূর্বোক্ত
৭০ লিফলেট: *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রিয় কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত উপজেলা, থানা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড, আঞ্চলিক ও শাখা সম্মেলন সম্পর্কিত নোট*, ১৯৮৮
৭১ *দৈনিক সংবাদ*, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯০
৭২ *দৈনিক সংগ্রাম*, ২ নভেম্বর ১৯৯০
৭৩ *দৈনিক সংগ্রাম*, ৪ নভেম্বর ১৯৯০
৭৪ *দৈনিক সংগ্রাম*, ১১ নভেম্বর ১৯৯০
৭৫ *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চম কংগ্রেস*, ১৯৯১
৭৬ *দৈনিক সংবাদ*, ২৮ নভেম্বর ১৯৯০
৭৭ *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চম কংগ্রেস*, ১৯৯০

৭৮ পরেশ সাহা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৭।
৭৯ *বাংলার বাণী*, ৫, ৬, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯০
৮০ সাক্ষাৎকার : মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক, *পূর্বোক্ত*
৮১ পূর্বোক্ত